কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস

কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সাহিত্যালোক ॥ ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

কল্যাণীয়া

রীতা নার্গিসের

স্মৃতিতে—

লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস সমগ্র ১ম/২য়/৩য়
কর্নেল সমগ্র ১/২/৩/৪/৫/৬/৭/৮/৯/১০/১১/১২
থ্রিলার সপ্তক
কালো মানুষ নীল চোখ
মাকাসিকোর ছায়ামানুষ
কোকোদ্বীপের বিভীষিকা
কালো বাক্সের রহস্য
টোরাদ্বীপের ভয়ঙ্কর
নিঝুম রাতের আতঙ্ক
খরোষ্ঠী লিপিতে রক্ত
সবুজ বনের ভয়ঙ্কর
কাগজে রক্তের দাগ
রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র
কঙ্কগড়ের কঙ্কাল
অলীক মানুষ
জনপদ জনপথ
রহস্য রোমাঞ্চ
স্বপ্নের মতো
বনের আসর
হাট্টিম রহস্য
হাওয়া সাপ
গোপন সত্য
আনন্দমেলা
ভুয়া-ভুতুড়ে
শ্রেষ্ঠ গল্প
মায়ামৃদঙ্গ
বসন্ততৃষ্ণা
নিশিলতা
বেদবতী
রূপবতী
সন্ধ্যানীড়ে অন্ধকার
সমুদ্রে মৃত্যুর ঘ্রাণ
রোড সাহেব ও পুনর্বাসন
জিরো জিরো নাইন
স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান
ডমরুডিহির ভূত

সূচিপত্র

দুঃস্বপ্নের দ্বীপ

এক

আমার কুকুর জিমকে নিয়ে জ্বালায় পড়েছি দেখছি। এমন নয় যে তাকে কখনও বনজঙ্গল পাহাড় পর্বতে আনি নি। এই তো মাস তিনেক আগে তাকে নিয়ে কাশ্মীরের বরফে ঢাকা পাহাড়ী মুল্লুকে ঘুরছি। কিন্তু জিমের এমন পালাই-পালাই ভাবভঙ্গি তো কখনও দেখি না।

প্রথমে ভেবেছিলাম, একেবারে বিদেশ-বিভুঁই জায়গায় এসে ওর বুঝি অসুখ-বিসুখ করেছে। আমাদের সঙ্গে আছেন ভাগ্যক্রমে প্রাণীবিজ্ঞানী ডক্টর মুরলীধর প্রসাদ। নৈনিতালের লোক। তিনি জিমকে ভালভাবে পরীক্ষা করে বলেছেন, জিম ইজ অলরাইট। ওর কিস্যু হয় নি। তবে কী জানেন জয়ন্তবাবু? মানুষের যেমন, তেমনি সব প্রাণীরই এই একটা ব্যাপার আছে। সব জায়গায় মন টেকে না।

ভেবে পাই নি, এমন সুন্দর জায়গায় মন না টেকার কারণ কী থাকতে পারে? চারদিকে নীল সাগরে ঘেরা এই দ্বীপের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। আমাদের ক্যাম্পের সামনে সবুজ ঘাসে ঢাকা একটা সমতল মাঠ। সেখানে নির্ভয়ে হরিণের পাল চরে বেড়ায়। কখনও লুকোচুরি খেলতে আসে সাদা রঙের দু' একটা খরগোস। পাখিও কম নেই। ঝাঁক বেঁধে মাঠে নেমে তারা পোকামাকড় খুঁজে খায়। কিন্তু আশ্চর্য, জিমকে ছেড়ে দিয়ে দেখেছি, সে অভ্যাসমতো পশুপাখিদের মিছেমিছি ভয় দেখিয়ে বা তাড়া করে মজা লুটতে ছোটে না।

এমন কী, তার প্রায় নাকের ডগায় কোন পাখি বা খরগোস বেয়াদপি করতে গেলেও জিম মুখেও ধমকায় না। খালি মুখ তুলে বোবার মত তাকিয়ে থাকে। তার শরীর কেমন যেন থরথর করে কাঁপে

সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে তার আচরণ, সন্ধের দিকে। ক্যাম্পের সামনে খোলামেলায় আগুন জ্বেলে আমরা যখন বসে গল্পসল্প করি, জিম আমার কোলে বসে মুখের ভেতর কী একটা অস্পষ্ট শব্দ করে। মাঝে মাঝে যেন সে ভীষণ চমকে ওঠে।

সারারাত যতবার ঘুম ভাঙে, শুনতে পাই জিমের ওই বোবার মত চাপা অদ্ভুত আওয়াজ। রাতের দিকে বেশ ঠাণ্ডা বলে তার গায়ে একটুকরো কম্বল জড়ানো থাকে। দেখেছি, জিম কম্বলের ভেতর মুখটাও ঢুকিয়ে তালগোল পাকানো শরীরে পুঁটুলির মতো গুটিয়ে রয়েছে। ভয়েই কি? কিসের ভয়? এখানে ভয় পাবার মতো কিছু দেখছি না তো!

আজ তিন দিন হল আমরা এই দ্বীপে এসেছি। আমরা মানে, ওই ডঃ মুরলীধর প্রসাদ, আমি এবং আমাদের প্রখ্যাত 'বুড়ো ঘুঘু' কর্নেল নীলাদ্রি সরকার মহোদয়। আর একজন সঙ্গীও অবশ্য আছে। সে কর্নেলের 'পুরাতন ভৃত্য' শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ। তাকে না আনলে এ অখদ্যে দ্বীপে না খেয়ে মরতে হত। তবে শুধু রান্নাবান্না নয়, ষষ্ঠীচরণ প্রহরী হিসেবেও বড় কড়া লোক। খুব চালাকচতুর এবং এই প্রৌঢ় বয়সে তার গায়ের জোরের পরিচয় অনেকবার পেয়েছি।

আজও কর্নেল ভোরবেলা ডঃ প্রসাদকে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। সামনের মাঠের ওপারে উঁচু পাঁচিলের মতো বিশাল পাহাড় দ্বীপের একদিন থেকে অন্যদিক পর্যন্ত চলে গেছে। দ্বীপটাকে নাকি দু'ভাগে ভাগ করেছে পাহাড়টা। কর্নেলেরা যান ওই পাহাড়ে।

এ দ্বীপের নাম ভেগা আইল্যান্ড। আর ওই পাহাড়টার নাম ওয়াকিমো মাউন্টেন। ওয়াকিমো কথাটার মানে নাকি 'বদরাগী'। পাহাড়টার এমন বিশ্রী নাম কেন? শুনেছি এ সমুদ্রে যারা মাছ ধরতে আসে, তাদের বিশ্বাস; ওখানে একটা বেজায় বদরাগী দানো বাস করে। তাই মাছধরা জাহাজ এই দ্বীপের ছায়া মাড়ায় না।

কর্নেল কি দানোটাকে জব্দ করতে এসেছেন তাহলে? মোটেও না। কর্নেল যা বলেছেন, শুনে তাক লেগে যায়। ওয়াকিমো পাহাড়ে এক বিচিত্র প্রাণীর বাস। প্রাণীটা নেকড়ে এবং কুকুরের মাঝামাঝি। পনের হাজার বছর আগে গুহাবাসী আদিম মানুষেরা জন্তু শিকার করে এনে গুহার ভেতর বসে মহানন্দে খেত। আর হাড়গোড় ফেলে দিত বাইরে। নেকড়েরা সেই লোভে গুহার কাছে জড়ো হত। কালক্রমে এই উচ্ছিষ্ট খাদ্য খেতে খেতে তারা শিকার করাই ভুলে গেল। মানুষ-ঘেঁষা হয়ে পড়ল। তারপর মানুষ তাদের বশ করে ফেলল। তারাই গৃহপালিত কুকুরের পূর্বপুরুষ।

কিন্তু মানুষের ভেতর যেমন, তেমনি জন্তুদের ভেতরও কিছু বেয়াড়া জীব থাকে। তেমন কিছু বেয়াড়া নেকড়ে মানুষের পোষা মানল না, অথচ শিকারের ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। তারা কী করল তখন? তারা অগত্যা পেটের জ্বালায় বাঁদর-হনুমানদের মতো উদ্ভিদভোজী—যাকে ইংরেজিতে বলে 'ভেজেটারিয়্যান' হয়ে গেল। গাছের পাতা, ফলমূল—এসব খেয়েই বেঁচে রইল।

প্রাণীবিজ্ঞানীদের ধারণা, এইসব জাত-খোয়ানো নেকড়ের বংশধর এখনও কোথাও টিকে থাকতে পারে। কর্নেল কোন সূত্রে খবর পেয়েছেন, ভেগা দ্বীপের পাহাড়ে নাকি সেই আজব নেকড়ে-কুকুর এখনও আছে। তাই প্রাণীবিজ্ঞানী ডঃ প্রসাদকে নিয়ে এখানে হাজির হয়েছেন।

আর আমি তো কর্নেল বুড়োর ছায়াসঙ্গী। যাকে বলে ন্যাওটা। তাই আমাকেও আসতে হয়েছে। পোর্টব্লেয়ার থেকে হেলিকপ্টারে আসতে ঘন্টা পাঁচেক লেগেছে। কিন্তু একটুও ক্লান্তি বা বিরক্তি জাগে নি। জিমকে সঙ্গে আনার কারণ, সেই আজব নেকড়ে-কুকুর বা কর্নেলের ভাষায় 'নেকুর' যদি একটা পাকড়াও করতে পারেন, পোষা কুকুরের সামনে তার আচরণ কেমনধারা হবে, পরীক্ষা করে দেখবেন। তাছাড়া জিমের জন্য একটা জরুরী কাজও আছে। জিমকে দেখিয়ে নেকুরদের ফাঁদে ফেলার

মতলব ছিল কর্নেলের। পোষা ঘুঘু পাখির সাহায্যে ব্যাধরা যেভাবে বুনো ঘুঘু পাখি ডেকে এনে ফাঁদে ফেলে, ঠিক সেইভাবে।

কিন্তু দ্বীপে এসে জিমের হাবভাব দেখে কর্নেল আপাতত সে মতলব কাজে লাগাচ্ছে না। লাগাতে চাইলে আমিও আপত্তি করতুম।

আজ তিন দিনের দিন একটা সন্দেহ জেগেছে। জিম কি তাহলে 'নেকুরের' ভয়ে এমন অস্থির?

কর্নেলের কাছে কথাটা তুলতে হবে। তবে জিম শক্তিমান অ্যালসেশিয়ান। তা গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। দশাসই গতর। একবার একজন খুনে গুণ্ডাকে প্রায় মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। জিমের মতো সাহসী দুর্দান্ত কুকুর শাকপাতা খেকো নেকুরকে ভয় পাবে বলে মনে তো হয় না।

কিন্তু কিছু বলাও যায় না। গরিলাও তো মাংসাশী প্রাণী নয়। অথচ গরিলাকে সিংহও ভয় পায়।

দুই

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে সকালে ক্যাম্পের সামনে চেয়ার পেতে বসে কফি খাচ্ছি। ষষ্ঠীচরণ তার কিচেন-তাঁবুর সামনে খোলামেলায় পিকনিকের উনুনের মতো উনুন বানাতে ব্যস্ত রয়েছে, কারণ কেরোসিন তত বেশি সঙ্গে আনা হয় নি এবং কতদিন এখানে থাকতে হবে তার ঠিক নেই। জিম আমার চেয়ারের পায়া ঘেঁষে বসে আছে—মুখটা বেজায় বিষণ্ণ। হঠাৎ ষষ্ঠীচরণ কাজ ফেলে আমার কাছে এসে কাঁচুমাচু মুখে একটু হেসে বলল, ছোট সাহেব যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলি।

বললুম, অত বিনয়ের অবতার তো তোমায় কোনদিন দেখি নি ষষ্ঠী। ব্যপারটা কী?

ষষ্ঠীচরণের হাসিটুকু মিলিয়ে গেল। সে গম্ভীর হয়ে চাপা গলায় বলল, আজ্ঞে, আমার বড্ড গা বাজছে।

অবাক হয়ে বললুম, সে কী হে ষষ্ঠী! তুমি অমন ডানপিটে সাহসী মানুষ। তোমার গা বাজছে মানে?

ষষ্ঠীচরণ আরও গলা চেপে বলল, এ দ্বীপটায় অমানুষ থাকে আজ্ঞে।

অমানুষ মানে? হাসতে হাসতে বললুম।। ও ষষ্ঠী! তুমি কি ভূতের ভয় পেয়েছ?

ষষ্ঠীচরণ এবার বসল। চারদিকটা দেখে নিয়ে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল, এইমাত্তর আমার ওপর টুপটুপ করে ঢিল পড়ছিল। আপনার দিব্যি ছোটসাহেব। মিথ্যে কথা আমায় কখনও বলতে শুনেছেন?

মার্চ মাসের উজ্জ্বল সকালবেলা। আকাশে মেঘের কুটোটিও নেই। তাঁবুর পেছনে অবশ্য একটু তফাতে ঝোপঝাড় আর গাছপালা আছে। কিন্তু সামনেটা ফাঁকা। সবুজ ঘাসের মাঠ ওয়াকিমো পাহাড়া পর্যন্ত ছড়ানো। এই ফাঁকা জায়গায় দিনদুপুরে ষষ্ঠীকে ভূতেরা ঢিল ছুঁড়ে নাকাল করেছে, ভাবতেই হাসি পায়। আমি হো-হো করে হেসে

বললুম, কই, চলো তো দেখি—ভূতের কেমন সাহস!

ষষ্ঠীচরণ বলল, বন্দুকটাও সঙ্গে নিন স্যার।

পা বাড়িয়ে বললুম, ভূতের গায়ে বন্দুকের গুলি বেঁধে না। কই, চলো দেখি। আয় জিম!

জিম যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওই আমার সঙ্গে এগোলো। মাত্র তিরিশ হাত তফাতে ষষ্ঠিচরণের কিচেন তাঁবু। ঠিক মাঝামাঝি পৌঁছেছি, হঠাৎ আমার গায়ে টুপটুপ করে কী যেন পড়ল কয়েকবার। ঠাহর করে দেখি, সেগুলো ক্ষুদে মার্বেলের মতো গড়নের গোল ঢিল। চারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে কাকেও দেখতে পেলুম না। দৌড়ে ওই তাঁবুর পেছনে গেলুম। কেউ কোথাও নেই। ওদিকটা প্রায় পঁচিশ গজ অব্দি ফাঁকা। তারপর জঙ্গল। জঙ্গল থেকে ঢিল ছুঁড়েছে কি? তারা কারা?

জিম আমার পেছনে-পেছন এসে মুখ তুলে দাঁড়িয়ে আছে। জঙ্গলের দিকে আঙুল তুলে তাকে ইশারা করলুম। কিন্তু জিম কথা মানল না। শুধু লেজটা গুটিয়ে কেমন চাপা শব্দ করতে লাগল।

ষষ্ঠীচরণ এগিয়ে এসে বলল, ঢিলটা পরখ করে দেখুন তো স্যার! এ তো ঢিল বলে মনে হচ্ছে না।

হাতের তালুতে রেখে দেখলুম, খুব হালকা ধুসর রঙের গুটি। গুটিটা শুকনো ঘাস দিয়ে তৈরি। সাধুবাবারা গাঁজা খাওয়ার জন্য নারকোল ছোবড়ার যেমন ক্ষুদে গুলতি বানায়, ঠিক তেমনি। কিন্তু এগুলো আরও ছোট। ওজনে হালকা হলেও দৈবাৎ চোখে লাগলে বিপদ হতে পারে।

ততক্ষণে ষষ্ঠীচরণ আরও কয়েকটা ভূতের ঢিল খুঁজে পেয়েছে। সেগুলো সে একটা কাগজের মোড়কে রেখে বলল, বড় সাহেবকে দেখাতে হবে। কী বলেন স্যার?

ভূত-পেরেতে আমার বিশ্বাস নেই। নিশ্চয় এভাবে ভুতুড়ে ঢিল ছুঁড়ে কারা আমাদের ভয় দেখাচ্ছে কোনো উদ্দেশ্যে। ব্যাপারটা দেখতে হয়।

দৌড়ে আমার তাঁবু থেকে রাইফেল নিয়ে বেরলুম। জিম অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে অনুসরণ করল। ষষ্ঠীচরণ ব্যাপার দেখে আরও ভয় পেয়ে বলল, ওরে বাবা! আমার কী হবে?

কিছু হবে না। ভূতেরা ঢিল ছুঁড়লে, তুমিও ঢিল ছুঁড়বে। বলে যেদিক থেকে ঢিলগুলো এসেছিল সেইদিকে এগিয়ে গেলুম।

কিন্তু আর ঢিল ছুঁড়ল না কেউ। ঝোপজঙ্গল দুর্ভেদ্য বললেই হয়। ভেতরে ঢোকার কোনো উপায় নেই। চোখে পড়ল, বড় বড় পাথরও রয়েছে জঙ্গল জুড়ে। একখানা প্রকাণ্ড একটা পাথর জঙ্গলের বাইরে অব্দি ছড়িয়ে রয়েছে দেখে সেখানে গেলুম। প্রথমে জিমকে তুলে দিলুম পাথরটার ওপর। তারপর আমি উঠলুম।

জঙ্গলের মাটিটা ক্রমশ ওদিকে ঢালু হয়ে নেমে গেছে বোঝা যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে একটা অদ্ভুত অস্বস্তির সৃষ্টি হল। ওই ঘন সবুজ জঙ্গলের ভেতর থেকে কে বা কারা যেন আমাকে দেখছে। তাদের দেখতে পাচ্ছি না, অথচ তারা আমাকে দেখছে—অস্বস্তিটার কারণ এই।

কিন্তু ভাল করে খুঁটিয়ে দেখেও কিছু সন্দেহজনক চোখে পড়ছিল না।

তবু হলফ করে বলতে পারি, একদল অদৃশ্য আজব প্রাণী যেন আড়াল থেকে আমার ওপর লক্ষ্য রেখেছে। কিছুতেই এ অনুভূতি মন থেকে তাড়াতে পারলুম না।

তারপর জিম একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। আমাকে ফেলে রেখে লাফ দিয়ে পাথর থেকে নামল। তারপর লেজ গুটিয়ে গলার ভেতর অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে খোলা ঘাসজমির উপর দিয়ে তাঁবুর দিকে দৌড়ল। আমি রেগেমেগে চিৎকার করে ডাকলুম, জিম! জিম! কী হচ্ছে! এই জিম!

জিম কান করল না। কিচেন-তাঁবুর পাশে ষষ্ঠীচরণ দাঁড়িয়ে আছে দেখলুম। তার হাতে একটা বল্লম কিংবা লাঠি। এতদূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না। জিম সটান গিয়ে আমার তাঁবুতে ঢুকে পড়ল।

পেছনে ঘুরে ছিলুম জিমের জন্য। এবার জঙ্গলের দিকে ঘুরেই চমকে উঠলুম।

আন্দাজ গজ বিশেক দূরে নীচে এমনি একটা পাথরের পাশে তিনটে বিদঘুটে প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে। তাদের ওপর রোদ্দুর পড়েছে বলে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

তারা মানুষের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের রঙ কালো কুচকুচে। গলা কাঠির মতো। মাথা তেকোনা এবং প্রকাণ্ড। নীচের ধড়টা ঝোপের ভেতর বলে বোঝা যাচ্ছে না কেমন। সবচেয়ে অদ্ভুত ওদের চোখ। তেকোনা মাথায় দুটো গোল রঙিন কাচের মতো মস্তো চোখের রঙ কখনও লাল, কখনও নীল, কখনও হলুদ হয়ে উঠছে।

আমার মাথায় পলকে ভেসে এল, ওরা যেন অতিকায় পিঁপড়ে। কিন্তু পিঁপড়েরা কি অমন খাড়া দাঁড়াতে পারে মানুষের মতো?

ভয় হল, ওরা আমাকে আক্রমণ করবে না তো? তাই রাইফেল তাক করলুম।

অমনি প্রাণীগুলো গা ঢাকা দিল পাথরের আড়ালে। বুঝলুম, জিম কেন ভয় পেয়েছে। এও বুঝলুম, ঘাসের গুলতিগুলোও কারা ছুঁড়ছিল।

তিন

বেলা দুটোয় কর্নেল এবং ডঃ প্রসাদ ঘেমে-তেতে ফিরলেন। নেকুরের লেজের ডগাটুকুও দেখতে পান নি। তবে ওয়াকিমো পাহাড়ের অনেকটা চিনে ফেলেছেন। পাহাড়টা যত দুর্গম দেখায়, তত কিছু নয়। সহজে ওঠা যায়, এবং যতদূর খুশি ঘোরাঘুরি করা যায়।

ঘাসের গুলতি আর পিঁপড়ে-মানুষের কথা শুনে প্রাণীবিজ্ঞানী ডঃ প্রসাদ তো ভীষণ উত্তেজিত। কর্নেল বললেন, বোঝা গেল, কেন ভেগা দ্বীপ ভুতুড়ে দ্বীপ বলে বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত হয়েছে। ক'বছর আগে এক জাহাজের কাপ্তেন আমাকে এখানকার পিঁপড়ে-মানুষের কথা বলেছিলেন, বিশ্বাস করি নি। এখন দেখা যাচ্ছে কথাটা সত্যি।

ডঃ প্রসাদ বললেন, কর্নেল! নেকুর থাক। এবং আমরা পিঁপড়ে-মানুষের দিকে

মন দিই।

আমি বললুম, একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। এই ঘাসের গুলতির রহস্যটা কী?

কর্নেল বললেন, এগুলো পিঁপড়ে-মানুষদের অস্ত্র। পোকামাকড় ওদের খাদ্য। এই গুলতি ছুঁড়ে ওরা পোকামাকড়কে কাবু করে। বুঝলে?

হাসতে হাসতে বললুম, ব্যাটারা আমাদেরও গুলতি ছুঁড়ে কাবু করবে ভেবেছে। একটা মানুষের মাংসে ওদের বছর চলে যাবে কি না!

ষষ্ঠীচরণ একটু তফাতে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে কথা শুনছিল। আতঙ্কে সে বলে উঠল, ওরে বাবা!

কর্নেল সকৌতুকে বললেন, ষষ্ঠী! তোমার গা-গতর দেখে ওদের বেজায় লোভ হয়েছে মনে হচ্ছে। নইলে প্রথম তোমার ওপর গুলতি ছুঁড়ল কেন ওরা?

ষষ্ঠীচরণ আরও ভয় পেয়ে করুণ স্বরে শুধু বলল, ওরে বাবা।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল আর ডঃ প্রসাদ একটা ফাঁদ নিয়ে বেরুলেন। যেখানে আমি পিঁপড়ে-মানুষদের দেখেছি, সেখানে কোথাও ফাঁদটা পেতে রাখবেন। সঙ্গে ষষ্ঠীচরণকেও নিয়ে গেলেন। সে দা দিয়ে কুপিয়ে জঙ্গল সাফ করে চলার রাস্তা বানাবে। যা দুর্গম জঙ্গল!

আমি রইলুম তাঁবুর পাহারায়। জিম সেই যে তাঁবুর ভেতর খাটের তলায় ঢুকেছে, আর বেরুবার নাম করে না। তার ওপর রাগ হচ্ছিল। খুব বকাবকি করলুম তাকে ভীতু বলে। শাসালুম, কলকাতায় ফিরে বেচে দেব ব্যাটাচ্ছেলেকে। জিম গ্রাহ্য করল না। শুধু গলার ভেতর সেই চাপা কান্নার মতো আওয়াজ করল।

বিকেল নেমেছে। গুলিভরা রাইফেল কাঁধে রেখে সতর্ক দৃষ্টে চারপাশে লক্ষ্য রেখে শান্ত্রীর মতো পায়চারি করছিলুম।

দূরে একপাল হরিণ চরছিল। মাথার ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে সামুদ্রিক পাখি উড়ে যাচ্ছিল। একসময় উত্তরদিকে জঙ্গলের মাথার ওপর একটা প্রকাণ্ড বেলুন দেখতে পেলুম। হলুদ রঙের বেলুনটা নিঃশব্দে ওদিকে কোথাও আস্তে আস্তে নামছে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। বেলুনটা গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হলে ব্যস্ত হয়ে উঠলুম। এই নির্জন আজব দ্বীপে বেলুন নামাটা বড় রহস্যময়।

তাঁবুর দরজায় পর্দা শক্ত করে বেঁধে তক্ষুণি বেরিয়ে পড়লুম ব্যাপারটা দেখতে। যেদিকে পিঁপড়ে-মানুষ দেখেছিলুম, এটা তার উল্টো দিক। ওদিক দিয়েই আমরা এ দ্বীপে ঢুকেছি। আমাদের হেলিকপ্টার ওদিকে সমুদ্রতীরে বালির বীচে নেমেছিল। যখন আমাদের দ্বীপ ছেড়ে যাওয়ার সময় হবে, তাঁবুর ভেতর রাখা বেতার যন্ত্রে খবর পাঠাবেন কর্নেল। তাহলে ওঁর বন্ধু এক সামরিক অফিসার হেলিকপ্টারটা নিয়ে আসবেন দ্বীপে।

জিমকে নাড়ানো যাবে না। তা না হলে ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতুম।

জঙ্গলের ভেতর দৌড়ে চললুম। একটু পরেই জঙ্গলের ওধারে ঢালু পাহাড়ী জমি নীচে সমুদ্রের বীচে গিয়ে মিশেছে। সেখানে দাঁড়িয়ে দেখি, বেলুনটা চুপসে বালির ওপর পড়ে রয়েছে। বেলুনের তলায় দড়িদড়া থেকে ঝুলন্ত প্রকাণ্ড বাস্কেটের

মত আসন। একটা বেঁটে গাব্দা মোটা লোক সবে বেরুচ্ছে। তার চেহারা চীনাদের মতো। কোমরে বাঁধা একটা লম্বাটে রিভলবার। লোকটাকে দেখে পছন্দ হল না। কেমন খুনেমার্কা চেহারা।

বেলুন সেভাবেই পড়ে রইল। লোকটা এদিকে ঘুরে ঢালু জমিটা বেয়ে উঠতে থাকল। তখন আমি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লুম।

সে জঙ্গলে ঢুকে পশ্চিমে এগোলো। তাকে অনুসরণ করতে থাকলুম। ফাঁকা মাঠের দিকে না গিয়ে সে সমুদ্রের সমান্তরালে জঙ্গলের ভেতরে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে সে দাঁড়াল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে পাথরের ওপর উঠল। তারপর তিনবার হাততালি দিল।

জঙ্গলের ভেতর ছায়া ততক্ষণে আরও ঘন হয়েছে। তবু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ওর ক্রিয়াকলাপ। মিনিটখানেক পরে যা দেখলুম, আমার তো চক্ষু চড়কগাছ। এ কি স্বপ্ন না সত্যি সত্যি ঘটছে!

পাথরের ওপাশ থেকে একদঙ্গল পিঁপড়ে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে।

লোকটা প্যান্টের পকেট থেকে মুঠো মুঠো কী সব জিনিস ছড়িয়ে দিল। আর পিঁপড়ে-মানুষগুলো কাড়াকাড়ি করে তা কুড়িয়ে খেতে থাকল। একটু পরে লোকটাকে দেখলুম ওদের সঙ্গে চলেছে। আমি আড়ালে-আড়ালে কিছুটা এগিয়ে গেলুম। কিন্তু পাথরের কাছে এসে ওদের হারিয়ে ফেললুম। ওরা যেন বেমালুম উবে গেছে।

এদিক-ওদিক সাবধানে খোঁজাখুঁজি করেও ওদের পাত্তা পেলুম না। ততক্ষণে পশ্চিমে ওয়াকিমো পাহাড়ের আড়ালে চলে গেছে সূর্য। জঙ্গল থেকে দক্ষিণে এগিয়ে ফাঁকা মাঠটায় পৌঁছলুম। তাঁবুর দিকে প্রায় দৌড়ে চললুম। জিমের জন্য ভাবনা হচ্ছিল।

আমার তাঁবুর সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হল। দরজার পর্দা ছেঁড়া। শুধু ছেঁড়া নয়, কুটিকুটি করে কেটে কেউ বা কারা ছড়িয়ে রেখেছে!

ভেতরে ঢুকে চেঁচিয়ে ডাকলুম, জিম! জিম!

জিমের সাড়া নেই। ক্যাম্প-খাটের তলা ফাঁকা; টর্চ জ্বেলে তাঁবুর ভেতরটা ভালো করে দেখে নিলুম। জিম নেই।

রাগে দুঃখে বাইরে বেরিয়েছি। কর্নেলদের সাড়া পাওয়া গেল। সন্ধ্যার আবছা আলোয় ওঁদের দেখা যাচ্ছিল। কথা বলতে বলতে হেঁটে আসছেন তাঁবুর দিকে।

চার

কর্নেল তাঁর ধুরন্ধর গোয়েন্দাবুদ্ধি প্রয়োগ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন, পিঁপড়ে-মানুষরাই জিমকে চুরি করে নিয়ে গেছে। তাকে উদ্ধার করতে হলে পিঁপড়ে—মানুষদের ডেরা খুঁজে বের করতে হবে। কর্নেলের ধারণা, জিমকে মেরে ফেলা ওদের উদ্দেশ্য নয়। অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। আপাতত সেটা বোঝা যাচ্ছে না।

এ রাতেও জ্যোৎস্না ছিল। আমরা চুপিচুপি একটা কাজ সেরে ফেললুম। সমুদ্রতীরের সেই বেলুনটা গুটিয়ে ধরাধরি করে নিয়ে এলুম তাঁবুতে। তারপর

পালাক্রমে রাইফেল হাতে পাহারা দিলুম। কিন্তু রাতে কোনো ঘটনা ঘটল না।

ভোরবেলা কর্নেল একা বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে জানালেন, ব্যাটাচ্ছেলেরা ফাঁদটাকে কুটিকুটি করে কেটেছে। তবে লুকিয়ে রাখা ক্যামেরায় ছবিগুলো উঠেছে। কর্নেলের ক্যামেরার কীর্তিকলাপ আমার জানা। অন্ধকারেও ছবি তুলতে ওস্তাদ।

ছবিগুলো প্রিন্ট করে দেখালেন। পিঁপড়ে-মানুষেরা ফাঁদ কীভাবে দাঁত দিয়ে কাটছে, তার পরিষ্কার ছবি উঠেছে!

ব্রেকফাস্ট সেরে আমি, কর্নেল ও ডঃ প্রসাদ বেরিয়ে পড়লুম উত্তরদিকের জঙ্গলে—যেখানে কাল সন্ধ্যায় বেলুনের লোকটাকে অদৃশ্য হতে দেখেছি।

সেই পাথরের কাছে গিয়ে দিনের আলোয় একটা ব্যাপার দেখতে পেলুম। পাথরের গায়ে সাদা আঁকিবুকি রয়েছে। পিঁপড়ে-মানুষদের ছবি আঁকার শখ? নাকি ওতে কিছু লেখা রয়েছে? তাহলে স্বীকার করতে হয়, ওরা মানুষের মতো লেখাপড়াও করে।

প্রাণীবিজ্ঞানী ডঃ প্রসাদ হেসে উড়িয়ে দিলেন। কর্নেল হাঁটু গেড়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে মাটিতে ও ঘাসে কিছু খুঁজছিলেন। ওই অবস্থায় বাঁ দিকে এগিয়ে আরও একটা বড় পাথরের কাছে গিয়ে চাপা গলায় বলে উঠলেন, পেয়েছি! পেয়েছি!

ডঃ প্রসাদ বললেন, কী পেয়েছেন কর্নেল?

কর্নেল কোনো জবাব না দিয়ে পাথরটার ওপর উঠতে শুরু করলেন। তারপর দেখি, উনি হঠাৎ উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ কী দেখার পর ইশারায় আমাদের ডাকলেন ডঃ প্রসাদ আর আমি পাথরে উঠে ওঁর মতো উপুড় হতেই এক বিচিত্র দৃশ্য দেখতে পেলুম।

পাথরের ওদিকে ঢালু হয়ে মাটিটা নেবে গেছে এবং একটা বিশাল গর্তের মতো সমতল জায়গায় অসংখ্য প্রকাণ্ড উইঢিবির মতো ঢিবি রয়েছে। ঢিবির দরজা আছে এবং জানালায় মতো ফোকরও আছে কয়েকটা। একখানে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে একদল পিঁপড়ে-মানুষ। মধ্যিখানে একটা বেদিমতো উঁচু জায়গা। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে একটা লাল পিঁপড়ে-মানুষ। ওর মাথায় ঘাসের মুকুট। মুকুটে রঙিন পালক গোঁজা এবং একটা উজ্জ্বল মণির মতো কী জিনিস—তা থেকে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ে চোখে ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

তার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার, বেদীর নীচে ঘাসের মোটা দাঁড়িতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে বেলুনের লোকটা।

আমরা দম আটকানো ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে শুয়ে ওই আজব দৃশ্য দেখতে থাকলুম। তারপর কানে এল, পিঁপড়ে-মানুষরা পোকামাকড়ের ডাকের মতো চাপা ক্ষীণ শব্দে কথাবার্তা বলছে। সে শব্দ এত চাপা যে মনে হচ্ছে, অনেক দূরে কোথাও হাজার হাজার পোকামাকড় ডাকছে।

তারপর যা দেখলুম, আমি লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম আর কী— কর্নেল টেনে ধরে ফের শুইয়ে দিলেন!

সামনেকার একটা ঢিবিঘর বেশ বড়ো—প্রায় ফুট ছয়েক উঁচু এবং ফুট তিনেক চওড়া। সেটার রঙ পাটকিলে। সেটা নিশ্চয় রাজার বাড়ি। সেখান থেকে চ্যাংদোলা

করে পিঁপড়ে-রক্ষীরা আমার জিমকে বের করে আনছিল।

পেছনে আরেকটা লাল পিঁপড়ে-মানুষ। নিশ্চয় রানী। কিন্তু জিম যেন মড়া। টুকটুক করে তাকাচ্ছে। নির্জীব অবস্থা।

রানী বেদিতে উঠে রাজার পাশে দাঁড়াল। জিমকে পিঁপড়ে রক্ষীরা তাদের পায়ের কাছে বেদির ওপর শুইয়ে দিল। কিন্তু আশ্চর্য, জিম ছাড়া পেয়েও তেমনি নির্জীব হয়ে পড়ে রইল।

এবার রানীকে দেখলুম দু'হাত তুলে জোরে নাড়ছে। তারপর ঢিবি রাজ-বাড়ির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল একটা অদ্ভুত প্রাণী। ধূসর-রঙের হায়নার মতো দেখতে। কিন্তু অত কুৎসিত নয়। বরং নেকড়ে বলে মনে হল। পিঁপড়ে রানীর মাথাতেও মুকুট আছে। মুকুটে ফুল গোঁজা। রানী একটা ফুল মুকুট থেকে নিয়ে একটু ঝুঁকে দাঁড়াল। প্রাণীটা বেদিতে উঠে খপ করে কলটা মুখে পুরল। চিবুতে থাকল। তারপর জিমের গা শুঁকতে শুরু করল।

ডঃ প্রসাদ উত্তেজিতভাবে ফিসফিস করে বললেন, নেকুর! নেকুর!

নেকুর তাহলে পিঁপড়ে-মানুষদের কাছে পোষ মেনেছে! অবাক হয়ে নেকুর দেখতে থাকলুম। জন্তুটা জিমকে যেন আদর করছে। জিম তেমনি নিঃসাড়।

জিমের চারপাশে ঘুরে নেকুরটা খেলা করতে থাকল। সবাই এবার ভিড় করে খেলা দেখছিল। ঢিবিঘরগুলো থেকে ছোটবড় সব পিঁপড়ে-মানুষ ভিড় জমিয়েছে ততক্ষণে। এইসময় কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, সাবধানে নেমে এস তোমরা। ঢিবিঘরগুলো পেছনে গিয়ে লুকিয়ে থাকো। তারপর কী করতে হবে, বলে দেব'খন।

সাবধানে তিনজনে পাথরের টুকরো আর খাঁজের আড়ালে নীচে নেমে গেলুম। বুঝলাম এই সমতল বিশাল গর্তমতো জায়গাটা কোন যুগের আগ্নেয়গিরির ক্রেটার। ঢিবিঘরের পেছনে ঝোপের আড়ালে তিনজনে বসে পড়লুম।

তারপর দেখি, কখন ওদের অজান্তে বেলুনের লোকটা দড়ির বাঁধন খুলে ফেলেছে। সে উঠে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাক করে বেমক্কা রিভলবার থেকে গুলি ছুঁড়ল পরপর দু'বার।

পলকের মধ্যে হুলস্থূল পড়ে গেল। পিঁপড়ে মানুষেরা পিলপিল করে এদিকে ওদিকে ক্রেটারের কিনারায় ঢালু পাড়া বেয়ে উঠল এবং পালিয়ে গেল। রাজা ও রানী যেন হতভম্ব! স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে। লোকটা বেদির ওপর লাফ দিয়ে উঠল এবং রাজার মুকুট ধরে টানাটানি শুরু করল।

নেকুরটা জিমকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল। এবার আচমকা গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকটার ওপর। রিভলবার ছিটকে পড়ল নীচে। নেকুরটা ওর গলা কামড়ে ধরেছে! লোকটা বিকট আর্তনাদ করে হাত-পা ছুঁড়ছে।

কর্নেল বলে উঠলেন—চলে এস সবাই!

আমরা যেই দৌড়ে গেছি, রাজা-রানী তীরের মতো ছুটল উল্টোদিকে। বেদির কাছাকাছি পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে নেকুরটাও দৌড়ে পালিয়ে গেল। কর্নেল বেলুনের লোকটার কাছে হাঁটু দুমড়ে বসলেন। ওর গলাটা ফাঁক হয়ে গেছে। গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। ওকে বাঁচানোর উপায় ছিল না। এক মিনিটের মধ্যে হাতা-পা খিঁচিয়ে

ওর দেহটা শক্ত হয়ে গেল। সেই বীভৎস দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলুম।

জিম আমাকে দেখে এতক্ষণে ওঠার চেষ্টা কল। পারল না। ওকে দু'হাতে বুকের কাছে তুলে নিলুম। ওর শরীর থরথর করে কাঁপছিল।

কর্নেল লোকটার পকেট হাতড়ে একটা নোটবই পেলেন। চীনা ভাষায় কী সব লেখা আছে। নোটবইটা নিজের পকেটে ঢুকিয়ে কর্নেল বললেন, আসুন ডঃ প্রসাদ, আমরা এখান থেকে কেটে পড়ি। বেচারি পিঁপড়ে-মানুষদের বিব্রত করে লাভ কী? ওদের কচি বাচ্চারা নিশ্চয় ঘরে আছে। ওরা না ফিরলে না খেয়ে মারা পড়বে।

ঠিক তাই। ঢিবিঘরের দরজায় ক্ষুদে পিঁপড়ে-মানুষেরা উঁকি দিচ্ছিল। দেখে মায়া হয়। আমরা চলে এলে ওদের মা-বাবা ফিরে এসে খেতে দেবে। এ-বেলা হয়তো বেলুনের লোকটার মাংস দিয়েই পিঁপড়েপুরীতে বড় রকমের একটা ভোজ হবে।

পাঁচ

তাঁবুতে ফিরে দেখি আরেক কাণ্ড। ষষ্ঠীচরণ বন্দী। কিচেন-তাঁবুর ভেতর তার ক্যাম্পখাটে ওকে কারা আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। যা দিয়ে বেঁধেছে, তা শক্ত ঘাসের দড়ি। ও ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে। মুখে কথা নেই।

কর্নেল একটা ছুরি দিয়ে বাঁধন কেটে ওকে মুক্ত করলেন। তখন ষষ্ঠীচরণ উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙল এবং জব্বর একটা হাই তুলল।

বললুম, ব্যাপার কি ষষ্ঠী?

ষষ্ঠীচরণ বলল, খুব ঘুম পেয়েছিল স্যার!

তার জবাব শুনে অবাক হয়ে বললুম, কিন্তু তোমায় এমন করে বেঁধেছিল কারা?

এতক্ষণে ষষ্ঠীচরণের যেন খেয়াল হল। কাটা দড়িগুলো দেখে নিয়ে বলল, তাহলে আমাকে সত্যি সত্যি বেঁধেছিল ব্যাটাচ্ছেলেরা? আমি ভাবছি, স্বপ্ন দেখছিলুম। ওরে বাবা! এ কি বিদঘুটে জায়গায় এসে পড়েছি।

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, তুমি নিশ্চয় আরাম করে খাটে শুয়েছিলে?

ষষ্ঠীচরণ জিভ কেটে বলল, অন্যায় হয়ে গেছে স্যার। মাফ করে দিন। আপনারা যাওয়ার পর ঢুলুনি পেয়েছিল। ভাবলুম একটু শুয়ে নিই। রাত্তিরে তরাসে ঘুম হয় না কিনা!

কর্নেল বললেন, ভাগ্যিস, তোমাকে পিঁপড়ে-মানুষেরা ধরাধরি করে জিমের মতো বয়ে নিয়ে যায় নি! তাহলে আজ দুপুরের খাওয়া-দাওয়া আর জুটত না আমাদের।

ষষ্ঠীচরণ ভয় পেয়ে বলল, ওরে বাবা! তারপর সে ব্যস্তভাবে উনুন ধরাতে গেল।

আমরা কর্নেলের তাঁবুতে গেলুম। ডঃ প্রসাদ বললেন, লোকটার নোটবইয়ে নিশ্চয় সব কথা লেখা আছে। চীনা ভাষা জানলে ভাল হল। কিন্তু.......

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, আমি অল্পস্বল্প জানি চীনাভাষা। দেখি, কী লেখা আছে।

কর্নেল মিনিট দশেক ধরে নোটবইটা নিয়ে মেতে রইলেন। আমরা দুজনে চুপচাপ

কৌতূহল নিয়ে বসে রইলুম। তারপর কর্নেল বললেন, লোকটার নাম সান ওয়ান-সু। হংকং-এ বাড়ি। কীভাবে ভেগা দ্বীপের পিঁপড়ে-মানুষদের কথা জেনেছিল, লেখা নেই। তবে এটুকু লেখা আছে, মোট তিনবার এসেছে এর আগে। পিঁপড়ে-মানুষদের রাজার মুকুট যে বহুমূল্য মণি দেখেছি, আমরা, সান ওয়ান-সু ওটা হাতাতে চেয়েছিল।

ডঃ প্রসাদ বললেন, ওদের সঙ্গে ভাব করল কীভাবে, লেখা নেই?

কর্নেল বললেন, আছে। প্রথমবার এসে ওদের গতিবিধি জেনে গিয়েছিল আড়াল থেকে। দ্বিতীয়বার সঙ্গে এনেছিল একটা প্রকাণ্ড কেক।

বললুম, কেক দিয়ে পিঁপড়ে-মানুষদের সঙ্গে ভাব করেছিল? ভারি বুদ্ধিমান তো।

কর্নেল বললেন, হ্যাঁ। তৃতীয়বার সঙ্গে এনেছিল এক বস্তা চিনি।

বললুম, কিন্তু এবার তার সঙ্গে কিছু ছিল না। আমি দেখেছি!

কর্নেল হাসলেন। বললেন, এই চতুর্থবার সে যা এনেছিল, তা বেলুনের বাস্কেটে এখন আছে। ওই যে দেখছ প্যাকেট বাঁধা জিনিসটা, ওটা লজেঞ্চুস।

আমরা সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলুম। কর্নেল ফের বললেন, প্যাকেটটা সঙ্গে নিয়ে কেন যায় নি, একটু ভাবলেই বোঝা যায়। আমার মনে হচ্ছে, পিঁপড়ে-মানুষদের রাজাকে সে সমুদ্রের ধারে তার বেলুনের কাছে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। হয়তো বলেছিল, ওখানে গেলেই রাজাকে উপহারটা দেবে। তার মতলব ছিল, ওইভাবে ডেকে নিয়ে গিয়ে মণিটা কেড়ে নিয়ে বেলুনে চড়ে পালাবে। কিন্তু পিঁপড়ে-মানুষেরা বুদ্ধিমান। ওর মতলব টের পেয়েছিল।

আমরা বুদ্ধি খেলল এবার। বললুম, উঁহু। তা নয়। বেলুনটা আমরা নিয়ে এসেছিলুম বলে সমুদ্রের ধারে গিয়ে যখন পিঁপড়ে-মানুষরা কিছু পায় নি, তখন রেগে গিয়ে ওকে বন্দী করেছিল।

কর্নেল সায় দিলে বললেন, মন্দ বলো নি জয়ন্ত। সম্ভবত...

কর্নেলের কথা হঠাৎ বন্ধ হল। উনি কোণের দিকে গুটিয়ে রাখা বেলুনটার দিকে হঠাৎ এগিয়ে গেলেন। তারপর বলে উঠলেন, সর্বনাশ! বেলুনের অবস্থাটা কী করেছে! কুটিকুটি করে রেখে গেছে যে!

আমি ও ডঃ প্রসাদ হুমড়ি খেয়ে দেখতে লাগলুম। বেলুনের ভাঁজকরা রবারটা আর আস্ত নেই। ঝাঁঝরা হয়ে হয়েছে। তার মানে বেলুনটা আর ওড়ানো যাবে না। দোলনার মতো বাস্কেটটা টিকে আছে। তার মধ্যে বসার আসন, লজেন্সের প্যাকেট, অল্পস্বল্প কলকব্জা রয়েছে। পিঁপড়ে-মানুষেরা সে সব ছোঁয়নি। লজেন্সের প্যাকেটটা অন্তত নিয়ে পালানো উচিত ছিল। কেন নেয় নি?

ডঃ প্রসাদ একটু হেসে বললেন, আমরা লজেন্সগুলো দিয়ে ওদের সঙ্গে ভাব করব। কী বলেন কর্নেল?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, ওই লজেন্সে তীব্র বিষ মেশানো আছে, ডঃ প্রসাদ।

আমরা দুজনে আঁতকে উঠলুম, সে কী! কীভাবে বুঝলেন?

কর্নেল বললেন, ওই দেখ, কত ক্ষুদে পিঁপড়ে আর পোকামাকড় মরে পড়ে রয়েছে। তাই দেখে পিঁপড়ে-মানুষেরা প্যাকেটটা ছোঁয় নি। এবার আশাকরি বুঝতে পারছ, লোকটাকে কেন ওরা অমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে শাস্তি দিচ্ছিল।

ডঃ প্রসাদ বললেন, সর্বনাশ! পিঁপড়ে-মানুষেরা দেখছি ভারি ধূর্ত। আমরা বেরিয়ে গেছি, আর ওরা সেই ফাঁকে এতসব কাণ্ড করেছে। তার মানে, ওরা সারাক্ষণ আমাদের চোখে-চোখে রেখেছে। কিন্তু ওদের আস্তানা থেকে আমরা এতদূরে রয়েছি। আমরা ওদের আস্তানায় পৌঁছবার আগেই অত তাড়িতাড়ি কীভাবে ওরা এখানে এল এবং ফিরে গেল?

কর্নেল বললেন, সেটা একটা রহস্য বটে। আমার মনে হচ্ছে এখানে কোথাও একটা সিধে পথ আছে, মাটির তলায়-তলায়। অর্থাৎ সুড়ঙ্গ পথ। খুঁজে দেখা যাক।

তাঁবুর বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম তিনজনে। জিম আমার সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। নিভে যাওয়া আগ্নেয়গিরির ক্রেটার অর্থাৎ পিঁপড়ে-মানুষদের বসতি এখান থেকে উত্তর পশ্চিম কোণে মাইলটাক দূরে। ওদিকটা জঙ্গল আর পাহাড়ে বড় দুর্গম দেখাচ্ছে।

এই সময় হঠাৎ জিম একটা চাপা-গরগর আওয়াজ করল। আগের আতঙ্ক মেশানো আওয়াজ। তারপর এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলুম।

আমাদের সামনে খোলামেলা ঘাসের মাঠে আচম্বিতে পিলপিল করে কালো রঙের পিঁপড়ে-মানুষ যেন মাটি খুঁড়ে বেরুল। অসংখ্য জায়গা থেকে অসংখ্য পিঁপড়ে-মানুষ আর তাদের সঙ্গে সেই নেকুরের পাল।

বুঝলুম অজস্র গর্ত ছিল। ঘাসের আড়ালে। ওগুলো সুড়ঙ্গপথ। সেখান দিয়ে বেরিয়ে গোটা মাঠ জুড়ে একটা মোটা কালো রেখার মতো দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সামনে একটা করে নেকুর নিয়ে একজন করে পিঁপড়ে-মানুষ। নিশ্চয় ওরা সেনাবাহিনী।

তারপর দীর্ঘ সেই কালো রেখা অর্ধবৃত্তাকার হয়ে এগিয়ে আসতে থাকল আমাদের দিকে। কতক্ষণ হতবাক হয়েছিলুম কে জানে! হঠাৎ কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন, সমুদ্রের কাছে চলো সবাই! সমুদ্রের কাছে! তারপর দৌড়ে তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন।

কখন ষষ্ঠীচরণ রান্না ফেলে আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। সে বলে উঠল, ওরে বাবা!

আমি রুদ্ধশ্বাসে বললুম, রাইফেল এনে গুলি ছুঁড়ি কর্নেল!

কর্নেল তাঁবুর ভেতর থেকে শুনতে পেয়ে বললেন, না জয়ন্ত; গুলি করে ওদের শেষ করে যাবো না। সারা দ্বীপের মাটির তলায়-তলায় দুর্গের মতো কোটি কোটি পিঁপড়ে-মানুষ রয়েছে মনে হচ্ছে; এস, সবাই সমুদ্রের দিকে পালাই।

আমরা চারজনে সব কিছু ফেলে পুবে সমুদ্রের দিকে দৌড়ে চললুম। কর্নেল শুধু বেতার যন্ত্রটা সঙ্গে নিয়েছেন দেখা গেল।

যখন বীচে পৌঁছলুম, তখন আমাদের দম আটকানো অবস্থা। বুঝতে পারছিলুম না, এখানে কীভাবে ওদের হাত থেকে বাঁচব। এদিকে সমুদ্র অনেকটা শান্ত! কর্নেল সোজা জলে নেমে গিয়ে ডাকলেন, এস জয়ন্ত। আসুন ডঃ প্রসাদ। আমরা এখন নিরাপদ।

ষষ্ঠীচরণ কর্নেলের দিকেই জলে নেমেছে। ঢেউয়ের ঝাপটায় কোমর অব্দি ভিজে যাচ্ছে ওদের। আমি ডঃ প্রসাদও ওদের কাছে গেলুম। বললুম, কর্নেল! আমরা এখানে কীভাবে নিরাপদ? ওই তো ওরা এগিয়ে আসছে!

কর্নেল বেতার যন্ত্রের চাবি ঘুরিয়ে কোন বেতার ধরে রেখেছি। বললেন, ওরা জলকে বড় ভয় পায়।

জিমকে আমি দু'হাতে বুকের কাছে ধরে রেখেছি। সে থরথর করে কাঁপছে। বীচের ওধারে উঁচু ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে নেমে আসছে পালে পালে নেকুর। বীভৎস তাদের মুখভঙ্গি। জিভ লকলক করছে। পিঁপড়ে-মানুষেরা তিড়িং-বিড়িং করে নাচতে নাচতে আসছে ওদের পেছন-পেছন।

বীচের বালিতে এসে ওরা থমকে দাঁড়াল।

কর্নেল বেতার যন্ত্রে কার সঙ্গে কথা বলছিলেন। শুনলুম উনি বললেন, হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভেগা আইল্যান্ড। শীগগির হেলিকপ্টার নিয়ে আসুন। আমরা বিপন্ন।

ষষ্ঠীচরণ চোখ বুজে ঠক ঠক করে কাঁপছে একহাঁটু জলে। জিম আমার বুকে মুখ লুকিয়েছে। ডঃ প্রসাদ বিড়বিড় করে বলেছেন, আহা! ক্যামেরাটা আনলে কত ভাল হত! কেউ কি বিশ্বাস করবে আমাদের কথা?

কথাটা কানে যেতেই কর্নেল প্রায় আর্তনাদ করে বললেন, ওই যাঃ! আমার ক্যামেরাটা আর কি ফিরে পাবো? কী ভুলো মন আমার!

উজ্জ্বল রোদে সোনালী বীচের ওপর পালে পালে জিভ বের করা নেকুর আর অসংখ্য পিঁপড়ে-মানুষ একইভাবে দাঁড়িয়ে।

ঘরের ছেলে বেঁচে-বর্তে ভেগা আইল্যান্ড থেকে ঘরে ফিরতে পেরেছিলুম, এই যথেষ্ট! দিন সাতেক পরে পোর্টব্লেয়ার থেকে কর্নেল তাঁর বন্ধু, বিমান বাহিনীর সেই জাঁদরেল অফিসারের সাহায্যে হেলিকপ্টারে চেপে ভেগা দ্বীপে তাঁর অত্যদ্ভুত ক্যামেরা আর আমার রাইফেলের খোঁজে পাড়ি জমিয়েছিলেন। কিন্তু কোথায় ভেগা দ্বীপ? দ্বীপটা যেন বেমালুম তলিয়ে গেছে ভারত মহাসাগরে। অনেক ওড়াউড়ি তরে তাঁরা ফিরে আসেন।

এখন কর্নেল বলেন, তাহলে কি আমরা চারজনেই একইরকম বিদঘুটে স্বপ্ন দেখেছিলুম?

ষষ্ঠীচরণ বলে, তা আর বলতে?

আমিও সায় দিয়ে বলি, ঠিক ঠিক। স্বপ্নই বটে। তবে যদি ক্যামেরা বা রাইফেল হারায়, তাহলে তো বড় রহস্যের ব্যাপার। ও কর্নেল, জীবনে এত রহস্যের সমাধান করেছেন, এটা করবেন না?

কর্নেল উদাসভাবে শুধু বলেন, তাই তো!

দারোগা, ভূত ও চোর

কৈলাসপুর থানার দারোগাবাবু ভূতনাথ পাত্রের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল নেহাত দৈবদুর্বিপাকে। পাড়াগাঁয়ের এক রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে গিয়েছিলুম। সবে উদ্বোধনী সঙ্গীত শেষ হয়েছে, হৈ হৈ রৈ রৈ করে তেড়ে এসে গেল কালবোশেখী। যেমন ঝড়, তেমনি বৃষ্টি। সে এক ধুন্ধুমার অবস্থা। মঞ্চের

তেরপল উড়ে গিয়ে কোন তেপান্তরে মাঠে পড়ল কে জানে। গাঁয়ের লোকজন আর কাচ্চাবাচ্চা যে যার বাড়ি গিয়ে ঢুকল। উদ্যোক্তাদের আর খুঁজে পেলুম না। একে তো ভর-সন্ধেয় অনুষ্ঠান শুরু, তার ওপর ঝড়বৃষ্টির কালো রঙ সন্ধেটাকে বেজায় আলকাতরা করে ফেলল। ভাগ্যিস বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। মাথা বাঁচাতে দৌড়ুচ্ছিলুম দিশেহারা হয়ে। বিদ্যুতের ঝলকানিতে ঘন গাছপালার ভেতর একটা বাড়ি দেখে তার বারান্দায় উঠলুম। কিন্তু বারান্দায় টেকা দায়। দরজায় ধাক্কা দিতে গিয়ে দেখি, ভাঙা। ভেতরে ঢুকে পড়লুম।

পকেটে দেশলাই ছিল। ভিজে গেছে ততক্ষণে। কোনরকমে একটা কাঠি জ্বালিয়ে যা দেখলুম, তাতে স্বস্তি পেলুম না। মেঝেয় আর্বজনার ডাঁই, ইঁদুরের গর্ত, চামচিকের নাদি—একটা সাপের খোলস পর্যন্ত।

সর্বনাশ! বাড়িটা যে দেখছি পোড়োবাড়ি। ভূতকে যদি বা মন্তরতন্তর আওড়ে জব্দ করতে পারি, সাপকে মন্তরতন্তরে বশ করব এমন ওঝা তো আমি নই। কারণ শুনেছি সাপ কানে শোনে না। ভূত কিন্তু দিব্যি শুনতে পায়। কারণ তার আমাদের মতোই একজোড়া কান আছে— সে কান যত বিদঘুটে গড়নেরই হোক না কেন। সাপের যে কানই নেই।

মরিয়া হয়ে ওপাশের আরেকটা ভাঙা দরজা পেরিয়ে আরেকটা ঘরে ঢুকলুম। ফের দেশলাই জ্বেলেই দেখি একটা সাইকেল চক চক করছে। তাহলে মানুষ আছে।

কিন্তু যেই সাইকেলের মালিককে ডাকতে গেছি, দেশলাই কাঠিটাও নিভেছে এবং কেউ শক্ত হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে গর্জে বলে উঠল, তবে রে ব্যাটা চোর!

আর্তনাদ করে উঠলুম, আঃ! লাগছে, লাগছে! ছাড়ুন—আমি চোর নই। আমি প্রধান অতিথি।

মুখের ওপর অনেকটা উঁচু থেকে আওয়াজ এল, কী বললে?

প্রধান অতিথি। হাঁফাতে হাঁফাতে বললুম। আমি এখানে রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলুম।

লোকটা আমাকে ছেড়ে দিল। তারপর টর্চ জ্বেলে ভাল করে আমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে বলল, হুম্ সেইরকমই মনে হচ্ছে বটে। মহাশয়ের নাম?

নাম বললে তাগড়াই উঁচু লোকটা নমস্কার করে বলল, যাক গে। আলাপ করে বেজায় আনন্দ হল। আপনার এক গুণমুগ্ধ পাঠক আমি।

জিগ্যেস করলুম, আপনার নামটা জানতে পারলে আনন্দ হত।

আমি ভূতনাথ পাত্র। কৈলাসপুর থানার চার্জে আছি। ....ভূতনাথ দারোগা প্রাণখোলা হেসে বললেন, আর বলবেন না মশাই। এ গাঁয়ে এসেছিলুম একটা দাগী আসামী ধরতে। ঝড়বৃষ্টির চোটে সে ব্যাটাকে কায়দা করতে পারলুম না। সেপাইরাও মাথা বাঁচাতে কে কোথায় কেটে পড়ল। আমিও বেগতিক দেখে এই পোড়োবাড়িতে আশ্রয় নিলুম।

ভূতনাথবাবুকে খুব অমায়িক লোক বলে মনে হচ্ছিল। একথা-সেকথার পর জিগ্যেস করলুম, এ পোড়োবাড়িটা কার জানেন দারোগাবাবু?

ভূতনাথ বললেন, শুনেছি এ বাড়িটার মালিক কোনো এক হারাধনবাবু। একা

থাকতেন। তাঁকে এক রাত্তিরে ডাকাত এসে খুন করেছিল।

চমকে উঠে বললুম, সর্বনাশ! তারপর?

ভূতনাথ বললেন, তারপর আর কী? হারাধনবাবুর মৃত্যুর পর বাড়ির মালিকানা নিয়ে ওঁর আত্মীয়দের মধ্যে মামলা বাধে। সেই মামলা এখনও চলছে। এদিকে বাড়ির অবস্থা তো দেখছেন। শ্যাল-কুকুর প্যাঁচা-ছুঁচো-চামচিকের আখড়া হয়ে উঠেছে। ভূত থাকাও আশ্চর্য নয়। ওই যে আপনি 'ভূতের কেত্তনে' লিখেছেন, বাড়ি খালি পড়ে থাকলেই ভূতেরা এসে জোটে এবং রাত-বিরেতে কেত্তন গায়।

ভূতনাথ দারোগা হ্যা হ্যা খ্যাঁক খ্যাঁক করে প্রচণ্ড হাসতে থাকলেন। ওদিকে বাইরে তুলকালাম ঝড়, বৃষ্টি, বাজের ডাক—সে এক প্রলয়কাণ্ড চলেছে।

হাসি থামিয়ে ভূতনাথ বললেন, এই পোড়োবাড়িতে ভূত থাকলে সত্যি বড় মজা হত। বুঝলেন? ভূতের সঙ্গে জমিয়ে এখন আড্ডা দেওয়া যেত। কেত্তন শুনতেও আপত্তি ছিল না—যদিও কেত্তন জিনিসটা আমার ধাতে সয় না। কারণ, ওতে গানের চাইতে খোল-কত্তালের আওয়াজ বড্ড বেশি। আপনার কী মত?

বললুম, ঠিকই বলেছেন। তবে কী জানেন? ভূত নিয়ে বই লিখি-টিখি বটে, কিন্তু চর্মচক্ষে ভূত দেখতে আমার আপত্তি আছে।

কেন, কেন? ভূতনাথ দারাগো খুব আগ্রহের সঙ্গে জিগ্যেস করলেন।

বইয়ের ভূতেরা মারাত্মক হয় না। সত্যিকার ভূত খুব সাংঘাতিক বলেই আমার ধারণা। তারা নাকি ঘাড় মটকে মানুষকে মেরে ফেলে। ...ভয়ে-ভয়ে কথাটা বলে এদিক-ওদিক তাকালাম। জানালাও ভাঙা। বিদ্যুতের ঝিলিকে বাইরের উঠোন দেখা যাচ্ছে। ঘরে দারুণ অন্ধকার। ভূতনাথ টর্চ নিভিয়ে ফেলেছেন কখন।

দারোগাবাবু খিকখিক করে হেসে বললেন, ধুর মশাই। ভূতের আবার সত্যি-মিথ্যে আছে নাকি? ভূত ইজ ভূত। ভূতকে ভয় পেতে নেই। তাছাড়া আমি পুলিশের দারোগা। আমায় দেখলেই ভূতের হৃৎকম্প হয়।

এই সময় খ্যানখেনে গলায় ভেতরের দরজায় কাছে কে বলে উঠল, কে বাপু তোমরা খালি ভূত ভূত করছ তখন থেকে?

ভূতনাথ টর্চের বোতাম টিপলেন হয়তো, পুট্ পুট্ আওয়াজ শুনলুম। কিন্তু আলো জ্বলল না। ভূতনাথ রেগেমেগে বললেন, ধ্যাত্তেরি!

আমি আরেকজন মানুষের সাড়া পেয়ে প্রথমে চমকালেও পরে সাহসী হয়েছি। বললুম, তুমি কে হে? সে বলল, তখন থেকে ভেতরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি আর তোমাদের ভূতের কেত্তন শুনছি। আমার ভয় পায় না বুঝি?

ভূতনাথ খাপ্পা হয়ে বললেন, তুমিই আস্ত ভূত। সাড়া না দিয়ে বাইরে দাঁড়িয়েছিলে কোন মতলবে? কে তুমি? বাড়ি কোথায়?

লোকটাও চটেমটে বলে উঠল, দারোগাই হও আর যেই হও বাপু, ভদ্রতা করে কথা বলবে। ইস্! বলে—কে তুমি, বাড়ি কোথায়? আমার বাড়িতে আমারই শোবার ঘরে ঢুকে আমাকে ধমক দিয়ে দেওয়া হচ্ছে! কী স্পর্ধা!

আমার একটু সন্দেহ জাগল। বললুম, মশায়ের নাম কি হারাধনবাবু?

আবার কী? আমি সেই হারাধন জোয়ারদার।

আমার বুকে হাতুড়ির শব্দ হতে থাকল! দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালাম। কিন্তু ভূতনাথ দারোগা হা-হা করে উঠলেন। বললেন, এ ব্যাটা নির্ঘাৎ উন্মাদ। বদ্ধ পাগল। হারাধনবাবু শুনেছি মান্ধাতার আমলে ডাকাতের হাতে খুন হয়ে মারা পড়েছেন!

চোপরাও! লোকটা গর্জে উঠল। কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ যেন। তারপর ভেংচি কেটে বলল, ডাকাতের হাতে খুন হয়ে মারা পড়েছে—তো কী হয়েছে?

দারোগাবাবু আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, শুনছেন? শুনেছেন মশাই ব্যাটার কথা?

এই! ব্যাটা ব্যাটা কোরো না বলে দিচ্ছি! মানহানির মামলা করব। লোকটা শাসাল। আমার মাসতুতো ভাইয়ের নাতির বন্ধু এম. এল. এ। আমার ভাগ্নের সম্বন্ধীর খুড়ো এম . পি-র প্রাইভেট সেক্রেটারি। আমার মেজদার শ্বশুর বিলেতে এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাপের ক্লাসফ্রেন্ড ছিলেন। সাবধান!

ভড়কে গিয়ে ভূতনাথ দারোগা বললেন, আহা! ব্যাটা কি আপনাকে বলছি, বলছি আপনার ব্যবহারকে। আগে সাড়া নেই শব্দ নেই, হঠাৎ অমন করে কথা বলতে শুরু করলেন। তার ওপর বলছেন এক সৃষ্টিছাড়া কথা। যে মানুষ ডাকাতের হাতে খুন হয়, সে বেঁচে থাকে কেমন করে? বলুন না—এটা কি কেউ মানবে?

প্রচণ্ড শব্দ করে কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়ল। বাড়িটা কেঁপে উঠল থরথর করে! ভয় হল, ছাদ ভেঙে পড়বে না তো?

লোকটা দারোগাবাবুর কথায় একটু শান্ত হয়ে বলল, দেখ বাপু। সত্যি বলছি, আমি মরিনি। হ্যাঁ—আমার দেহটা পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছে; কিন্তু আত্মা? আত্মার তো বিনাশ নেই।

ভূতনাথ দারোগা আরও ভড়কে গিয়ে বললেন, আপনি যদি হারাধনবাবুর আত্মা, তাহলে যে দেহ ধরে এসেছেন এবং কথা বলছেন, সেই দেহটা কোথায় পেলেন?

চুরি করেছি।

চুরি! আপনি তাহলে চোর! দারোগাবাবু পা বাড়াচ্ছেন টের পেলুম অন্ধকারে। জানেন? আপনাকে তাহলে আমি অ্যারেস্ট করতে পারি।

আবার ঝগড়া বাধবে দেখে বললুম একটা কথা হারাধনবাবু। কার দেহ চুরি করেছেন?

পাঁচু নামে একটা লোকের।

ভূতনাথ প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন, সেই দাগী হারামজাদা পাঁচুর? কী কাণ্ড! আজ এ গাঁয়ে পাঁচুকেই তো পাকড়াও করতে এসেছিলুম!

আমি উদ্বিগ্ন হয়ে বললুম, ও হারাধনবাবু! পাঁচুর দেহটা যে চুরি করলেন, পাঁচুর আত্মার কী হলো? তাকে কীভাবে তাড়িয়ে তার দেহ চুরি করলেন?

লোকটা তেমনি খ্যানখেনে গলায় হেসে বলল, একটু আগে ব্যাটা পেঁচো পুকুরপাড়ে একটা গাছের তলায় বাজ পড়ে মারা গেছে। আমি ছিলুম সেই গাছের ডালে। যেই না পেঁচোর আত্মাটা দেহছাড়া হয়েছে আমি সুড়ুৎ করে ওর দেহ ঢুকে পড়েছি। পেঁচোর আত্মা এখনও টের পায়নি অবিশ্যি। টের পেয়ে ঝগড়া করতে এলে না হয় ফেরত দেব। কী বলেন?

ভূতনাথ ততক্ষণে মনে মনে বুঝি আইনের প্যাঁচ কষছিলেন। এবার বললেন, দেখুন মশাই! ভেবে দেখলুম, আমরা যখন কোনো আসামী পাকাড়াও করি, তখন তার দেহটাকেই পাকড়াও করি। এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দেহটা পাঁচুর। অতএব পাঁচুর দেহকে আরেস্ট করলে আইনসম্মত কাজ হয়। কৈ, দেখি হাত দুটো।

ভূতনাথের পকেটে নিশ্চয়ই হাতকড়া ছিল। অন্ধকারের মধ্যে মালুম হল, হাতকড়া নিয়ে এগোচ্ছেন। তারপর একটা ধস্তাধস্তির শব্দ শুনলুম। তারপর বিকট চেঁচিয়ে উঠলেন ভূতনাথ। পাকড়ো! পাকড়ো! আসামী ভাগ যাতা।

বাইরে বিদ্যুতের আলোয়, দেখলুম, ভূতনাথ দারোগা উঠোনে ছুটোছুটি করছেন বৃষ্টির মধ্যে। লোকটাকে দেখতে পেলুম না। একটু পরে ভূতনাথেরও পাত্তা নেই। ওঁর সাইকেলটা পড়ে রইল ঘরে।

এবার আমার ভীষণ ভয় হতে থাকল। মরিয়া হয়ে পাশের ঘরে, তারপর সেই ভাঙা দরজা দিয়ে বাইরে গেলুম। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে টলতে টলতে কিছুটা এগিয়েছি দেখি একদল লোক লণ্ঠন আর টর্চ নিয়ে আসছে।

আমাকে খুঁজেতে বেরিয়েছিলেন রবীন্দ্র জয়ন্তীর উদ্যোক্তারা।....

বছরখানেক পরে মফঃস্বলে এক আত্মীয় বাড়ি গেছি। ফেরার সময় রেলস্টেশনে ভূতনাথ দারোগার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আরও প্রকাণ্ড হয়েছেন উনি। ভুঁড়ির বহরও বেড়েছে। একথা-সেকথার পর জিগ্যেস করলুম, সেই পাঁচুর দেহটাকে শেষ পর্যন্ত পাকড়াও করতে পেরেছিলেন তো?

ভূতনাথ খ্যা খ্যা করে হেসে বললেন, মনে আছে আপনার? আরে মশাই, ব্যাটা আমার মতো ধুরন্ধর লোককেও কী রামঠকান ঠকিয়েছিল। ভাবা যায় না। বাজ পড়ে সত্যিসত্যি পাঁচু চোর মরেনি। কাজেই হারাধনবাবুর ভূতও তার দেহে ঢুকে ঝড়বৃষ্টির সময় নিজের পোড়োবাড়িতে হাজির হননি। আসলে সাক্ষাৎ পাঁচুই আমাকে গণ্ডগোলে ফেলেছিল। ব্যাটা অসম্ভব ধূর্ত মশাই! আমার সঙ্গে রসিকতা করতে এসেছিল। কী স্পর্ধা!

নীল দ্বীপের দুঃস্বপ্ন

[সকাল ৯-৩০]

আজও সেই লাল চাকাটা পেয়েছিলাম। ঘড়িতে তখন রাত দুটো। পায়ের যন্ত্রণায় ঘুমনো অসম্ভব। লাল চাকাটা ছোট্ট হ্রদের ওপারের কালো পাথরের পাহাড়ের গায়ে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে মিলিয়ে গিয়েছিল। ওটা কী হতে পারে, বুঝতে পারছি না।

ক্রমশ বুঝতে পারছি মৃত্যু এগিয়ে আসছে। পায়ে সম্ভবত গ্যাংগ্রিন ধরেছে। দুর্ভাগা প্লেনটা আছড়ে পড়ার মুহূর্তে কেন যে লাফ দিতে গেলাম। পাথরে পড়ে আমার বাঁ পায়ে মারাত্মক চোট লাগল। প্লেনটা আমার ওপর দিয়ে কয়েকশো গজ এগিয়ে পাহাড়ের মাথায় ধাক্কা লেগে চুরমার হয়ে গেল। দাউ দাউ আগুন জ্বলে

উঠল। আমি বাদে একুশজন যাত্রী ও বৈমানিকদের কেউ বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে অন্তত নড়াচড়াটা চোখে পড়ত। যেখানে আছি, সেখান থেকে প্লেনের ধ্বংসাবশেষ দিনের বেলা স্পষ্ট দেখা যায়।

অনেক কষ্টে হ্রদের ধারে গিয়ে জল খেয়েছিলাম। তারপর তেমনি করে শরীর ঘষটাতে পাথরের এই ছোট্ট গুহায় আশ্রয় নিয়েছি। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে খেয়েছি শুধু দুটো বিস্কুট আর চকোলেট, প্লেনের এয়ারহোস্টেস কফির সঙ্গে দিয়েছিল, না খেয়ে পকেটে রেখেছিলাম ভাগ্যিস!

কী দীর্ঘ কষ্টকর সময়! ওদের সঙ্গে মৃত্যু হলে কত ভাল হত। যন্ত্রণা আর অনিশ্চয়তার হাত থেকে রেহাই পেতাম।.......

[দুপুর ১-১৫]

কিছুক্ষণ আগে হ্রদের ওপারে একটা অদ্ভুত চেহারার প্রাণী দেখলাম। অনেকটা বানরের মতো দেখতে। কিন্তু গায়ের লোম কালো। বাজি রেখে বলতে পরি, ওটা গরিলা বা ওরাংওটাং নয়। চারপায়ে চলাফেরা করলেও মাঝে মাঝে দুপায়ে ভর করে মানুষের মতো দাঁড়াতে পারে। হাঁটতেও পারে।

সে একটুকরো পাথর কুড়িয়ে হ্রদের জলে ছুঁড়ে মারল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অবাক হয়ে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড মাছ মারতে পেরেছে সে। মাছটা দুহাতে ধরে মানুষের মতো দৌড়ে পাহাড় বেয়ে উঠে গেল। তারপর পাহাড়ের একটা ফাটলে ঢুকে গেল।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। আর তার পাত্তা পেলাম না।.....

[বিকেল ৩-৩০]

যা যা দেখছি, নোট বইতে লিখে রাখছি—আমার মৃত্যুর পর যদি কোনো মানুষের হাতে পড়ে, সে জানবে হ্যারি বার্নেস নামে একজন মানুষ এইসব অদ্ভুত ব্যাপার দেখেছিল। সে কি বিশ্বাস করবে না? না করলেও কিছু যায় আসে না।

সেই আজব প্রাণীটাকে এবার সপরিবারে দেখলাম। দুজন নিশ্চয় স্বামী-স্ত্রী, বাকি দুটি তাদের বাচ্চা, বাচ্চা দুটি ভারি দুরন্ত। জলে নেমে তারা মানুষের মতো স্নান করছিল। বাচ্চা দুটি জল ছিটিয়ে খুব দুষ্টুমি করছিল। তার ফলে ওদের চাঁটি খেতেও হল। স্নান হয়ে গেলে চারপায়ে লাফাতে লাফাতে চলে গেল এবং সেই ফাটলে গিয়ে ঢুকল। সম্ভবত এদেরই বনমানুষ বলা হয়।....

[সকাল ৭-১০]

আমার বাঁদিকে শতিনেক গজ দূরে পাহাড়ের গায়ে প্লেনের ধ্বংসাবশেষ। সেখানে সেই বনমানুষটা ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছিল ভোরবেলা থেকে। সে কিছু জিনিস কুড়িয়ে কামড় দিয়ে পরখ করছিল আর ছুঁড়ে ফেলছিল। জিনিসগুলো গড়াতে গড়াতে হ্রদের ধারে বালির ওপর এসে পড়ল। মাত্র তিরিশ গজ দূরে সেগুলি পড়েছিল। বনমানুষটা

পাহাড়ের ওপিঠে চলে গেলে আমি সতর্কভাবে শরীর ঘষটাতে এগোলাম। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল, আমাকে দেখতে পেলে আক্রমণ করবে।

জিনিসগুলো দেখে আমার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। টিনে ভর্তি সন্দেশ, ভেজিটেবল স্যুপ, জ্যাম, দুধ, মাংসের স্টু—এই সব। খাদ্য দেখে সব ভয় চলে গেল। রাক্ষসের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ভাগ্যিস পকেটে নোখকাটা ক্লিপ ছিল। তাই দিয়ে টিন কেটে পেট ভরে আহার করলাম। তারপর হ্রদের জল খেয়ে কয়েক মিনিট চুপচাপ রোদে শুয়ে রইলাম। বনমানুষের চোখে পড়লে কী হত জানি না।

মনে পড়া মাত্র আবার শরীর ঘষটে এগিয়ে যতগুলো পারালাম, খাদ্যের টিন দুহাতে বুকের কাছে ধরে এবং কিছু পকেটে পুরে অনেক কষ্টে আস্তানায় ফিরে এলাম। এই খাদ্যে অন্তত দুটো দিন চালিয়ে দেব।

খাদ্য এমন জিনিস—পায়ের ক্ষতস্থানে আর যেন তেমন যন্ত্রণা টের পাচ্ছি না। গ্যাংগ্রিনের আশংকা করেছিলাম। এখন মনে হচ্ছে, ওটা অমূলক আতংক।....

[দুপুর ১২টা]

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। প্যাকেটগুলোর মধ্যে একটা চুরুটের প্যাকেটও ছিল। কিন্তু আগুন কোথায় পাই? প্লেন বিগড়ে যাবার মুহূর্তে পাশের ভদ্রলোক লাইটার চেয়ে নিয়েছিলেন। সে মুহূর্তে ফেরত চাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। তখন সে এক বিভ্রান্তিকর অবস্থা! আমার সিগারেটের প্যাকেটটা আসনের হাতলের ওপর ছিল, মনে পড়ছে।

চুরুটগুলো দেখে ধূমপানের ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ দেখি, গুহার পাশে বেঁটে শুকনো একটা গাছ রয়েছে। দুটো শুকনো ডাল ভেঙে ঘষতে শুরু করলাম। পনেরো মিনিট পরে ধোঁয়া দেখা গেল। আরও পাঁচ মিনিট পরে ফুঁ দিয়ে আগুন ধরালাম।

মনের সুখে চুরুট ধরালাম। আগুনটা জিইয়ে রাখা দরকার। আরও কিছু কাঠ ভেঙে আনলাম। রাতের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে নিষ্কৃতি পাব। শুধু ভয়, ধোঁয়া দেখে বনমানুষগুলোর কী প্রতিক্রিয়া হবে? চুরুট টেনে খুব গরম লাগছিল। পোশাক ছেড়ে শরীর ঘষটে সরীসৃপের মতো হ্রদে নামলাম। জলটা খুব স্বচ্ছ। প্রাণভরে স্নান করলাম। তারপর জল থেকে মাথা তুলে দেখি সেই বনমানুষ পরিবার নেমে আসছে ওপারে। হ্রদের নলখাগড়া গাছের ভেতর গলা ডুবিয়ে বসে রইলাম। আধঘণ্টা পরে ওরা চলে গেল। তখন হ্রদের ধারে একটা পাথরের আড়ালে পা ছড়িয়ে বসে রোদে শরীর শুকিয়ে নিলাম।

[বিকাল ৪টা]

কী আশ্চর্য। পায়ের ক্ষতস্থানে আর একটুও যন্ত্রণা নেই। পাটা সোজা করতে গিয়ে আরও অবাক হলাম। এ নিশ্চয় হ্রদের জলের গুণ। গুহার ভেতর উঠে দাঁড়ালাম। একটু ব্যথা করছিল অবশ্য। কিন্তু কিছুক্ষণ গুহার বাইরে পায়চারি করতেই ব্যথাটা চলে গেল। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ।.....

[সন্ধ্যা ৭-৩০টা]

বনমানুষ পরিবার হ্রদের ধারে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘোরঘুরি করে গেল। ওরা বার বার এদিকে তাকাচ্ছিল। কিছু কি টের পেয়েছে? একটা বড় পাথর আটকে গিয়েছে গুহার মুখে। শুকনো কাঠে আগুনটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। সেই আলোয় লিখছি।

একটু আগে বাইরে একটা হুংকার শুনলাম মনে হল। কানের ভুল? নাকি বনমানুষটা এসে পড়েছে? আগুন জ্বলছে, সেই একটা বাঁচায়ো। আগুনকে সব প্রাণী ভয় পায়।....

[সকাল ৯টা]

হ্যাঁ, বনমানুষ পরিবার এসেছিল। গুহার সামনে তাদের পায়ের ছাপ রয়েছে। ছোট ছাপগুলো দেখে বুঝেছি, বাচ্চা দুটোও এসেছিল।

কাল রাতে শুয়ে পড়ার আগে পাথরের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আবার সেই লাল আলোর চাকাটা দেখেছি; ওটা কী হতে পারে? ইচ্ছে করছিল, বেরিয়ে গিয়ে দেখে আসি। কিন্তু বনমানুষের ভয়ে সাহস পাইনি। যা আছে বরাতে আজ রাতে ওটার রহস্য ফাঁস করতেই হবে।

এদিকে মুশকিল হয়েছে। গোগ্রাসে খাবারগুলো এরই মধ্যে শেষ করে ফেলেছি। এখনই প্লেনের ধ্বংসাবশেষের কাছে গিয়ে আরও খাবার আছে কি না খোঁজা দরকার। একটু আগে দেখলাম, এতক্ষণে শকুনের পাল এসে জুটেছে ওখানে। ৭২ ঘণ্টারও পরে। এর একটাই অর্থ হয়। এটা সমুদ্রের মধ্যে কোনো দ্বীপ। এ দ্বীপে শকুন ছিল না। থাকলে এত দেরি হত না আসতে। প্লেনটা চাগোস দ্বীপপুঞ্জের কোনো দ্বীপে ভেঙে পড়েছে? মরিশাস থেকে কলম্বো যাবার পথে এই দ্বীপগুলো পড়ে।.....

[বিকেল ৪-৩০টা]

শকুন তাড়ানোর জন্য গাছের ডাল ভেঙে লাঠি বানিয়েছিলাম। পচা মড়ার গন্ধে টেঁকা দায়। শকুনগুলোর সঙ্গে প্রাণপণ যুদ্ধ করে কয়েকটা টিন কুড়িয়ে এনেছি।

যখন নেমে আসছি, দেখি বনমানুষটা একটা পাথরের চাতালে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দূরত্ব প্রায় তিরিশ গজ। আমি চেঁচিয়ে তাকে বললাম, হ্যাল্লো!

আশ্চর্য, সে দুহাত নাড়তে থাকল অদ্ভুত ভঙ্গিতে। আমার সাহস হল না তাকে আর ঘাঁটাই। ওটা যুদ্ধের আহ্বানও হতে পারে।

খাবারগুলো রেখে বাঁদিকে ঢালু পাহাড় বেয়ে উঠতে থাকলাম। ভাগ্যিস, মাউন্টেনিয়ারিং ট্রেনিং নেওয়া ছিল। দুঘণ্টা লাগল চুড়োয় পৌঁছতে। হ্যাঁ—যা ভেবেছিলাম তাই। আমি একটা ছোট দ্বীপে রয়েছি। চারদিকে সমুদ্র। দিগন্তে কালো ধ্যাবড়া রেখাগুলো নিশ্চয় আরও সব দ্বীপ। চাগোস দ্বীপপুঞ্জই বটে। বহুদূরে একটা জাহাজ দেখা যাচ্ছিল। তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা অসম্ভব।

কিন্তু আমাদের প্লেনটার সন্ধানে উদ্ধারকারীরা এখনও কেন আসছে না? তারা কি ভুল জায়গায় হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে!

ঠিক করলাম, এই চুড়োতেই কাল আশ্রয় নেব।

নেমে এসে গুহার দিকে এগোচ্ছি, হঠাৎ দেখি গুহার ওপাশ থেকে বনমানুষ পরিবার হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে গুহার দরজায় উঁকি মারছে! পাথরের আড়ালে বসে পড়লাম। দেখলাম, তারা নিজেদের ভাষায় গর্জন করে কী যেন বলাবলি করতে থাকল। তারপর লম্বাটে বনমানুষটা সোজা দাঁড়িয়ে একটা ডাক ছাড়ল।

ওকি আমাকেই ডাকছে? কিন্তু সাড়া দেবার ভরসা পাচ্ছি না। সে বারকয়েক সেইরকম ডাক ডেকে চারপা হল! তারপর সপরিবারে আস্তে আস্তে চলে গেল। হ্রদের পশ্চিমতীর হয়ে উত্তরে পৌঁছুলে আমি বেরিয়ে এলাম। তারপর ঝোপঝাড় ও পাথরের আড়াল দিয়ে গুহায় ঢুকলাম।

কিছুক্ষণ পরে হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেলাম। ঝটপট বেরিয়ে এসে দেখি, একটা হেলিকপ্টার চলে যাচ্ছে। রাগে-দুঃখে অস্থির হয়ে পড়লাম। ওরা কি প্লেনের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পেল না!

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম-যদি হেলিকপ্টারটা চক্কর দিয়ে ফের আসে! এল না। হতাশায় ভেঙে পড়লাম।...

[সকাল ৮টা]

গত রাতে লাল চাকাটা পাহাড়ের গায়ে দেখামাত্র বেরিয়ে পড়েছিলাম! অস্ত্র বলতে একটা লম্বা ডাল। মরিয়া হেসে উঠেছিলাম।

বাঁদিকে এগিয়ে ঘাপটি মেরে বসলাম। ঘন অন্ধকার। শীত করছিল। কিছুক্ষণ পরে লাল চাকাটা সটান নেমে এল। আমার কাছ থেকে আন্দাজ হাত বিশেক দূরে স্থির হল। ওটা মাটি থেকে অন্তত তিন ফুট উঁচুতে ছিল। লক্ষ্য করলাম চাকাটার কোনো ছটা নেই—কোনো জিনিসকে আলোকিত করছে না।

যা থাকে বরাতে বলে ছুটে গেলাম। কাছাকাছি হতেই ওটা ফুটবলের মতো যেন কার অদৃশ্য কিল খেয়ে ওপরে উঠে গেল। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর গুহায় ফিরে এলাম।

এখন গুহা ছেড়ে দক্ষিণের পাহাড়ের চুড়োয় চলে এসেছি। এখানে প্রচুর গাছপালা আর ঝোপ-জঙ্গল রয়েছে! আস্তানা হবে ডালপালা ভেঙে। অনেক কাজ।......

[বিকাল ৩টা]

মোটামুটি একটা আস্তানা তৈরি করতে পেরেছি। গুহার মতো আরামদায়ক হবে না। তবে একটা সুবিধে তিনদিকে তিনটি প্রকাণ্ড পাথর থাকায় ঘরটা মজবুত হয়েছে। সামনে বেড়া বানিয়েছি লতার দড়ি বেঁধে। গুহা থেকে আগুনটা এনেছি। ভেতরে জ্বালানো নিরাপদ নয়। বাইরে জ্বলুক। যদি কোনো জাহাজ অথবা উদ্ধারকারী হেলিকপ্টারের নজরে পড়ে।

বিশগজ এগোলে দক্ষিণে গভীর খাড়ি। সমুদ্রের জল গর্জন করে আঘাত করছে

পাথরের দেওয়ালে। প্রচণ্ড ফেনা জমে আছে নিচে। সামুদ্রিক পাখিরা ঝাঁক বেঁধে ওড়াওড়ি করছে।

কিন্তু খাবার প্রায় শেষ। আবার প্লেনের ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে বেরুতে হবে। কিছু না পেলে বনমানুষ পরিবারের মতো জীবনযাপন করতে হবে। পাথর ছুঁড়ে মাছ এবং পাখি মেরে আগুনে পুড়িয়ে খাব। কী আর করার আছে তা ছাড়া—মৃত্যু যখন হলই না।...

[সকাল ৯-৩০টা]

কাল রাতে লাল চাকাটা আমার এই নতুন আস্তানার কাছে চলে এসেছিল। সাহস করে যেতেই একটু সরে গেল। তখন আমিও কয়েক পা এগোলাম। পাহাড়ের এই শীর্ষদেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে কাছিমের পিঠের মতো। এক পা এক পা করে উজ্জ্বল লাল জিনিসটার দিকে এগোই, সেটাও সমান দূরত্বে পিছিয়ে যায়। তারপর এইখানে স্থির হয়ে রইল। তখন আমি আরও একটু এগোলাম মধ্যে মাত্র ফুট দশেক দূরত্ব। খুব স্পষ্ট দেখতে পেলাম জিনিসটা। চাকার মধ্যে মনে হয়েছিল—কিন্তু চাকা নয়। একটা লাল গোলাকার ফুটবল। ছটা একেবারে নেই ভেবেছিলাম, তাও ঠিক নয়। খুব সামান্য ছটা আছে। নিজের ঘাসগুলো এবং দুপাশে ও ওপরে লতাপাতার ওপর ক্ষীণ ছটা পড়েছে।

আরও দুপা এগোলাম। লাঠিটা বাড়িয়ে ওটাকে ছোঁবার কথা ভাবলাম! কিন্তু সাহস পেলাম না। মাত্র তিন ফুট দূরত্ব। ইচ্ছে করলেই ওটার ওপর হাত রাখতে পারি। কিন্তু যদি কিছু ঘটে!

লাল ফুটবলটা মাটি থেকে ফুট তিনেক উঁচুতে রয়েছে। ওটা আগুন হলে আঁচ লাগত। নিশ্চয় আগুন নয়। এর ফলে সাহস বেড়ে গেল। ওটার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লাম—হরিণের ওপর শিকারী চিতা ঝাঁপিয়ে পড়ে।

হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম। পড়েই বুঝলাম জিনিসটা জেলির মতো পিছল থলথলে, আঠালো এবং ভীষণ ঠাণ্ডা। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলাম। কয়েক পা পিছিয়ে এলাম। মাটিতে ঘাসের ওপর পড়ে সে খুব লাফালাফি করতে থাকল আহত জন্তুর মতো। তখন কষে লাঠির বাড়ি মারলাম গোটাকতক। ওটা বুঝি মরে গেল। লাঠির ডগায় তুলে থ্যাতলানো লাল বস্তুটি অথবা প্রাণীটা আমার ঘরের সামনে আগুনের কাছে এনে রাখলাম।

হ্যাঁ—জেলিফিশ জাতীয় প্রাণী বটে। কিন্তু এরা আকাশে স্বচ্ছন্দে উড়তে বেড়াতে পারে এমন বিদঘুটে প্রাণীর কথা কস্মিন কালে শুনি নি! জোনাকি-জাতীয় পতঙ্গেরই সম্ভবত দৈত্য-সংস্করণ। কিন্তু জোনাকির আলো হলুদ এবং আলোটা থাকে তার পেটে। এই পতঙ্গটি দেখছি গোটাটাই আলো এবং এর কোনো আলাদা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই।

মৃত কিম্ভূত পতঙ্গটি পড়ে রইল। আমি ঘরে ঢুকে ঘাসের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে সেটাকে খুঁজলাম। আগুন নিভে গিয়েছিল। কিন্তু

অঙ্গার প্রচুর ছিল। পাহাড়ের শীর্ষে প্রবল বাতাস সারাক্ষণ। আর একটু হলে অঙ্গারগুলো নিভে যেত।

দিনের আলোয় পতঙ্গটি খুঁজে বের করলাম। আসলে দিনের আলোয় ওর রঙ পাথরের মতো কালচে—ঈষৎ ধূসরও বটে জায়গায়-জায়গায়। আঠালো থলথলে জীবটির দুটো চোখও দেখতে পেলাম এতক্ষণে। এবং একটা মুখও। কিন্তু এদিকে দেখি আমার পোশাকে ওর আঠার মতো মাংস লেগে রয়েছে। ধুয়ে ফেলা দরকার।

[দুপুর ১২-৩০টা]

হ্রদে স্নান করতে গিয়ে বনমানুষ পরিবারের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিলাম। দুটি বড় এবং দুটি ক্ষুদে জীব অঙ্গভঙ্গী করছিল এবং মুখে অদ্ভুত শব্দ করছিল। আমিও অবিকল তাদের নকল করলাম। তখন ক্ষুদে বনমানুষদ্বয় চারপায়ে দৌড়ে এসে আমার দুই কাঁধে চাপল। আপত্তি করলাম না। মানুষের ভাষায় বললাম, 'আমি তোমাদের মামা! আমি তোমাদের মামা!' তারা কিচিরি মিচির শব্দে খুশি জানাল।

তাদের পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করলাম। তাদের বাবা-মা একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা উপভোগ করল যেন। তারপর তারা ঘুরে হাঁটুতে থাকল। কাঁধের বাচ্চা দুটো লাফ দিয়ে নেমে আমার হাত দুটো ধরে টানতে থাকল।

হ্রদের উত্তরতীরে ঢালু পাহাড় বেয়ে ওদের আস্তানায় পৌঁছলাম। বিশাল গুহার ভেতর মানুষের মতো ওদের সংসার। ব্রেডফ্রুট জাতীয় ফলমূল শুকনো মাছ, আস্ত মৌচাক সাজানো রয়েছে। দেখে মনে হল, এরা কি লক্ষ বছর আগে লুপ্ত ক্রোম্যাগনন মানুষের একটা বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী?

ফুঁ দিয়ে মৌমাছি তাড়িয়ে প্রকাণ্ড একটুকরো মৌচাক আমাকে খেতে দিল। চুষে প্রাণভরে মধু খেলাম। একগাদা ফলও সাবাড় করলাম। ওরা আমার খাওয়া দেখছিল! দুর্বোধ্য শব্দে বিস্ময় প্রকাশ করছিল।

খাওয়া হলে ওরা চারজনে আমার পোশাক, জুতো, গায়ের চামড়া, মাথার চুল খুঁটিয়ে হাত বুলিয়ে পরখ করল। তারপর পুরুষ বনমানুষটি গুহার কোণে চলে গেল।

সে যে জিনিসটা নিয়ে এল, দেখে অবাক হয়ে গেলাম। একটা ভাঙা জীর্ণ বাইনোকুলার। কোথায় পেল? আমাদের প্লেনের ধ্বংসাবশেষই কি? ইশারায় জিগ্যেস করলে সে আমার হাত ধরে গুহার বাইরে নিয়ে গেল। তারপর উত্তর-পূর্ব কোণের পাহাড়টা দেখাল। আমি ওকে সেখানে যেতে ইশারা করলাম।

পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে জায়গাটায় পৌঁছুলাম। সেখানে একটা সংকীর্ণ গুহার সামনে মানুষের কংকাল পড়ে রয়েছে দেখে শিউরে উঠলাম। কোন দুর্ভাগার কংকাল এটা? গুহার ভেতরে উঁকি মেরে কিছু দেখতে পেলাম না। সূর্যের আলো সরাসরি গুহার ভেতর পৌঁছেছে। কোন চিহ্ন নেই যে লোকটাকে শনাক্ত করব। ওর গায়ের পোশাকও গুঁড়ো হয়ে গেছে। বহু বছর আগের ঘটনা সম্ভবত।

এবার বুক কেঁপে উঠল। তাহলে আমার বরাতেও এমনি মৃত্যু আছে? এখানেই

বুড়ো হয়ে এমনি করে মরে যেতে হবে?

বনমানুষটাকে সঙ্গে নিয়ে পাহাড় বেয়ে হ্রদের পূর্বতীরে নামলাম। তারপর দক্ষিণের পাহাড়ে উঠে আমার নতুন আস্তানায় পৌঁছলাম। তাকে সেই অদ্ভুত পতঙ্গের মড়াটা দেখাতেই সে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। নাসারন্ধ্র ফুলে উঠল। গলার ভেতর গরগর শব্দ করে সে পিছিয়ে যেতে থাকল। তারপর হঠাৎ ঘুরে চার পায়ে অবিকল বাঘভালুকের মতো দৌড়ে পাহাড় বেয়ে নামতে লাগল। আমার ডাকে কান দিল না।

বুঝলাম, পতঙ্গটিকে তারা প্রচণ্ড ভয় পায়।......

[সকাল ৭টা]

কাল এক ভয়ংকর রাত গেছে। হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বাইরে আগুনটা নিভে এসেছে দেখে, ভাবলাম একটা কাঠ এনে ফেলে দিই। দরজার ঝাঁপ ঠেলেই চোখে পড়ল অসংখ্য লাল আলোর ফুটবল—নাকি প্রকাণ্ড সব বুদ্বুদ আমার ঘরের চারিদিক ঘিরে রয়েছে। তারা শনশন শব্দ করছে। আক্রমণ করতে এসেছে কি? আমি লাঠি নিয়ে তেড়ে বেরুলাম। অমনি কিম্ভূত পতঙ্গগুলো অসংখ্য ফুটবলের মতো আমার ওপর পড়তে শুরু করল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বরফের আঘাত যেন। আগুন জ্বলা একটা কাঠ তুলে তাদের ভাগিয়ে দিলাম। কিন্তু তারা দূরে সরে গেল মাত্র। গতিক বুঝে ঘরে ঢুকে পড়লাম। তারপর আর কোন গণ্ডগোল ঘটেনি।

কিন্তু সকালে আরেক উৎপাত। আমার জ্বর হয়ে গেছে। তারপর হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, সারা শরীরে চাকা চাকা ঘায়ের মতো অ্যালার্জি বেরিয়েছে। পতঙ্গগুলো নিশ্চয় বিষাক্ত। বনমানুষ বন্ধুটির কাছে যাব ভাবছি। কিন্তু ক্রমশ জ্বরটা বেড়ে যাচ্ছে। গায়ের অ্যালার্জিগুলো লাল হয়ে উঠেছে। অসহ্য চুলকানি। আর লেখা যাচ্ছে না।

ডেলি মেলে একটি প্রকাশিত সংবাদ

সেন্ট ভার্জো (চাগোস আইল্যান্ডস), ৭ জুন—সম্প্রতি নিরুদ্দিষ্ট শ্রীলঙ্কা এয়ারলাইনসের ডাকোটা বিমানটির ধ্বংসাবশেষ গতকাল নীল আইল্যান্ডে আবিষ্কৃত হয়েছে। উদ্ধারকারী দলটির হেলিকপ্টার যেখানে নেমেছিল, সেখানে একটি কংকাল দেখা যায়। পাশেই ডালপালা দিয়ে তৈরি একটি কুটির ছিল। কুটিরে একটি নোটবই পাওয়া গেছে। সেটি জনৈক হতভাগ্য যাত্রী হ্যারি বার্নেসের। তাতে কিছু অদ্ভুত কথা লেখা আছে। উদ্ধারকারী দলটি ছোট্ট দ্বীপ তন্ন তন্ন করে খুঁজে এমন কিছু দেখতে পান নি, যাতে মিঃ বার্নেসের বৃত্তান্তের সত্যতা মেলে।

ভদ্রলোক ওই পরিস্থিতিতে দুশ্চিন্তা ও হতাশার ঘোরে উদ্ভট কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিলেন।

জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফাঁপরে পড়েছি। হঠাৎ দেখি, ইয়া এক বড় কেঁদো বাঘ হালুম করে সামনে দাঁড়াল। পা দুটো মাটিতে সেঁটে গেছে ভয়ের চোটে। তারপর দেখি, বাঘটা আদতে বাঘই নয়, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। তিনি কেন বাঘ হয়ে গেছেন বুঝলুম না। খুশি হয়ে বললুম, "হ্যালো মাই ডিয়ার ওল্ড ম্যান! হাউ ডু ইউ ডু?" কর্নেল হাউমাউ করে কেঁদে বললেন, "ভাল না ডার্লিং। আমার লেজ হারিয়ে গেছে।" এ বয়সে লেজ হারানোর চেয়ে অপমানজনক কিছু নেই। কর্নেলের লেজ হারানোর কথা শুনে আমিও দুঃখে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললুম।.....

তারপরই টের পেলুম আমি মশারির ভেতরে শুয়ে আছি। আশ্চর্য, আমার চোখ দুটো যেন ভিজে স্যাঁতসেতে। ধুড়মুড় করে তক্ষুণি উঠে বসলুম এবং খিক-খিক করে হাসতে থাকলুম। কী বিদঘুটে স্বপ্ন রে বাবা!

টেবিলের সামনে ঝুঁকে বসে কী-সব নাড়াচাড়া করছিলেন যিনি, তাঁর মাথায় তখনও প্রাতঃভ্রমণের নীলচে টুপি। সেই টুপি ও তাঁর সাদা গোঁফ দাড়িয়ে তখনও জঙ্গলের শুকনো পাতার কুচি, কাঠকুটো, পাখির বিষ্ঠা, মাকড়সার জালের ছেঁড়া অংশ, এমন কী দু-একটা পোকামাকড়ও খুঁজে পাওয়া সম্ভব। না ঘরেই সম্ভাষণ করলেন, "গুড মর্নিং জয়ন্ত! আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।"

মশারি থেকে বেরিয়ে বললুম, "হাসছি কেন, জিজ্ঞেস করলেন না?"

"হাসছিলে নাকি? তুমি তো খুঁঃ খুঃ করে কাঁদছিলে মনে হল।"

"কাঁদছিলুম আপনার দুঃখে।" একটু চটে গিয়ে বললুম। "আপনার লেজ হারানোর কান্না দেখে আমারও কান্না পেয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, আপনি আমায় জাগিয়ে দেন নি। লেজটা আপনারই ছিল।"

"আমার লেজ!" বলে কর্নেল নিজের পশ্চাদ্দেশে হাত বুলিয়ে নিলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, "ডার্লিং'! সত্যি যদি মানুষের লেজ থাকত, ব্যাপারটা কত সুখের হত বল তো! লেজ দিয়ে পিঠ চুলকানো, মাছি তাড়ানো, আবার দরকার হলে কাউকে লেজের বাড়ি মারা-কত কাজ হত! তাছাড়া, কারুর ওপর রাগ হলে মুখে সেটা প্রকাশ না করলেও চলত। লেজ খাড়া হলেই সে টের পেত আমি রেগেছি। ব্যাপারটা কি সভ্য মানুষের পক্ষে ভদ্রতাসম্মত হত না ডার্লিং? আরও ভেবে দ্যাখো, লেজ থাকলেও তারও পোশাক দরকার হত। নিত্যনতুন ডিজাইনের লেজ-ঢাকা তৈরি করত টেলাররা। নাম দিত টেলেক্স। আর মহিলাদের বেলায় টেলেক্সি। ম্যাক্সির মতো।"

আমার এই বৃদ্ধ বন্ধু একবার মুখ খুললে সহজে বন্ধ করেন না। বাথরুমে ঢুকে পড়লুম। আধ ঘন্টা পরে বেরিয়ে দেখি, তখনও তেমনি বসে আছেন। পাশে অবশ্য ব্রেকফাস্টের ট্রে রেখে গেছে বাংলোর চৌকিদার। বললুম, "লেজ সম্পর্কে আরও কথা থাকলে এবার বলতে পারেন। এখন আমি ফ্রি।"

কর্নেল কতকগুলো ছবি দেখছিলেন। ছবিগুলো সদ্য প্রিন্ট করা। এখনও ভিজে

রয়েছে। বললেন, "লেজ মুখের শ্রম কমিয়ে দিত, জয়ন্ত! তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সম্পাদক মশাইয়ের সামনে গিয়ে লেজ নাড়তে শুরু করলেই তিনি খুশি হতেন। রিপোর্টিংয়ে ভুল বেরুলে লেজটা শিথিল করে মেঝেয় ফেলে রাখতে। তারপর লেজটা গুটিয়ে সম্পাদকের চেম্বার থেকে বেরুতে। সাতখুন মাফ!"

হাসতে হাসতে একটা ছবি তুলে নিতেই আমি অবাক। "এ কী! এও যে লেজ!"

"হ্যাঁ, লেজ। আমার জাদু-ক্যামেরার রাতের ফসল, জয়ন্ত!" কর্নেল মুচকি হেসে বললেন।

"অবিশ্বাস্য! মানুষের কখনও লেজ হয়?" ছবিটা ভাল করে দেখে আমার বিস্ময় বেড়ে গেল। "কর্নেল! এ নিশ্চয় কোনো প্রাণী, মানুষের মতো দেখতে এই যা।"

কর্নেল ব্রেকফাস্টের ট্রে টেনে নিয়ে আওড়ালেন, "বিপুল এ পৃথিবীর কতটুকু জানি! জয়ন্ত, পাশের ঘরের ভদ্রলোক—নৃবিজ্ঞানী ডঃ দীননাথ মহাপাত্র আমায় এরকম একটা আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু কানে নিইনি। কাল সন্ধ্যায় গোপনে একখানা ক্যামেরা পেতে এসেছিলুম। উদ্দেশ্য তো জানো! জন্তুদের জল খাওয়ার সময় ছিল তোলা। ভোরে ক্যামেরা আনতে গিয়ে জলার ধারে বালির ওপর মানুষের পায়ের ছাপ দেখতে পেলুম। অবাক লাগল। খুব বদনাম আছে জলাটার। বাগাদা আদিবাসীদের ওটা তীর্থক্ষেত্র ছিল প্রাচীন যুগে। কিন্তু গত পঞ্চাশ-ষাট বছরে ওখানে তারা যায় না। অভিশাপ লেগেছে নাকি। তো পায়ের ছাপ কাদের তা দেখতেই পাচ্ছ।"

এই সময় দরজার বাইরে ডঃ মহাপাত্রের সাড়া পাওয়া গেল। "আসতে পারি কর্নেল?"

কর্নেল ঘুরে বললেন, "আসুন, আসুন!" তারপর ট্রেটা তুলে ছবিগুলোর ওপর রাখলেন। বুঝলুম, কোনো কারণে ব্যাপারটা নৃবিজ্ঞানী ভদ্রলোককে জানাতে চান না কর্নেল। কাজেই আমাকেও মুখ বুজে থাকতে হবে।......

বিবর্তনবাদ ও কার্টুন

ডঃ মহাপাত্র কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললেন, "কাল আপনাকে বাগাদা ট্রাইবের কথা বলছিলুম। বাংলার বাগদি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে চেহারা ও পেশায় কী আশ্চর্য মিল! এরাও মাছ ধরে। আবার একসময় এরাও সেকালের বাঙালি বাগদি গোষ্ঠীর মতো লাঠিয়ালি, ডাকাতিতেও পটু। এখনও এরা শক্ত গাছের ডাল থেকে তৈরি লাঠি ব্যবহার করে। ধাতুর ব্যবহার এদের মধ্যে অচল। কাজেই একই ট্রাইবের দুটি গোষ্ঠী দু জায়গায় বাস করছে। আর্যও মজার কথা এই, মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের দক্ষিণ অঞ্চলে বাউরি ট্রাইব রয়েছে। মোটামুটি ফর্সা বা তামাটে গায়ের রঙ। আশা করি, বাঙালি বাউরি সম্প্রদায়ের কথা আপনি জানেন কর্নেল। তো কথা হল—এরা ভারতের আদিম বাসিন্দা। অস্ট্রিক জাতির একটা শাখা।"

বনজঙ্গল বেড়াতে এসে এসব কচকচি কার বা ভাল লাগে? রাগ হল দেখে যে,গোয়েন্দাপ্রবর দাড়ি সায় দিচ্ছেন এবং প্রশংসাসূচক উক্তিও করছেন। 'এক্সকিউজ

মি' বলে সোজা বাইরে চলে গেলুম। এপ্রিলে চিরামবুরু পাহাড় ও জঙ্গলের সৌন্দর্য তুলনাহীন। যতদূর চোখ যায়, অসংখ্য টিলা ও পাহাড়। সবুজ, খয়েরি, লাল, সাদা কত রঙের বাহার! একটি টিলার গায়ে এই বাংলো। লনের ঘাসে কিছুক্ষণ পায়চারি করার পর দেখি, কথা বলতে বলতে দুই পণ্ডিত বেরুচ্ছেন।

"হ্যাঁ, মার্কো পোলো বঙ্গোপসাগরের একটি দ্বীপে লেজওয়ালা মানুষ দেখার কথা বলেছেন। পনেরো শতকের কথা। তো লেজ নিয়ে অবাক হবার কিছু নেই, কর্নেল! আমাদের শিরদাঁড়ার শেষপ্রান্তে যেটা ককসিক্স বা পিকুচঞ্চু বলা হয়— কোকিলের ঠোঁট আর কী— সেটাই লেজের প্রমাণ। বিবর্তনের একটা পর্যায়ে লেজ খসে গিয়েছিল। কারণ হল ভাষা। মানুষের ভাষাই যখন ভাবপ্রকাশে সমর্থ তখন লেজের দরকারটা কী?"

কর্নেল বললেন, " ঠিক, ঠিক। তবে ধরুন, হাতের নিয়মিত ব্যবহারে হাতের ক্ষমতাও বেড়েছিল! লেজের কাজ হাতে আরও ভালভাবে করা যায়। কাজেই..."

হঠাৎ কথা থামিয়ে কর্নেল কান খাড়া করে কী শুনলেন। তারপর দৌড়ে ঘরে ঢুকলেন। ডঃ মহাপাত্র হকচকিয়ে গেছেন দেখলুম। একটু পরে কর্নেল বাইনোকুলার নিয়ে বেরিয়ে এলেন। তারপর দৌড়ে বাংলোর গেট পেরিয়ে ঢালুতে বড় বড় পাথর আর ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হলেন। কোথায় একটা পাখি ডাকছিল টু টু টুইক!

ডঃ মহাপাত্রের কাছে গিয়ে বললুম, "ওঁর ওই বাতিক। পাখি প্রজাপতি ঘাসফড়িং পোকামাকড় নিয়ে থাকেন।"

"ও! উনি একজন ন্যাচারালিস্ট তাহলে! আমি ভেবেছিলুম শিকারী।"

একটু হেসে বললুম, "প্রকৃতিবিজ্ঞানী। তো ডঃ মহাপাত্র, কর্নেলের কাছে কি লেজওয়ালা মানুষের ছবিটা দেখলেন?"

ডঃ মহাপাত্র চোখ বড় করে বললেন, "অ্যাঁ! ছবি! কোথায় ছবি! কিসের ছবি?"

অমনি বুঝলুম, ভুল করেছি। ঝটপট বললুম, "মানে একটা কার্টুন আর কী! বিলিতি পাঞ্চ পত্রিকার।"

ডঃ মহাপাত্র একটু হেসে বললেন, "তাই বলুন। তবে কর্নেল কার্টুন দেখাননি আমায়। প্লিজ, আপনি নিয়ে আসুন না ওটা, দেখি। পাঞ্চের কার্টুনের কোনো তুলনা হয় না। নিশ্চয় ডারউইন-শতবার্ষিকী উপলক্ষে বেরিয়েছে।"

বেগতিক দেখে বললুম, "দুঃখিত ডঃ মহাপাত্র! কর্নেলের জিনিসপত্রে আমাদের হাত দেওয়াটা ঠিক হবে না।"

"তাও ঠিক।" বলে ডঃ মহাপাত্র মুখ গোমড়া করে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ওঁর মুখে সন্দেহের ছাপ রয়ে গেল। বুঝলুম, আমার কথাটা বিশ্বাস করেননি। কিন্তু ওঁকে কর্নেল ওই অদ্ভুত ছবিটা কেন দেখাতে চাইছেন না কে জানে! নাকি কর্নেল নিজেই মধ্যপ্রদেশর জঙ্গলে লেজওয়ালা মানুষ আবিষ্কারের গৌরব পেতে চান?.....

জঙ্গলের বিপদ আপদ

কর্নেল সেই যে পাখির পেছনে দৌড়ুলেন, তো আর ফেরার নাম নেই। দুপুর পর্যন্ত বনজঙ্গলে একটু ঘোরাঘুরির ইচ্ছে ছিল। একা যেতে সাহস পাচ্ছিলুম না। ভাবলুম নৃবিজ্ঞানী ভদ্রলোককে ডাকব নাকি?

কিন্তু উনি নিশ্চয় চটে আছেন আমার ওপর। অগত্যা একা বেরিয়ে পড়লুম। জঙ্গলে রাস্তা না-হারানোর সহজ উপায় হয়, চলার সময় কিছু চিহ্ন ছড়িয়ে রাখা। আমি অবশ্য রাস্তা ধরে যাচ্ছিলুম না। কখনও পাথুরে জমির ওপর দিয়ে, কখনো ঝোপঝাড়ের ভেতর ফাঁকা জায়গা দিয়ে, কখনও বা উঁচু গাছপালার ভেতর দিয়ে। খেয়ালখুশি মতো হেঁটে যাওয়া। একটা করে গাছের ডাল ভেঙে চিহ্ন রাখছিলুম। ফেরার সময় চিহ্নগুলো কাজে লাগবে।

একসময় থমকে দাঁড়ালুম। হাতি-বাঘ-ভালুকের কথা মনে পড়ে গেল। সঙ্গে কেন যে রাইফেলটা নিতে ভুলে গেলুম! এখন আর আফসোস করে লাভ নেই। অনেকটা দূরে চলে এসেছি। একখানা বেশ উঁচু জায়গা। ঘন ঘাস আর বেঁটে চ্যাপ্টা পাতাওয়ালা একরকম গাছ গজিয়ে রয়েছে। তারপর ঢালু হয়ে মাটিটা নেমে গিয়ে একটা গভীর শালবনে ঢুকেছে। ডাইনে একটু দূরে একটা প্রকাণ্ড কালো পাথর, তার কিনারা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল একটা রুনিগাছ। পাথরটা ঢেকে লতার ঝালর। ঝালরে চোখ ঝলসানো ফুলের সাজ। ফুলগুলো কাছে থেকে দেখার জন্য এগিয়ে গেলুম। রুনিগাছটার তলায় গিয়ে সেই দাঁড়িয়েছি, কালো পাথরটা থেকে কালো কুচকুচে একটা প্রাণী ঝুপ করে গড়িয়ে হাত-দশেক তফাতে মানুষের মতো দু'ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে গেল। তারপর কানে তালা-ধরানো এক ডাক ছাড়ল "আঁ-আঁ-ক্!"

সর্বনাশ! এ তো দেখছি একটা ভালুক। ইংরেজিতে এদের বলা হয় শ্লথ বিয়ার। মারাত্মক হিংস্র জানোয়ার। দিশেহারা হয়ে দৌড়াতে থাকলুম। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল, এই বুঝি ভালুকটার তীক্ষ্ণ নখে আমার পিঠ ফালাফালা হয়ে যাবে।

শালবনের ভেতর দিয়ে বহু দূর দৌড়ে যাবার পর ফাঁকা ঘাসজমিতে পৌঁছলুম। জমিটাতে অসংখ্য পাথর ছড়ানো। কতবার যে আছড় খেলুম প্যান্টশার্ট ছিঁড়ে গেল কাঁটাঝোপে, তারপর সামনে পড়ল নলখাগড়ার জঙ্গল। জঙ্গল ফুঁড়ে গিয়ে হুড়মুড় করে জলে পড়লুম। ভালুকটাকে এতক্ষণ একবারও ঘুরে দেখার সাহস পাইনি। এবার জলাটার মাঝ-অবধি একবুক জলে এগিয়ে ঘুরে দাঁড়ালুম। কোথায় ভালুক?

ভালুকটার সঙ্গে নিশ্চয় রেসে জিতে গেছি। জলাটা তত বেশি বড় নয়। ওপারে বালিয়াড়ি দেখা যাচ্ছিল। খুব সাবধানে জলের ভেতর পা ফেলে এগোতে হচ্ছিল। কাদার মধ্যে পাথর রয়েছে প্রচুর। জল কোথাও এককোমর, কোথাও একবুক। বালির তটে পৌঁছে দু-পা ছড়িয়ে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। নিজের বোকামির জন্য রাগ হচ্ছিল খুব। তেষ্টাও পেয়েছিল। কিন্তু জলটা খাওয়া উচিত হবে কি না বুঝতে পারছিলুম না।

কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লান্তি চলে গেল। তখন উঠে দাঁড়ালুম। তারপর চারদিকে চোখ

বুলিয়ে দেখে চমকে উঠলুম। কর্নেল কি এই জলার ধারেই কোথাও ক্যামেরা পেতে রেখেছিলেন? সেই লেজওয়ালা মানুষের ছবিটা এখানকার বলেই তো মনে হচ্ছে। ভালুকের চেয়ে লেজওয়ালা মানুষ কতটা বিপজ্জনক কে জানে! এখান থেকে ঝটপট কেটে পড়াই ভাল।

বালিয়াড়ির পর প্রকাণ্ড পাথরের স্তূপ সার-সার দাঁড়িয়ে রয়েছে। ফাঁক গলিয়ে যাব কি না ভাবছি, হঠাৎ বাঁ দিকের স্তূপটার আড়াল থেকে একটা বিদঘুটে চেহারার লোক বেরিয়ে এল। তার গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। কোমরে এক টুকরো লাল ন্যাকড়া চড়ানো। গলায় একগুচ্ছের লাল পাথরের মালা। দুহাতে ওই রকম লাল পাথরের মালা জড়ানো। মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ। থ্যাবড়া নাক। কপালে লাল রঙের কয়েকটা আঁকিবুকি। তার মাথায় একরাশ জটাচুল। তার হাতে বেঁটে কাঠের লাঠি। লাঠিটায় বিকট সব মুখ খোদাই করা আছে। সে ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে চেঁচিয়ে উঠল, "কে তুমি? এখানে কেন এসেছ? মরার সাধ হয়েছে তোমার?"

এবার আরও চমকে উঠলুম তার লেজ দেখে। হ্যাঁ, লেজ। ছবিতে ঠিক যেমনটি দেখেছি—কতকটা হনুমানের লেজের মতো দেখতে, কিন্তু বেশ মোটা। তত লম্বা নয় অবশ্য। তাছাড়া ঠিক এই লোকটাকেই তো ছবিতে দেখেছি।

সেই ভোরবেলা থেকে টানা দুঃস্বপ্ন দেখছি না তো? চোখ রগড়ে নিয়ে তাকালুম। তারপর দেখলুম, ওর লেজটা খাড়া হচ্ছে। তারপর সেই লেজওয়ালা লোকটা আচমকা কাঠের লাঠিটা তুলে আমার মাথায় মারল। টের পেলুম, ভূমিকম্প হচ্ছে এবং আমি পড়ে যাচ্ছি। আমার চোখের সামনে অন্ধকার।

ডঃ মহাপাত্রের দুরবস্থা

চোখ মেলে দেখি, আলো জ্বলছে এবং আমি বাংলোর খাটে শুয়ে আছি। তাহলে আগাগোড়া সবটাই লেজঘটিত দুঃস্বপ্ন। ওঠার চেষ্টা করতেই পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনলাম, "উঁহু, নড়ো না, নড়ো না!"

একটু তফাতে বসে আছেন কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। একটা কিছু করছেন। মাথাটা চিনচিন করছিল। হাত দিয়ে টের পেলুম ব্যান্ডেজ রয়েছে। কর্নেল একটু হেসে পাশে এসে বসলেন। বললেন, "বনেজঙ্গলে গোঁয়ার্তুমি ভাল না ডার্লিং! তোমার কতবার পইপই করে বলেছি। ভাগ্যিস, আজ একটু সকাল-সকাল জলাটার ধারে ক্যামেরা পাততে গিয়েছিলুম। ধরেই নিয়েছিলুম তুমি ডঃ মহাপাত্রের সঙ্গে বরমডির আদিবাসী মেলায় গেছ। চৌকিদার সঠিক কিছু বলতে পারল না। তাকে তুমি বা ডঃ মহাপাত্র কিছু বলে যাওনি।"

আমার শরীর অস্বাভাবিক দুর্বল। কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। তারপর গরম দুধ নিয়ে ফিরলেন। বললেন, "দুধটা খেয়ে নাও। রাত মোটে সাড়ে-আটটা। সাতটার সময় একবার জ্ঞান হয়েছিল তোমার। তখন ব্রান্ডি খাইয়ে দিয়েছি। কী-সব ভুল বকছিলে—লেজওয়ালা মানুষের কথা বলছিলে।" কর্নেল হাসতে লাগলেন।

জোর করে উঠে বসলুম। "ভুল বকিনি। আমি ঠিক আছি। জলার ধারে একটা

লেজওয়ালা বিদুঘুটে মানুষ আমার মাথায় লাঠির বাড়ি মেরেছিল। আপনার ছবির কিম্ভূত প্রাণীটাই।"

"বলো কী! আমি ভেবেছিলুম পাথরের স্তূপে উঠে পা হড়কে গেছে এবং মাথায় চোট লেগেছে।"

"না।" বলে আগাগোড়া যা ঘটেছিল, সব বললুম কর্নেলকে।

কর্নেল ভুরু কুঁচকে একবার টাকে একবার দাড়িতে অভ্যাসমতো হাত বুলিয়ে বললেন, "হুম! কিন্তু আমাদের নৃবিজ্ঞানী গেলেন কোথায়? বড় ভাবনায় পড়া গেল দেখছি।"

এ-রাতে ঘুমটা স্বভাবত গভীর হয়েছিল। দুঃস্বপ্ন দেখিনি। দেখিনি লেজ-ঘটিত কোনো দৃশ্যও। মশারির ভেতর থেকে আমার বৃদ্ধ বন্ধুটিকে কালকের মতোই আপন কাজে মগ্ন দেখলুম। কৃতজ্ঞতায় মন নুয়ে রইল। কাল ওই বিপদঙ্কুল জলার ধার থেকে এই শক্তিমান বুড়োমানুষটি আমায় কাঁধে করে অতটা পথ বয়ে এনেছেন। ছেঁড়া নোংরা পোশাক বদলে দিয়েছেন। স্নেহশীল পিতার মতো আচরণ করেছেন। আস্তে বললুম, "গুড মর্নিং মাই ডিয়ার ওল্ড ম্যান!"

কর্নেল 'মর্নিং' বলে উঠে এসে মশারি তুলেতে থাকলেন। তড়াক করে উঠে বসে বললুম "থাক্। আর শোবার দরকার নেই। আপনার রাতের ক্যামেরায় কী ফসল তুললেন দেখি।"

টেবিলের একটা ছবি তুলে দেখে হকচকিয়ে গেলুম। জলার ধারে সেই পাথরের স্তূপ বলেই মনে হচ্ছে। একটা স্তূপের কাছে হাঁটু দুমড়ে বসে আছেন নৃবিজ্ঞানী ডঃ দীননাথ মহাপাত্র। হাতে শাবলজাতীয় কিছু।

"কী কাণ্ড!" অবাক হয়ে বললুম। নৃবিজ্ঞানী দেখছি প্রত্নবিজ্ঞানীর মতো খননকার্যে লিপ্ত হয়েছেন। কর্নেল, ওখানে কী প্রাচীন সভ্যতা লুকিয়ে আছে নাকি?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যে রাতদুপুরে লুকিয়ে কেউ করে না, ডার্লিং—যদি না তুতান-খামেনের মতো কোনো সম্রাটের গুপ্তধন পোঁতা থাকে।"

"মাই গুডনেস! ডঃ মহাপাত্র কি গুপ্তধন খুঁজছেন ওখানে?"

"জানি না।" বলে কর্নেল ব্রেকফাস্টের ট্রে টেনে নিলেন। বললেন, "শিগগির বাথরুম সেরে এসো। বেরুব।"

বাথরুম থেকে ফিরে জিজ্ঞেস করলুম, "ডঃ মহাপাত্র রাতের খাটুনির পর নিশ্চয় এখনও বিশ্রাম নিচ্ছেন? গুপ্তধন পেলেন কি না ওঁকে জিজ্ঞেস করার জন্য মন ছটফট করছে।"

"উনি ফেরেননি।"

"সে কী!"

কর্নেল কোনো কথা না বলে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলেন। আমি কফিটুকু ঝটপট গিলে নিলুম। এই সময় বাইরে মোটর-গাড়ির গর গর শব্দ শোনা গেল। দুজনে বেরিয়ে দেখি, বন দফতরের অফিসার সূর্যপ্রসাদ রাও জিপ থেকে গেটের কাছে নামছেন। হন্তদন্ত এসে বললেন, "কর্নেল! সাংঘাতিক ব্যাপার। বাগাদা আদিবাসীরা

ডঃ মহাপাত্রকে প্রচণ্ড মারধর করেছে। ভ্যাগ্যিস ফরেস্ট গার্ডরা ভোরবেলা ওদের বস্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। ওঁকে উদ্ধার করে আমাকে খবর দেয়। আমি গিয়ে ওঁকে বরমডি হাসপাতালে রেখে এলুম। বাঁচবেন কি না বলা কঠিন।"

কর্নেল বললেন, "বাগাদা বস্তিতে কেন গিয়েছিলাম ডঃ মহাপাত্র?" মিঃ রাও বললেন, "ওদের দেবতার থান আছে জঙ্গলের ভেতর একটি ছোট্ট লেকের ধারে। ওখানে বাইরের কোনো লোকের যাওয়া বারণ। ওরা বলল, এই লোকটা তাদের পবিত্র থানের অপমান করেছে। ওদের বুঝিয়ে বললুম, ভদ্রলোক না জেনে দৈবাৎ ওখানে বেড়াতে গিয়ে থাকবেন। ওদের বোঝানো বৃথা। তাছাড়া গভর্নমেন্ট এখন ট্রাইবালদের ব্যাপারে খুব সতর্ক। বস্তার এলাকার বিদ্রোদের কথা তো জানেন।"

"হুম্। তাহলে ডঃ মহাপাত্রকে ওরা দেবতার থান থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলুন!"

"ঠিক বলেছেন।" বলে মিঃ রাও ডঃ মহাপাত্রের ঘরের তালা খুললেন। বললেন, "ওঁর পকেটে চাবিটা ছিল। ওঁর জিনিসপত্র কী-সব আছে, হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে।"

লেজ তুলে পলায়ন

মিঃ রাও চলে গেলে কর্নেল বললেন, "জয়ন্ত, সঙ্গে রাইফেল নাও তোমার। সেই ভালুকটার মুখোমুখি হলে আত্মরক্ষা করতে পারবে। কিংবা ধরো, দৈবাৎ সেই লেজওয়ালা মানুষটা এসে পড়ল ব্ল্যাংক ফায়ার করে তাকে ভয় দেখাবে!"

কর্নেল হাসছিলেন। রাইফেল কাঁধে নিয়ে পা বাড়িয়ে বললুম, "আমরা যাচ্ছি কোথায়?"

"গুপ্তধন খুঁজতে।"

সারা পথ আর মুখ খুললেন না গোয়েন্দাপ্রবর। সতর্কভাবে সেই জলার ধারে পৌঁছে স্তূপগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "খোঁড়ার জায়গাটা বাগাদারা বুজিয়ে ঠিকঠাক করে দিয়েছে আগের মতো। যাই হোক, তুমি চারিদিকে লক্ষ্য রাখো। বাগাদারা যে-কোনো সময় এসে হামলা করতে পারে। আমি এমন কিছু অনুমানই করিনি। নইলে কোন সাহসে এখানে ক্যামেরা পাততে আসব?"

একটা পাথরের স্তূপের গায়ে খাঁজে কী একটা তোলা রয়েছে। কর্নেল সেটা তুলে নিয়ে বললেন, "আরে! এটা দেখছি ডঃ মহাপাত্রের নোটবই। এখানে রেখে গুপ্তধন খুঁজছিলেন নাকি?"

নোটবইটা ছোট। প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন। স্তূপগুলোর গায়ে অদ্ভুত সব আঁকিবুকি চোখে পড়ছিল। কর্নেল সেগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এইসময় হঠাৎ আমার পিছনে চাপা শব্দ হল। ঘুরে দেখি, কালকের সেই লেজওয়ালা। লাঠিটা যেই তুলেছে, আমিও রাইফেল তাক করেছি। ধমক দিয়ে বললুম, "ফ্যাল হতচ্ছাড়া হনুমান! ফেলে দে লাঠিটা! নইলে গুলি করে মারব।"

লাঠিটা ফেলে সে পিঠটান দেবার জন্য ঘোরা মাত্র কর্নেল তীরের মতো এসে

ওর লেজ ধরে হ্যাঁচকা টান মারলেন। লেজটা খুলে এল। সে অজানা ভাষায় চ্যাচাতে-চ্যাচাতে পড়ি-কি মরি করে পালিয়ে গেল।

কর্নেল লেজটা দেখতে দেখতে বললেন, "একটা চমৎকার ট্রাইবাল আর্টের নিদর্শন! যাই হোক জয়ন্ত। আর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। চলো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কেটে পড়ি। বাংলোতে পৌঁছেই ঝটপট সব গুছিয়ে নিয়ে বেরুতে হবে।"

কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে এগোলেন। আমি পা বাড়াতে গিয়ে ঘুরে বললুম, "আমিই বা ট্রাইবাল আর্টের এ-নিদর্শন হাতছাড়া করব কেন? বিশেষ করে এটা আমার একটা স্মারকচিহ্ন হয়ে থাকবে—মার খাওয়ার!"

বিদঘুটে বেঁটে লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে কর্নেলের সঙ্গ ধরলুম।.....

বাদশাহি সোনাদানা

চিরামবুরু-বরমডি রোডে একটা কাঠ বোঝাই ট্রাক পেয়ে গিয়েছিলুম। বরমডিতে কর্নেলের সামরিক জীবনের বন্ধু মেজর অর্জুন সিংয়ের বাড়ি। ওখান থেকেই আমরা চিরামবুরু জঙ্গলে গিয়েছিলুম। মেজর অর্জুন সিং আমাদের দেখে হকচকিয়ে গেলেন, "কী ব্যাপার? এত শিগগির চলে এলেন যে জঙ্গল থেকে।"

কর্নেল বললেন, "পরে বলছি সব! এখন ভীষণ খিদে-তেষ্টায় ভুগছি।"

মেজর অর্জুন সিং হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রচুর খাদ্য এল টেবিলে। খেতে-খেতে কর্নেল চিরামবুরুর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন।

মেজরসাহেব বললেন, "আপনাকে তো বলেইছিলুম মশাই, বাগাদা ট্রাইবের ওঝা সবসময় লেজ পরে থাকে। ওদের বিশ্বাস, রামায়ণের হনুমানজির অবতার ওদের ওঝা।"

কর্নেল বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু আসার সময় ট্রাকে বসে ডঃ মহাপাত্রের নোটবইটা পড়ে ফেলেছি। ওতে মোগল আমলের এক ঐতিহাসিক মির্জা মেহেদি খানের বই থেকে একটা উদ্ধৃতি আছে। পড়ে শোনাচ্ছি।"

নোটবইটা বের করে কর্নেল পড়তে যা বলেন।...দাক্ষিণাত্য থেকে বাদশাহ আলমগিরের পুত্র শাহজাদা মুহম্মদ বিদ্রোহ দমন করে ফিরে থাসার সময় বিস্তর ধনরত্ন নিয়ে যান। পথিমধ্যে সিরামবোরাত নামক ভীষণ অরণ্যে শাহজাদার পশ্চাদ্‌বর্তী দলটি জংলিদের কবলে পড়ে। জংলিরা রাতের অন্ধকারে তাদের অনেক ধনরত্ন লুণ্ঠন করে। পরে অগ্রবর্তী দলের নায়ক মর্দান খাঁ জংলিদের ওপর প্রতিশোধ নেন। আমি মর্দান খাঁয়ের জামাতা সেহাবুদ্দিনের কাছে শুনেছি, জংলিদের অস্ত্র বলতে শুধু কাঠের লাঠি ছিল। তাদের দলপতির নকি বানরের মতো লেজ ছিল। মর্দান খাঁ জংলিদের বন্দী করেন। কিন্তু লুণ্ঠিত ধনরত্নের সন্ধান পাননি। জংলিরা বলে, সব জিনিস তাদের লেজওয়ালা দলপতি কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। মর্দান খাঁ জঙ্গল তল্লাশ করে তার সন্ধান পাননি। ফলে ক্রোধের বশে তিনি জংলিদের হত্যা করেন।"

কর্নেল বললেন, "এর তলায় ডঃ মহাপাত্রের নোট রয়েছে। লিখেছেন, বাগাদাদের নিয়ে গবেষণার সময় ওদের একটি লোক-কথায় মির্জা মেহেদি খানের বর্ণিত ঘটনার সূত্র রয়েছে। বাগাদা ওঝারা নাকি বংশপরম্পরায় সেই ধনরত্নের সন্ধান জানে। ওই ওঝাদের কিন্তু কৃত্রিম লেজ থাকে।"

ডঃ অর্জুন সিং অভ্যাসমতো হো-হো করে হেসে বললেন, "লোক-কথা? লোক-কথা মানেই গালগল্প!"

কেকরাডিহির দণ্ডীবাবা

কেবলরাম বলল, 'যখন-তখন গেলেই হল না মাঠান! বারবেলা তিথি নক্ষত্র বলে কথা আছে না? ঠিক সময় গেলে তবে দর্শন পাবেন।'

রাঙাপিসিমা মুখ ভার করে বললেন, 'যখনই বলি, তোর খালি ওই এক কথা। এদিকে রোগ বাড়তে বাড়তে মাথায় ঠেকেছে। কখন একটা কিছু সর্বনাশ হয়ে গেলেই হল। বাড়ির লোকের আর কী? আমার মরার পথ তাকিয়েই আছে সবাই। হাড় জুড়ুবে সব্বাইকার!'

এখন কথা শুনে আর চুপ করে থাকা যায় না! বললুম, 'ও কী বলছেন পিসিমা! চলুন আজই আপনাকে নিয়ে বেরুব।'

কেবলরাম মাথা চুলকোতে চুলকোতে মুখ বেজার করে বেরিয়ে গেল। পিসিমা আশ্বস্ত হয়ে লাঠি ঠুক ঠুক করে নিজের ঘরে গেলেন। কোনার দিকে চেয়ারে বসে ভবভূতি চুরুট টানছিলেন আর পুরনো কাগজ পড়ছিলেন। এবার বললেন, 'কারও অসুখবিসুখ করেছে মনে হচ্ছে?'

বললুম, 'আবার কার? রাঙাপিসিমার!'

'কী অসুখ!'

'বোঝা যাচ্ছে না ঠিক।

'ধুস্! লক্ষণ-টক্ষণগুলো কী?'

এই ধরুন, রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় না। যেটুকু হয়, সেটুকুও নাকি ভয়ঙ্কর স্বপ্নে ভরা। কখনও দেখেন রাক্ষস আসছে হাঁ করে তেড়ে। কখনও দেখেন, সাতটা ভালুক এসে সামনে ধেই ধেই করে নাচছে। আবার কখনও দেখেন, পেত্নী এসে দাঁত বের করে বেজায় ঝগড়াঝাটি করছে। এইসব আর কী!'

ভবভূতি একটু হেসে বললেন, 'ও কিছু না। বদহজম। হজমী ওষুধ খাইয়ে দিও।'

বিরক্ত হয়ে বললুম, 'হজমী ওষুধ! গিয়ে দেখুন না ঘরভর্তি খালি নানারকম হজমী ওষুধের শিশি।'

ভবভূতি চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'তোমার পিসিমার বয়স হয়েছে তো! এ বয়সে অমন হয়েই থাকে। আমার বারাসতের মাসিমার অবস্থা দেখলে তো চমকে উঠতে। বেশ বসে আছেন। হেসে কথা বলছেন। হঠাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠতেন, 'কী রে বংশীবদন? চললি কোথায়?' জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'ওই

আমাদের ঘুঘুডাঙার বংশী। বড় ভাল ছেলে ছিল আহা! সাপের কামড়ে এই বয়সেই বেচারা মারা পড়ল।'

ভবভূতি হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, 'তা পিসিমাকে কোথাও নিয়ে যাবে বুঝি? কোন বড় ডাক্তারে সন্ধান পেয়েছ?'

ভবভূতিবাবু লোকটিই এমন। কান করে কিছু শোনেন না। বললুম, 'পেয়েছি।'

'কোথায় শুনি।'

'কেকরাডিহিতে।'

'কেকরাডিহি? সে আবার কোথায় হে?'

'কেবলরামের দেশে।'

ভবভূতি নাক সিঁটকে বললেন, 'হুঁঃ! নিশ্চয় বেহদ্দ পাড়াগাঁ। তোমাদের কেবলচন্দ্রটিকে দেখলেই বোঝা যায়, তার দেশটা কেমন। তা সেখানে বুঝি কোন ওঝাটোঝার খবর পেয়েছে?'

'কতকটা তাই জ্যাঠামশাই। তবে তিনি মানুষ নন।'

ভবভূতি চমকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ, মানুষ নন। তবে কী?'

'পক্ষী'।

'পক্ষী! মানে পাখি?' ভবভূতি খিক খিক করে হাসতে লাগলেন। 'পাখি করবে মানুষের চিকিৎসা! ওই ব্যাটা কেবলচন্দ্রটা বলেছে বুঝি? যেও না হে, মারা পড়বে।'

গম্ভীর হয়ে বললুম, 'না জ্যাঠামশাই! ব্যাপারটি বলি শুনুন। কেকরাডিহি গ্রামের কাছে একটা পোড়ো ম ্য আছে নাকি? সেখানে মাঝে মাঝে একটা দাঁড়কাক আসে কোত্থেকে। মানুষের ভ ষায় কথা বলে। রোগীদের রোগের কথা শুনে ওষুধ দেয়। কীভাবে খেতে হবে, তাও বলে দেয়।'

ভবভূতি আরও হেসে বললেন, 'দাঁড়কাকটার সঙ্গে একটা ওষুধের বাকসোও থাকে বুঝি?

'না, না। কথাটা শুনুন আগে। রোগের কথা আঁতিপাতি জিজ্ঞেস করে দাঁড়কাকটা উড়ে যায়। চক্কর মেরে কোত্থেকে ঠোঁটে করে একটা শেকড়বাকড় নিয়ে আসে!'

ভবভূতির চুরুট নিভে গিয়েছিল! ফের দেশলাই জ্বেলে ধরিয়ে ঠোঁটে চুরুট থাকা অবস্থায় বললেন, 'গাঁজা!' তারপর ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'গুল!' শেষে বললেন, 'বেঘোরে মারা পড়বে। যেও না।'

তারপর যেন খাপ্পা হয়েই বেরিয়ে গেলেন।.....

কিন্তু দুপুরবেলা যখন গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছি সবে, দেখি ভবভূতি সেজেগুজে হন্তদন্ত হাজির। মাথায় ফেল্টটুপি, গায়ে বুশশার্ট, পরনে ব্রিচেসের মত আঁটা প্যান্ট, পায়ে হ্যান্টিং বুট এবং কাঁধে কিটব্যাগ, পিঠে বন্দুক। চোখ থেকে সানগ্লাস খুলে একগাল হেসে বললেন, 'চলো আমিও যাই সঙ্গে। অনেকদিন শিকার-টিকার করি নি। হাতটা সুড়সুড় করছে।'

রাঙাপিসিমা খুশি হয়ে বললেন, 'ভবদাকে পেয়ে মনে জোর এল। পাড়াগাঁয়ে আজকাল বড্ড নাকি ডাকাতের উপদ্রব।'

ভবভূতি নাদুস-নুদুস ভুঁড়িওয়ালা প্রকাণ্ড মানুষ—কিন্তু বেজায় বেঁটে। আমার

পাশে বসে বললেন, 'ক্যাবলা, পেছনে যা।' কেবল পেছনে পিসিমার কাছে গিয়ে বসল। তারপর ভবভূতি বললেন, 'হাঁ রে কেবলচন্দ্র তোদের ওখানে বাঘ-টাঘ নেই?'

কেবলরাম একগাল হেসে বলল, 'নেই কী, তাই বলুন ছার।'

'ছার' শুনে রাঙাপিসিমা খিকখিক করে হেসে উঠলেন। আমার ভালই লাগল। অনেককাল পিসিমাকে হাসতে দেখিনি। ভবভূতি বললেন, 'বাঘ আছে বলছিস? কিন্তু বাঘ মারা আজ কাল যে বেআইনি। বাঘ মারব না। বরং দু'চারটে পাখিটাখি মারব।'

কেবলরাম ভয় পাওয়া গলায় বলল, 'কক্ষনো ও কাজ করবেন না, ছার! দণ্ডীবাবা ক্ষেপে যাবেন। শাপ দেবেন। শাপে কী হবে জানেন ছার?'

ভবভূতি গোঁফ পাকিয়ে বললেন, 'কী হবে শুনি?'

'মাথার সব চুল উড়ে যাবে।'

ভবভূতি নিজের মাথায় প্রকাণ্ড টাকে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ধুস! আমার তো চুলই নেই! পেছনে কয়েকগাছা আছে—যায় তো তাও যাক্। ক্ষতি কিসের?'

আমাদের গাড়ি শহর ছাড়িয়ে নদীর ব্রিজে পৌঁছল। তারপর ফাঁকা রাস্তা একেবারে। সারাপথ ভবভূতি কেবলরামের সঙ্গে রসিকতা করতে করতে চললেন। পিসিমাও খুব হাসলেন। তার ফলে কেকরাডিহির 'দণ্ডীবাবার প্রতি আমার ভক্তিটা ক্রমশ বেড়ে গেল। এই হাসিখুশিটা খুব শুভলক্ষণ বৈকি।

মাইল দশেক চলার পর কেবলরাম বলল, 'এবার কাঁচা রাস্তা দাদাবাবু!'

কাঁচা মানে কাঁচা! জীবনে এমন অখাদ্য রাস্তায় কখনও গাড়ি চালাইনি। ভয় হচ্ছিল, গাড়ি না বিগড়ে যায়। আরও মাইল চারেক এগিয়ে বাঁদিকে একটা বিশাল ডাঙাজমি পড়ল। ঘুঁটিং কাঁকর যত, তত ছোটবড় পাথরের টুকরো! বাংলা বিহারের সীমান্ত এলাকা এটা। কেবলরাম চেঁচিয়ে উঠল, 'এইখানে! এইখানে!' গাড়ি থামালুম।

কেবলরাম মাঠের ওধারে একটা গ্রাম দেখিয়ে বলল, 'ওই হল গে কেকরাডিহি দাদাবাবু। আর এই হল গে দণ্ডীবাবার থান।'

ভবভূতি বললেন, 'থান? কোথায় থান?'

একটা বাজপড়া ন্যাড়া তালগাছ দেখিয়ে কেবলরাম ঢিপ করে প্রণাম করল। রাঙাপিসিমাও তার দেখাদেখি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। ন্যাড়া তালগাছের পেছনে একটা মস্ত বড় পাথর রয়েছে। কেবলরাম বলল, বাবার ভোগ রাখতে হবে ওই পাথরটার ওপর। আর বাবা উড়ে এসে বসবেন ওই মুড়ো তালগাছের মাথায়। এসে যখনই কা কা করে ডাকবেন তখন ওনাকে সব বলতে হবে।'

ভবভূতি বললেন, 'বাবার ভোগটা কী হে কেবলচন্দ্র?'

'আজ্ঞে ইঁদুর। মরা হলে চলবে না। জ্যান্ত চাই। লেজে সুতো বেঁধে পাথরটার ওপর রাখতে হবে। পালাতে পারবে না। সুতোটায় এক টুকরো পাথরচাপা দিয়ে রাখলেই চলবে।'

পিসিমা ব্যাগ থেকে পাঁচটা টাকা বের করে বললেন, 'তুই তাহলে শিগগির ইঁদুর নিয়ে আয় বাবা।'

কেবলরাম টাকাটা ফতুয়ার পকেটে ঢুকিয়ে বলল, 'আপনি থানের সামনে গিয়ে বসুন পিসিমা। হাতজোড় করে চোখ বুঝে বসে থাকবেন। ভাগ্যে দর্শন থাকলে পাবেন—নইলে পাবেন না। আমার কোন দোষ নেই। বলেছিলুম, বারবেলা তিথি নক্ষত্র দেখে আসতে হবে।'

পিসিমা বললেন, 'তুই যেন শিগগির ভোগ নিয়ে আসবি। দেরি করিসনে বাবা!'

কেবল যেতে যেতে বলল, 'যাব আর আসব। নেতাইদার ঘরে ইঁদুর পোষা আছে না? লোকেরা হরদম কিনে এনে ভোগ দিচ্ছে বাবাকে'।

সে চলে গেলে পিসিমা লাঠি ঠুক ঠুক করে ন্যাড়া তালগাছটার গুঁড়ির কাছে গিয়ে করজোড়ে বসে পড়লেন। ভাবভূতি চারিদিকটা দেখে নিয়ে বললেন, 'দেখি কোথাও শিকার পাই টাই নাকি।'

উনি বন্দুক বাগিয়ে সামনে ছোটবড় পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। গ্রীষ্মের বিকেল। কিন্তু খোলামেলা জায়গা বলে হু-হু করে বাতাস বইছে। গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। দৃষ্টি তালগাছের মাথার দিকে। উহুঁ—মাথাই তো নেই তালগাছটার। একেবারে কবন্ধ। এখন শুধু ভাবনা কেবলরাম ভোগ আনবার আগে বাবা এসে পড়লে পিসিমা কীভাবে ঠেকিয়ে রাখবেন।

একটু আনমনা হয়েছিলাম। হঠাৎ কানে এল ভরাট গম্ভীর গলার ডাক —'গা গা গা!' তাকিয়ে দেখি তালগাছের বাজপড়া ডগায় কখন এসে গেছে এক দাঁড়কাক। পেল্লায় চেহারা! আর সে কী ডাক! কা কা নয়—একেবারে গা গা গাও গাও!

পিসিমা নিশ্চয় 'গাও গাও' শুনেই ভজন গাইতে শুরু করেছেন। ভারি মিঠে গলা তো রাঙাপিসিমার! উনি যে এত সুন্দর গান গাইতে পারেন জানতুম না তো!

দণ্ডীবাবা মুগ্ধভাবে বসে গান শুনছেন মনে হল। কিন্তু কেবলরাম আসছে না কেন? বাবা যদি রাগ করে চলে যান? পিসিমা যেন ওঁকে ঠেকিয়ে রাখতেই ভজন লম্বা করে চলেছেন। পিসিমার বুদ্ধিসুদ্ধি আছে বলতে হয়। যখনই দম নিতে থামছেন, দণ্ডীবাবা বলে উঠছেন 'গা গা; গাও গাও!'

একসময় পা টিপে টিপে কেবলরাম এসে পড়ল। তার হাতে মোটা সুতোয় বাঁধা তিনটে নেংটি ইঁদুর ঝুলছে অথবা দুলছে। সুতো বেয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। কেবলরামের ঝাঁকুনি খেয়ে ফের লম্বা হয়ে পা ছুড়ছে। লেজ নাচাচ্ছে।

সে ভক্তিভরে সাবধানে হামাগুড়ি দিয়ে পিসিমার কাছে ভোগ পৌঁছে দিতে গেল। এখন একটাই সমস্যা। পিসিমার ইঁদুর-আরশোলাকে বড্ড ভয়। কেবলরাম অবশ্য সেটা জানে। কিন্তু পিসিমার কাছাকাছি ভোগ রাখলে পিসিমা কতটা সামলাতে পারবেন জানি না। উত্তেজনায় উদ্বেগে তাকিয়ে রইলুম।

ইঁদুর তিনটে দেখামাত্র পিসিমার গান থেমে গেল। তিনি ইশারায় কেবলরামকে দূরে ওগুলো রাখতে বলেছেন এবং সেই সঙ্গে হাউমাউ করে দণ্ডীবাবার উদ্দেশে বলছেন, 'ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর স্বপ্ন বাবা! বড় বড় রাক্ষস-খোক্কস! হাঁ করে গিলতে আসে। আর একটা কালো কুচ্ছিত পেত্নী বাবা, সাদা থানের কাপড় পরে আমাকে ভেংচি কাটে। গাল দেয়। আমি কোন দোষ করিনি বাবা, তবু আমাকে গালমন্দ করে। শোনো বাবা, একটা-দুটো নয়—সাত-সাতটা এসে নাচে। আমার দম আটকে যায় বাবা!'

দণ্ডীবাবা ডানা চুলকোচ্ছেন ঠোঁট দিয়ে। তারপর হঠাৎ ওপাশে ঘুরে কী যেন দেখতে থাকলেন। এবার ইঁদুর তিনটে দেখিয়ে মরিয়া হয়ে কেবলরাম চেঁচাল, 'ইদিকে দেখুন বাবা! ভোগ এনেছি আপনার!'

কিন্তু বাবার মনে কী ছিল হঠাৎ উড়ে চলে গেলেন। পিসিমা করুণ মুখে বললেন, 'বাবা যে ভোগ ফেলে চলে গেলেন কেবলরাম! তাহলে আমার কী হবে?'

কেবলরাম বলল, 'কিছু ভাববেন না। ভোগ থানে ছেড়ে দিচ্ছি। বাবা যখন খুশি ফিরে এসে খাবেন। চলুন, এখন আর বসে থেকে লাভ নেই।

'আমার অসুখের ওষুধ যে দিয়ে গেলেন না?'

'ওই তো ওষুধ আপনার মাথায়!'

পিসিমা ঝটপট মাথায় হাত দিতেই পেয়ে গেলেন কিছু। সঙ্গে সঙ্গে আঁচলে বাঁধলেন। কেবলরাম ইঁদুরেগুলো ছেড়ে দিল পাথরের ওপর। পিসিমা গাড়ির কাছে এলে বললুম, 'ওষুধটা দেখি, পিসিমা!'

পিসিমা বললেন, 'এখন দেখতে নেই। পরে দেখিস। ও কেবল, ভবদাকে ডাক।'

এই সময় ভবভূতির সাড়া পাওয়া গেল বন্দুকের আওয়াজে। নিশ্চয় পাখি-টাখি মারলেন। কেবল ওঁকে ডাকতে গেল।

একটু পরে ফিরলেন দুজনে। দুজনেরই মুখ গম্ভীর। কিন্তু শিকার কই? জিজ্ঞেস করলে ভবভূতি শ্বাস ছেড়ে শুধু বললেন, খুঁজে পেলুম না। যা পাথর চারদিকে! যাকগে! খামোকা একটা গুলি খরচ হল।'

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। আবার কাঁচা রাস্তায় নড়চড় করতে করতে গাড়িটা এগোল কষ্টেসৃষ্টে।

পিসিমা ওষুধটা দেখিয়েছিলেন। শুকনো এক টুকরো কাটি—কিংবা শেকড়, বুঝতে পারি নি। সেটা হামানদিস্তায় গুঁড়ো করে কেবলরামের নির্দেশ মত রোজ সূচের ডগায় একবিন্দু তুলে জলের সঙ্গে খেতেন পিসিমা। আশ্চর্য ব্যাপার। আর রাক্ষস, ভাল্লুক বা পেত্নীটা এসে জ্বালাত না। দিব্যি ঘুমোতেন। সব সময় হাসিখুসি মেজাজ।

একদিন ভবভূতি এসে কিছুক্ষণ আড্ডা দিয়ে চলে যাবার পর কেবলরাম বলেছিল, 'ভবছারের মাথাটা দেখেছেন? পেছনে গোটাকতক চুল ছিল, তাও আর নেই! হুঁ—হুঁ বাবা শাপ বলে কথা!'

জিগ্যেস করেছিলাম, 'কিসের শাপ? কে শাপ দিল ওঁকে?'

'আবারে কে? দণ্ডীবাবা!' কেবলরাম গলা চেপে বলেছিল। 'বলতে বারণ করেছিলেন দুটো টাকা দিয়ে। তাই বলিনি। কিন্তু টাকা শোধ হয়ে গেছে অ্যাদ্দিনে। এবার বলে দিই দাদাবাবু। ভবছার সেদিন কেকারাডিহির দণ্ডীবাবাকে গুলি করে মেরেছেন, জানেন?'

'অ্যাঁ। বলিস কি রে?'

'হ্যাঁ—দাদাবাবু। গিয়ে দেখি এই কাণ্ড। দণ্ডীবাবা পড়ে রয়েছেন গুলি খেয়ে। আর ভবছার মুখ চুণ করে দাঁড়িয়ে আছেন। দেখে আমি হায় হায় করে উঠলুম। তখন উনি বলেন কি, পানকৌড়ী উড়ে যাচ্ছে ভেবে গুলি করেছিলাম রে! তুই

এই দুটো টাকা নে—কাকেও যেন বলিস নে।'

বলেছিলাম, 'চেপে যা। আমায় যা বললি, বললি। কক্ষনো পিসিমা যেন না শোনেন।'

বুদ্ধিমান কেবলরাম কথাটা পিসিমাকে বলেনি আজও। তবে এ কথা সত্যি যে ভবভূতির মাথায় আর একগাছি চুলও নেই। কেকরাডিহির দণ্ডীবাবার অভিশাপ ছাড়া আর কী কারণ থাকতে পারে।

কিংবদন্তির শঙ্খচূড়

শেয়ালের ফাঁদ

জয়রামবাবু বললেন, 'মানুষের মতো মানুষের মুখের ভাষাকেও রোগে ধরে। ষট্‌গর্ভ কথাটা রোগে ভুগে দাঁড়িয়েছে সাতগড়ায়। এ যেন সুকুমার রায়ের গল্পের মতো ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়াল! ছিল ষট্‌গর্ভ হয়ে গেল সাতগড়া!'

খিকখিক করে হাসতে হাসতে লাগলেন আমাদের গৃহস্বামী জয়রাম সিঙ্গিশাই। এখন আমরা অবশ্য ওঁর গৃহে নেই। ওঁর ফার্ম চক্কর দিয়ে অধিক ফলনশীল ভুট্টাক্ষেতের পাশে একটা নালার ধারে প্রকাণ্ড পাথরে বসে আছি। ডাইনে টিলার মাথায় সূর্য কাত হয়ে গড়াচ্ছে। শেষবেলার নরম রোদে সবুজ শস্য এবং গাছ-গাছালি ঘুম ঘুম চোখে দাঁড়িয়ে আছে! বাতাস বইছে না। কিন্তু গরমটা কমে গেছে। বাপ্‌স! এখানে জুনমাসে কী প্রচণ্ড গরম, কল্পনা করা যায় না। এই গরমে কর্নেলের মাথায় বিদঘুটে বাতিক গজিয়ে উঠল। সাতগড়া নিয়ে এলেন টানতে টানতে। এসে থেকে মনটা খালি পালাই পালাই করছে।

সিঙ্গি মশাইয়ের বয়স বোধ করি বাহান্ন-পঞ্চান্নর মাঝামাঝি হবে। চেহারায় পোড় খাওয়া ভাব আছে। স্বাস্থ্যও চমৎকার। গায়ে ছাইরঙা স্পোর্টস গেঞ্জি, পায়ে গামবুট, মাথায় নীলচে রোদ-টুপি। একটা গাঁট্টা মারকুটে চেহারার কালো অ্যালসেশিয়ানের চেন ওর ডান হাতের মুঠোয়। বাঁহাতে একটা ছড়ি। কুকুরটা মাঝে মাঝে মুখ তুলে কী যেন দেখছে আর ছুটে যেতে চেষ্টা করছে। আতঙ্কে তারদিকে নজর রেখেছি। কুকুরটা আমার দু'চোক্ষের বিষ। হতচ্ছাড়া প্রাণীটা যেন তা টের পেয়েছে এং দু একবার মনিবের পায়ের কাছ থেকে ঘাড় বেঁকিয়ে লাল চোখে আমাকে গরগর করে শাসাচ্ছে।

আশ্চর্য, কুকুরটা কর্নেলের হাঁটুর কাছটা শুঁকছে। বুড়োকে কেন ওর অত পছন্দ হয়ে গেল ভেবেই পাচ্ছি না। সে কি ওঁর সায়েবী চামড়া আর শাদা দাড়ির জন্য? শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর!

জয়রামবাবু ষট্‌গর্ভের কাহিনী বলছেন। আমার চোখ-কান-মন কুকুরটার দিকে। একটু পরে কী ভাবে কুকুরটা ছাড়া পেয়ে গেল কে জানে! চেনসুদ্ধু দৌড়ে গেল বেঁটে চওড়া পাতাওয়ালা গাছগুলোর দিকে। জায়গাটা ঘন ঘাস, ঝোপঝাড় আর

শুকনো পাতায় ঢাকা। জয়রামবাবু একবার ধমক দিলেন, 'জনি! কাম ব্যাক'! তারপর একটু হেসে বললেন, 'দেখুন না মজাটা! চেন কোথাও আটকে গিয়ে জব্দ হবে।'

কুকুরটা ততক্ষণে গতি কমিয়ে একখানে গিয়ে থেমেছে এবং জিভ বের করে সামনে তাকিয়ে। জয়রামবাবু, বললেন, 'হ্যাঁ—যা বলছিলুম। ষট্‌গর্ভ। তার মানে ছটা গুহা। ওই যে প্রায় ন্যাড়া পাহাড়টা দেখছেন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, ওখানেই আছে পাশাপাশি ছটা গুহা। পাঁচটা গুহাই ভেতরে ধস ছেড়ে বন্ধ হয়ে গেছে কোন যুগে। একটা অক্ষত আছে।'

জিজ্ঞেস করলুম। 'ভেতরে ঢুকেছেন নাকি?'

সিঙ্গিমশাই বললেন, 'যতবার ঢোকার চেষ্টা কেউ করেছে, ততবারই সাপের তাড়া খেয়ে পালিয়েছে। আমাকে তো তাড়া করে আমার ফার্ম অবধি এসেছিল। সে এক মারাত্মক অভিজ্ঞতা।

'কী সাপ?'

'শঙ্খচূড়।' জয়রামবাবু একটু হাসলেন। 'বললেন, গুলি করে মেরে ফেলি নি কেন? আপনারা তো দেখেছেন, বিষধর সাপ আমি মারি না, ধরি। এক্সপেরিমেন্ট করি। বিশেষ করে ওই শঙ্খচূড় সাপটাকে ধরার জন্য কত যে চেষ্টা করেছি, ব্যর্থ হয়েছি। সাপটা মশাই মানুষের ছেয়ে ধূর্ত। কর্নেল সায়েব এবার যদি কিছু করতে পারেন।'

বলে উনি কর্নেলের দিকে ঘুরলেন। আমিও ঘুরে কর্নেলের দিকে তাকালাম। ওহে ধুরন্ধর ঘুঘু বুড়ো, তাই তোমার এই ভয়ঙ্কর জুন মাসে সাতগড়া আগমন। চোখে চোখ পড়লে প্রকৃতিবিদ বৃদ্ধ কাঁচুমাচু হাসলেন। তারপর একটু কেসে বললেন, 'ইয়ে—মিঃ সিংহ, আপনারা গল্প করুন। আমি নালার ধারটা ঘুরে আসি।'

পাথরটা থেকে লাফ দিয়ে নেমে সোজা নালার ধারে কর্নেল কিছুটা এগোলেন। তারপর হাঁটু দুমড়ে বসলেন। তারপর ওঁর চিরাচরিত খেলা শুরু হয়ে গেল। একবার এদিকে একবার ওদিকে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছেন, কখনও কাত হয়ে প্রায় শুয়ে পড়ছেন ঘাসের ভেতর—এবং চোখে বাইনোকুলার। অ্যালসেশিয়ানটা হকচকিয়ে গেছে যেন বুড়োর কাণ্ড দেখে। গরগর করে দুঠ্যাঙে বসে দুঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে কুকুরী পদ্ধতিতে।

সিঙ্গিমশাই অবাক হয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো জয়ন্তবাবু?'

মুচকি হেসে বললুম 'আবার কী? কোনো বিরলপ্রজাতির পাখি-টাখি দেখেছেন।'

'তাই বলুন।' বলে জয়রামবাবু প্যান্টের পকেট থেকে পাইপ বের করলেন।

আমার চোখ কর্নেলের দিকে যতটা না, ততটা কুকুরটার দিকে। একটু পরে দেখি, কর্নেল বেঁটে গাছগুলোর দিকে দৌড়ুচ্ছেন। ফাঁকা ঘাসজমিটায় গিয়েই কর্নেল আচমকা অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি দারুণ চমকে উঠলুম। এ যে অবিশ্বাস্য ব্যাপার! চারদিকে অনেকটা ফাঁকা ওখানে। জলজ্যান্ত একটা মানুষকে জাদুকর যেমন স্টেজে অদৃশ্য করে দেয়, এও যেন তেমনি।

জয়রামবাবুও পাইপ সাফ করতে করতে দেখেছিলেন ব্যপারটা। ওঁর চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে উঠতে দেখলুম। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বলে উঠলেন, 'সর্বনাশ!'

অ্যালসেশিয়ান ততক্ষণে কর্নেলের শূন্যে মিলিয়ে যাওয়ার জায়গায় পৌঁছে গেছে

এবং গরগর করে ঘাস শুঁকছে। জয়রামবাবু পাথর থেকে লাফ দিয়ে দৌড়তে শুরু করলেন। আমিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ওঁকে অনুসরণ করলাম।

ঘাসজমিটার প্রচুর শুকনো পাতা পড়ে রয়েছে। দুপুরের গরম হাওয়াই গাছগুলো থেকে শুকনো পাতা ঝেঁটিয়ে এনে জড়ো করে সম্ভবত! একখানা দেখি, পাতার স্তূপ বেজায় নড়ছে। জয়রামবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কর্নেল! কর্নেল!'

সেই স্তূপের ভেতর থেকে নাকিস্বরে আওয়াজ এল, 'এই যে এখানে।'

জয়রামবাবু ছড়ির ডগা দিয়ে পাতাগুলো সরালে নিচে একটা টাকওয়ালা মাথা দেখা গেল—নিঃসন্দেহে সেই প্রখ্যাত গোয়েন্দাপ্রবর এবং অধুনা যিনি প্রকৃতিবিদ, তাঁরই বহুমূল্য ঘিলু ওই মাথার ভেতরই রয়েছে। একটা গভীর গর্ত থেকে যখন ওকে টেনে তুললুম, তখন ওঁর রূপ বদলে গেছে। আপাদমস্তক কাদার সঙ্গে শুকনো পাতা আর ঘাসের কুটো মেখে সে এক আজব মূর্তি।

কুকুরটাও গরগর করে হেসে উঠল। আমিও হাসি চাপতে পারলুম না কিন্তু জয়রামবাবু দুঃখিত মুখে বলতে থাকলেন, 'আমারই ভুল হয়ে গেছে! ছি ছি! আপনাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিল—ওখানে শেয়ালের ফাঁদ পেতে রেখেছি। শেয়ালগুলো বড্ড জ্বালাতন করে কিনা। কচি আখ নষ্ট করে। ভুট্টার খেতে ঢুকে খামোকা ভুট্টাগুলো দাঁতে কেটে পয়মাল করে দেয়।'

কর্নেল দাড়ি থেকে শুকনো পাতা সাফ করতে করতে গোমড়ামুখে বললেন, 'চলুন ফেরা যাক।' তারপর কয়েক পা এগিয়ে বাচ্চা ছেলের মতো হি হি করে হেসে উঠলেন। হাসিটা ক্রমশ বদলাতে থাকল। হা হা হা হা......তারপর হো হো হো হো......সে কি বিকট হাসি। এমন হাসি কস্মিনকালে এই রাসভারি লোকটিকে হাসতে দেখিনি। দমফাটানো হাসিটা বেড়ে চলেছে। জয়রামবাবু এবং আমি এবার একটু চমকে গেছি। কর্নেলের কি সেই বিদঘুটে হাসিরোগে ধরল? শেয়ালের ফাঁদে পড়ে কি সেই মারাত্মক অসুখের বীজাণু ঢুকে গেছে কর্নেলের শরীরে? কিছুক্ষণ পরে আমাদের উৎকণ্ঠা দূর করে কর্নেল হাসি থামালেন। তারপর বললেন, 'স্নান করব।'.....

সাপের মাথার মণি

রাতে খাওয়ার টেবিলে জয়রামবাবু কর্নেলের সঙ্গে পাহাড়ের গুহার সেই শঙ্খচূড় সাপটাকে ধরার ফন্দিফিকির নিয়ে অলোচনা করছিলেন। কর্নেলের মতে, সাপটাকে আহত না করে ধরার একমাত্র উপায় হচ্ছে আঠা ব্যবহার গুহার কাছাকাছি কোথাও অনেকটা আঠা ছড়িয়ে রাখলে কাজ হতে পারে। মানুষের পায়ের শব্দে সাপটি যদি বেরিয়ে আসে, আঠায় আটকে যাবার সম্ভবনা আছে। তখন একটা দড়ির ফাঁস পরাতে পারলে আর অসুবিধে হবে না।

জয়রামবাবুর মনে ধরল কথাটা। বললেন, 'তাহলে কাল সকালেই সম্বলপুর গিয়ে আঠা আনব। ওখানে আঠা তৈরির কারখানা আছে।'

কর্নেল বললেন, 'আমিও বরং সঙ্গে যাব। সম্বলপুরে আমার এক বন্ধু আছেন।

দেখা করে আসা যাবে। তারপর আমার দিকে ঘুরে বললেন, 'জয়ন্ত ততক্ষণ নদীর ধারে গিয়ে সিনারি দেখবে। মহানদীর বুকে অনেক আশ্চর্য গড়নের পাথর দেখতে পাবে ডার্লিং। ওড়িশার বহু ভাস্কর্য সেইসব পাথর দিয়ে গড়া।'

মনে মনে খাপ্পা আমি। একা এই ফার্মহাউসে সময় কাটানোর কথা ভাবা যায় না। মহানদীর ধারে যাব কী। আটটা বাজতে না বাজতে রোদ একেবারে আগুন হয়ে উঠবে। গায়ে ফোস্কা পড়ে যাবে।

বললুম, 'আচ্ছা জয়রামবাবু, শঙ্খচূড় সাপটা নিয়ে কী এক্সপেরিমেন্ট করবেন বলুন তো?'

জয়রামবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'প্রমাণ করব যে, সাপের মাথায় সত্যি মণি জন্মায়। লোকে বলে, অজগরের মাথায় নাকি মণি জ্বলে। বিলকুল মিথ্যে। অজগর হল পাইথন। নির্বিষ পাইথনের মাথায় মণি হবে কোন দুঃখে? কয়লা থেকে যেমন হীরের জন্ম, তেমনি প্রচণ্ড বিষ থেকে মণির জন্ম। যে-সে মণি নয়, নীলকান্ত মণি। হীরের মতোই এ মণি দারুণ বিষাক্ত।'

'কিন্তু কী করে বুঝলেন শঙ্খচূড়টার মাথায় মণি আছে?'

রহস্যময় ভঙ্গিতে কর্নেলের দিকে চেয়ে চাপা হেসে জয়রাম সিঙ্গি বললেন, 'দেখেছি। ইচ্ছে করলে আপনিও দেখতে পারেন, যদি রাতবিরেতে ফার্মের শেষ দিকটায় গিয়ে ওত পাতেন। পাহাড়ের গায়ে নীল ছটা ঝিকমিক করছে দেখতে পাবেন। মশাই, ঝিনুকের পেটে মুক্তো হয়। হাতির মাথার ভেতরে গজমোতি হয়। সাপের মাথাতেও মণি হয়। সবই প্রকৃতির সৃষ্টি। এতে অবাক হবার কী আছে?'....

অনেক রাতে কর্নেলের ডাকে ঘুমের আমেজ কেটে গেল। ফ্যানের হাওয়া ভ্যাপসা গরম ছড়াচ্ছে ঘরে। সাড়া দিয়ে বললুম, 'কী ব্যাপার?'

কর্নেল চাপা গলায় বললেন, 'সাপের মাথার মণি দেখবে কি ডার্লিং? তাহলে আমার সঙ্গে চুপচাপ বেরিয়ে এস।'

দরজাটা ভেজিয়ে রেখে আমরা বেরোলুম। এদিকটায় ফার্মহাউসের ফুল-ফলের বাগান। একেবারে অন্ধকার। কর্নেলের এত লুকোচুরির কারণ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বাগানে ঢোকার পর বাড়ির ভেতর অ্যালসেশিয়ানটার গজরানি শোনা যাচ্ছিল। একটু পরে থেমে গেল। ততক্ষণে অন্ধকার দৃষ্টি পরিষ্কার হয়েছে। দেখলুম আমরা একটা পুকুরের ধারে এসে গেছি। দিনে পুকুরপাড়ে কলা আর পেঁপের গাছ দেখেছিলাম। তার ভেতর ঢুকে কর্নেল ফিস ফিস করে বললেন, 'আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এস পেছনে। সাবধান, শুকনো পাতা আছে। আস্তে পা ফেলবে।'

ভয়ে ভয়ে বললুম, 'শেয়ালের ফাঁদ নেই তো?'

কর্নেল নিশ্চয় হাসছিলেন নিঃশব্দে। কিছুটা চলার পর ফাঁকায় পৌঁছে দেখি, একটু তফাতে আলো জ্বলছে কোনো বাড়িতে। সর্বনাশ! ওটাই তো সিঙ্গিমশাইয়ের সাপ-ঘর। সকালে কিছুক্ষণ সর্পদর্শন করে শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল আমার। অসংখ্য সাপ কাচের বড়-বড় কফিনের মতো বাক্সে কিলবিল করছে। ওখানেই কি সাপের মণি দেখতে নিয়ে যাচ্ছেন কর্নেল?

আলোটা আসছিল জানালার ফাঁক দিয়ে। কর্নেল সেই ফাঁকে চোখ রেখে কিছুক্ষণ

দাঁড়িয়ে রইলেন। উত্তেজনায় আমার বুক কাঁপছে। তারপর কর্নেল সরে এসে কানে কানে বললেন, 'যাও, দেখে এসো।' পা টিপে টিপে এগিয়ে ফাঁকটায় চোখ রেখে দেখি, জয়রামবাবু একটা টেবিলের সামনে বসে আছেন। তাঁর গলায় একটা সাপ জড়ানো। সাপটা ফণা তুলছে মাঝে মাঝে এবং কাঁধ ঘুরে পিঠে, আবার পিঠ থেকে বুকের দিকে নেমে আসছে। দেখে গা শিরশির করছিল আতঙ্কে। টেবিলের অন্যদিকে বসে আছে একটা রোগা এবং একটা বেঁটে মোটাসোটা লোক। তাদের দেখে মোটেও ভালমানুষ মনে হল না। চাপাগলায় জয়রামবাবু কী সব বলছেন বুঝতে পারলুম না। লোকদুটো চুপ করে আছে। টেবিলের ওপর দুটো প্যাকেট রয়েছে। একটা প্যাকেট থেকে জয়রামবাবু কয়েকটা ক্যাপসুল বের করলেন। সেই সময় কর্নেল এসে আমাকে সরিয়ে ফাঁকটা দখল করলেন। আমি ওঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলুম। মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে পারছিলুম না ব্যাপারটা।

জয়রামবাবু কি নিষিদ্ধ মাদকদ্রব্যের চোরাকারবার করেন? মনে এই সন্দেহ দানা বাঁধছিল। তাছাড়া রাত দুপুরে এভাবে দুটো লোকের সঙ্গে ক্যাপসুলের প্যাকেট নিয়ে কথা বলার কী কারণ থাকতে পারে?

সাতপাঁচ ভাবছি এবং ততক্ষণে উত্তেজনার ফলে ক্লান্তিও বোধ করছি, এমন সময় কর্নেল সরে এসে আমার কাঁধে হাত রাখলেন। তারপর কানে কানে বললেন, 'পেছন-পেছন এস।'

এবার পুকুরপাড়ে না গিয়ে সোজা বাঁহাতি এগিয়ে একফালি সরু রাস্তায় পৌঁছুলুম। রাস্তাটা নক্ষত্রের আলোয় সাদা দেখাচ্ছিল। রাস্তার ওপাশে গাছ-পালা ঝোপঝাড় কালো হয়ে আছে। একটুও বাতাস বইছে না। রাস্তাটা ফার্ম এলাকার দক্ষিণ প্রান্তে ঘুরে পশ্চিমে চলেছে। কতক্ষণ পর সেই নালার কাঠের সাঁকোয় গিয়ে কর্নেল বললেন, 'কিছু বুঝলে?'

'ভদ্রলোক নিষিদ্ধ ড্রাগের চোরাকারবার করেন মনে হচ্ছে।'

'ওগুলো মাদক নয়।' কর্নেল আস্তে বললেন। 'ওই ক্যাপসুলের মধ্যে আছে ভয়ঙ্কর ভাইরাস। সাপের বিষের সঙ্গে শেয়ালের ক্ষত থেকে একরকম জীবাণু নিয়ে মিশিয়ে জয়রাম সিঙ্গি ওই মারাত্মক ভাইরাস বা জীবাণু সৃষ্টি করতে পেরেছে লোকটার বৈজ্ঞানিক প্রতিভা আছে সন্দেহ নেই। একসময় বিদেশের একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণা করত শুনেছি।'

অবাক হয়ে বললুম, 'ওই ভাইরাস দিয়ে কী করবেন সিঙ্গি মশাই?'

'কোনো দেশের ফসলের মাঠে কয়েকটা ক্যাপসুল ভেঙে ছড়িয়ে দিলে সব ফসলে রোগ ধরে যাবে। ইচ্ছে করলে দেশে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করা যাবে। মাঠের পর মাঠ যদি ফসলে রোগ ধরে যায়, তাহলে কী সংঘাতিক অবস্থা হবে বুঝতে পারছ? তাছাড়া জল সংক্রামিত হয়ে মহামারীও হওয়া বিচিত্র নয়। বুঝতেই পারছ, কোনো শত্রুদেশের সরকার এমন সাংঘাতিক অস্ত্রের জন্য প্রচুর টাকা দিতে রাজি হবে।'

সর্বনাশ! এর কোনো প্রতিষেধক নেই?'

'জানি না। থাকলে জয়রাম সিঙ্গির কাছেই তার ফরমুলা থাকতে পারে।'

'আপনি কেমন করে জানলেন?'

'বিশ্বস্তসূত্রে।' বলে কর্নেল হঠাৎ ঘুরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে হাত তুললেন। 'ওই দেখ, জয়ন্ত। সাপের মাথার মণি জ্বলছে ষট্‌গর্ভ পাহাড়ের গায়ে।'

তাকিয়ে দেখি, দূরে উঁচুতে একটা নীল আলোর বিন্দু ঝিকমিক করছে। ওটা নক্ষত্র নয়, তা ঠিকই। কিন্তু ওটা সত্যি যে শঙ্খচূড় সাপের মাথার মণি, তার প্রমাণ কী?

আমাদের মনের কথাটা বুঝি টের পেলেন ধুরন্ধর গোয়েন্দাপ্রবর। কাঁধে হাত রেখে মৃদুস্বরে বললেন, 'ডার্লিং। এই পৃথিবীতেই বহু রহস্যময় জিনিস আছে, যা হঠাৎ চোখে পড়লে মানুষের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। যাক্‌গে, এস। এবার গিয়ে ঘুমনো যাক।.......

হায়েনার কান্না

সকালে কর্নেল জয়রামবাবুর সঙ্গে সম্বলপুর গেলেন জিপে চড়ে। মাইল ছ'য়েক দূরত্ব। আমি বেরোলুম না। রাতে ভাল ঘুম হয় নি। ভাবলুম সকালটা ঘুমিয়ে কাটানো যাবে। কিন্তু মনের ভেতর অশ্বস্তি। এই ভয়ঙ্কর লোকের আতিথ্যে আর এক মুহূর্ত কাটাতে ইচ্ছা করছে না। উঠে গিয়ে বারান্দায় বসলুম। সামনে ফার্মের সবুজ শস্যক্ষেত। হঠাৎ দেখি, ভুট্টাক্ষেত থেকে রাতে দেখা সেই বেঁটে মোটা লোকটা বেরিয়ে আসছে। তার হাতে অ্যালশিয়ানের চেন। কুকুরটা লাল জিভ বের করে পেছনে-পেছন আসছে। তাহালে রাতে সাপঘরে দেখা দুটো লোকই সিঙ্গিমশাইয়ের কর্মচারী। রোগা লোকটাকে একপলক দেখেছিলুম সকালে। পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাশ করছিল।

ডোরাকাটা গেঞ্জি আর জিনসের প্যান্টপরা বেঁটে লোকটা আসতে আসতে থমকে দাঁড়াল। অ্যালসেশিয়ানটা লাফ দিয়ে ঘুরল। লোকটাও ঘুরে কান খাড়া করে কী শুনল। কুকুরটা এবার তাকে টানতে টানতে ফের ভুট্টাক্ষেতের ভেতর নিয়ে গেল। জয়রামবাবু বলেছিলেন, ফার্মের ফসলে মাঝেমাঝে দিনদুপুরে বুনো, শুয়োর, কখনও হরিণের পাল, এমন কী সংরক্ষিত বনজঙ্গল থেকে হাতির দলও এসে হানা দেয়। শেয়ালের ভুট্টা নষ্ট করার কথাও বলছিলেন তাই ভুট্টাক্ষেতের শেষ দিকটায় উঁচু মাচানে পাহারার ব্যবস্থা আছে। মাচানটা গাছের আড়ালে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু এবার কানে এল ঢঙ ঢঙ ঢঙ করে ক্যানেস্তারা পেটানোর শব্দ হচ্ছে। ফার্মহাউস থেকে কয়েকজন লোককে দৌড়ে যেতে দেখলুম। তারা চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ভুট্টাক্ষেতে গিয়ে ঢুকল। প্রত্যেকের হাতে লাঠি বল্লম টাঙ্গি। খুব উত্তেজনার ব্যাপার, আমি বারান্দা থেকে নেমে গাছতলায় দাঁড়ালুম। হাতির পাল নিশ্চয় নয়, হরিণ কি শুয়োর হতে পারে।

এমন সময় সেই রোগা লোকটা এল। রাতে লোকটাকে কেমন বদমাস দেখাচ্ছিল। এখন দেখি, ভারি অমায়িক চেহারা। মুখে বিনয়ের হাসি। বলল, 'শেয়ালের ফাঁদে কোন জন্তু পড়েছে। দেখতে যাবেন নাকি স্যার?'

ব্যাপারটা দেখতেই হয়। ওর সঙ্গে যেতে যেতে জিগ্যেস করলুম, 'আপনি কি

ফার্মের কর্মচারী?'

সে বলল, 'হ্যাঁ স্যার। আমার নাম রতনকুমার পাত্র। আমি সিঙ্গি সায়েবের ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট!'

রতনকুমার আমাকে ভুট্টাক্ষেতে ঢোকাল না। পাশ দিয়ে এগিয়ে নালার ধারে নিয়ে গেল। এখানেও একটা কাঠের সাঁকো আছে। সাঁকোতে একটু থেমে সে চাপা গলায় বলল, 'আমাকে কর্নেল সায়েব অনেকদিন থেকে চেনেন। তবে এ কথাটা দয়া করে এখানে কাউকে যেন মুখ ফসকে বলবেন না।'

খুব অবাক হয়ে গেলুম। তাহলে কি সেই ভয়ঙ্কর ভাইরাস রহস্যের বিশ্বস্ত সূত্র এই লোকটিই?

কাল যেখানে কর্নেল ফাঁদে পড়েছিলেন, সেখান গোল হয়ে লোকগুলো দাঁড়িয়ে আছে। কেউ কেউ বল্লম দিয়ে কোনো প্রাণীকে ফাঁদের গর্তে খোঁচাচ্ছে এবং হতভাগ্য প্রাণীটা কোঁ-কোঁ করে আর্তনাদ করে উঠছে। দৃশ্যটা বীভৎস। অ্যালসেশিয়ানটা গর্তের দিকে ঝুঁকে ক্রমাগত গর্জন করছে। বেঁটে লোকটা তাকে আটকে রেখেছে কোনো রকমে। বললুম, 'থাক্'। আর যাব না। জন্তুটা কী দেখে আসুন তো রতনবাবু।'

রতনকুমার দৌড়ে গিয়ে দেখে এসে বলল, 'হায়েনা। সিঙ্গিসায়েব এবার হায়েনা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ পাবেন।'

'হায়েনাটা ওরা মেরে ফেললে কী করে সুযোগ পাবেন?'

রতনকুমার হাসল। 'মারবে না। তবে হায়েনাটার গায়ে দগদগে ঘা করে দেওয়া হবে। তাই এমন করে বল্লম দিয়ে খোঁচাচ্ছে দেখছেন না?'

'ওই বেঁটে ভদ্রলোক কে বলুন তো?'

'ওর নাম জগদীশ। এলাকায় সবাই জগাগুণ্ডা বলে। এখন সিঙ্গিসায়েবের ডান হাত।'

কথা বলতে বলতে আমরা ফিরে এলুম ফার্মহাউসে। রতনকুমার সাপ ঘরটার দিকে চলে গেল। ওকে ষঠ্গর্ভে পাহাড়ের সাপ আর অলোটার কথা জিগ্যেস করব ভাবছিলুম। ও এমন হঠাৎ করে চলে গেল যে সে সুযোগই পেলুম না। সাপঘরের দিকে প্রাণ গেলেও যাব না। সাপ দেখলেই আমার গা গুলোয়।

দুর্ভাগ্য হায়েনাটার জন্য মন খারাপ হয়ে গেল। হায়েনাকে নিরীহ প্রাণী বলা যায়, যদিও তার নামে শিশুচুরির বদনাম রটে। বনে জঙ্গলে বহুবার হায়েনার ডাক শুনেছি। মানুষ পৈশাচিক হাসির মতো কতকটা। কিন্তু এবার হায়েনার কান্না শুনতে পেলুম!......

শঙ্খচূড়ের আবির্ভাব

দুপুরের আগেই কর্নেল ও জয়রামবাবু ফিরে এলেন। প্রচুর আঠা এনেছেন। খাওয়া-দাওয়ার 'পর কর্নেল, জয়রামবাবু জগদীশ আর রতন সেই পাহাড়ের দিকে রওনা হল। আমিও সঙ্গ ধরলুম। প্রচণ্ড রোদ তখনও। তবে গাছপালার ভেতর দিয়ে যেতে তত কষ্ট হচ্ছিল না। দুটো টিনভর্তি তরল আঠা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল জগদীশ

আর রতন।

পাহাড়টা দূর থেকে যত ন্যাড়া ভেবেছিলুম, ততটা নয়। আর বেঁটে চ্যাপ্টা পাতাওয়ালা কিছু গাছও আছে। তবে পাহাড়ের গায়ে নানা আকারের সব পাথর। তার আড়ালে শঙ্খচূড় থাকা খুবই সম্ভব। জয়রামবাবু সবার আগে। বারবার সাবধান করে দিচ্ছিলেন। আমি পেছনে। সবসময় মাটিতে এপাশ-ওপাশে নজর রেখে উঠছি।

কিছুটা নিচে দাঁড়িয়ে কর্নেল বাইনোকুলারে চোখ রেখে অনেকক্ষণ গুহার মুখটা দেখলেন। তারপর বললেন, 'আমার সঙ্গে বরং এই ভদ্রলোক আসুন টিন নিয়ে।' রতনকে দেখালেন কর্নেল।

জয়রামবাবু কেমন হেসে বললেন, 'রতন কেন, জগদীশকে নিন আপনি। জগদীশ খুব সাহসী লোক। রতন ভীতু। আর আমিও বারবার শঙ্খচূড়টার তাড়া খেয়েছি, আমার বুক টিপটিপ করছে। ও জয়ন্তবাবু, আপনি বরং এখানেই থাকুন। কাজ নেই মশাই গুহার কাছে গিয়ে।

কর্নেল জগদীশকে সঙ্গে নিয়ে উঠে গেলেন গুহার দিকে। আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। জয়রামবাবু ডাকলেন, 'এস রতন, আমার বরং গুহার ওপাশটায় গিয়ে আঠাটা ছড়িয়ে আসি।'

একটা উঁচু পাথরে ঝটপট উঠে দাঁড়ালুম। রতন ও জয়রামবাবু বাঁ-পাশ দিয়ে উঠে বড় বড় পাথরের আড়ালে অদৃশ্য হলেন। কিন্তু কর্নেল ও জগদীশকে দেখতে পাচ্ছিলুম। জগদীশ আঠার টিনটি নামিয়ে রেখেই প্রায় দৌড়ে আমার কাছে চলে এল। কর্নেল আঠাটা ছড়াচ্ছেন না। বাঁ দিকে তাকিয়ে আছেন কেন বুঝতে পারলুম না। একটু পরে হঠাৎ জয়রামবাবুর বিকট চিৎকার শোনা গেল, 'সাপ! সাপ! তারপরই কর্নেলকে দেখলুম পকেট থেকে রিভলবার বের করে বাঁদিকে ছুটে গেলেন। পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আমি ঠকঠক করে কাঁপতে থাকলুম।

জগদীশ এক লাফে নিচে নামল। তারপর প্রায় গড়াতে গড়াতে পাহাড় বেয়ে নামতে থাকল।

এবার যা দেখলুম, চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। গুহার ভেতর থেকে একদঙ্গল পুলিশ বেরিয়ে এল। তারা বন্দুক পিস্তল উঁচিয়ে বাঁদিকে দৌড়ে গেল।

এতো দেখছি 'ছিল রুমাল, হয়ে গেল বেড়ালের' মতো ব্যাপার। ছিল শঙ্খচূড় সাপ, হয়ে গেল পুলিশ।

আর দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। ভয় পাওয়াও চলে না। হাঁপাতে হাঁপাতে গুহার কাছে উঠে গেলুম। ডাইনে ঘুরে দেখি তাজ্জব ব্যাপার। জয়রাম সিঙ্গির হাতে হাতকড়া পরিয়ে পুলিশের দল নেমে যাচ্ছে পাহাড় থেকে।

কর্নেল আমাকেই খুঁজছিলেন সম্ভবত। দেখতে পেয়ে ইশারায় ডাকলেন।

কাছে গিয়ে বললুম, 'এ কি ভেলকির খেলা কর্নেল!'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'আর একটু দেরি হলে রতন বেচারাকে বাঁচাতে পারতুম না! সিঙ্গি ওর গায়ে সাপের বিষের ইন্‌জেকসান দিতে যাচ্ছিল।'

কর্নেল নামতে থাকলেন পাহাড় থেকে। বললুম, 'কী সাংঘাতিক লোক!'

কর্নেল বললেন, 'সিঙ্গি টের পেয়েছিল রতন আমাকে চিঠি লিখে সব জানিয়েছে।

অতি-চালাক এবং শয়তান কি না। তাই শঙ্খচূড়ের ফাঁদ পেতেছিল। আমার উপস্থিতিতেই রতনকে খুন করতে এবং আমাকে বোকা বানাত। ওর সিরিঞ্জে জোড়া সূচ আছে। বিষাক্ত সাপের দাঁতের চিহ্ন এবং পোস্টমর্টেমে রক্তে সাপের বিষও পাওয়া যেত। আসলে নৃশংস ক্রূর জয়রাম সিঙ্গি এভাবে আমার ওপরও প্রতিশোধ নিতে মতলব করেছিল। তাই আমাকে একটা মিথ্যা শঙ্খচূড় সাপ ধরার অনুরোধ করে এসেছিল কলকাতা গিয়ে। হ্যাঁ, সাপের মাথার মণিটা আসলে একটা নীল ক্ষুদে বাল্ব্। কাল সকালে পাখি দেখতে বেরিয়ে ওটা আবিষ্কার করেছিলুম।'

ফার্মহাউসে ফিরে দেখি, পুলিশে ছয়লাপ। সাপঘরে তল্লাশি করে সেই ক্যাপসুলগুলো উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সুপার আর্যশংকর শর্মার জিপে আমরা সম্বলপুর রওনা হলুম। পথে হঠাৎ শেয়ালের ফাঁদটার কথা মনে পড়ল। জিগ্যেস করলুম, 'শেয়ালের ফাঁদে পড়ার পর আপনার অত হাসির কারণ কী কর্নেল?'

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, 'কেউ কেউ আমাকে আড়ালে বুড়োঘুঘু বলে ডাকে। শেয়ালের ফাঁদে পড়ার পর মনে হয়েছিল এবার কি তাহলে পুরনো খেতাব বাদ দিয়ে বুড়ো শিয়াল বলে ডাকবে? তবে শেয়াল খেতাব মন্দ না। শেয়াল অতিশয় ধূর্ত প্রাণী। এই ভেবেই হাসি এসে গিয়েছিল।' বলে কর্নেল কালকের মতো আবার হাসিতে ফেটে পড়লেন।

হাসি সংক্রামক। সুতরাং আমরা জিপসুদ্ধ লোক হো হো করে হাসছিলুম। অবশ্য ড্রাইভার বাদে।

গাড়ি চালাবার সময় তার হাসতে মানা। তাছাড়া তার চেহারাও ছিল বেজায় বদরাগী।...

আইওয়া নদীর ধারে

সেপ্টেম্বর মাসে আইওয়া শহরকে মনে হবে, না জানি কোন মস্ত সাধুবাবার আশ্রম বুঝি। কী সবুজ, কী শান্ত। শহরের মাধ্যিখানে বয়ে যাচ্ছে আইওয়া নদী। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। স্রোত বইছে কি বইছে না। মিষ্টি চেহারার রেড ইন্ডিয়ান বালিকা যেন শহরে বেড়াতে এসেছে। মাথায় জড়ানো সবুজ স্কার্ফ, গলায় রঙবেরঙের পাথরের মালা।

হুঁ, রেড ইন্ডিয়ান কথাটা এমনি-এমনি মাথায় আসেনি। 'আইওয়া' মানে ঘুমপাড়ানি গান। ছোট-ছোট টিলা আর ঢেউ-খেলানো বিশাল তৃণভূমিতে দুশো বছর আগে ওরাই এখানে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে বেড়িয়েছে। একশো মাইল দূরে ডেভেনপোর্ট, শহরের ধারে মিসিসিপি নদ থেকে আইওয়া অব্দি। আইওয়াকে দেখে চোখ বুজেই বুড়ো মিসিসিপির মেয়ে বলা যায়। নির্ভয়ে তার ছোট্ট বুকে খেলা করছে বুনো হাঁস আর আমাদের খুব চেনা মার্কিন রুইমাছের ঝাঁক।

একসময় এই শহরই ছিল আইওয়া রাজ্যের রাজধানী। পরে রাজধানী হল ডেময় শহরে। তখন আইওয়ার সব সরকারি বাড়িতে পত্তন হল বিশ্ববিদ্যালয়। এখন তো

আইওয়া রীতিমতো বিশ্ববিদ্যালয়-নগরী। দেশবিদেশের ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপক-অধ্যাপিকায় সরগরম। হঠাৎ-হঠাৎ আমাদের শান্তিনিকেতনের কথা মনে পড়ে যায়। প্রতিদিনই দেশবিদেশের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী আর পণ্ডিতজনেরা এসে জুটছেন। ভীষণ জমিয়ে দিচ্ছেন। আলাপ-আলোচনা করছেন। গোমড়া-মুখো সভা নয়, এখানে সভা মানেই হাসির হুল্লোড়। বক্তা ও শ্রোতা কে কাকে বেকায়দায় ফেলতে পারে,তার টাগ-অব-ওয়ার। তাই দারুণ জমে ওঠে!

তেত্রিশটি দেশের কবি-সাহিত্যিক শোরগোল তুলে ঢুকেছিলুম। এই বিশ্ববিদ্যালয়-নগরীতে। তখনও আইওয়া ছিল ঘন চিকন সবুজ। সে- সবুজের কী জেল্লা! ভিড়-ভাট্টা আদপে নেই। শুধু দুপুর বেলা ডাউন টাউন অর্থাৎ শহরের কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রীদের তখন ক্লাসের বিরতি। দল বেঁধে রেস্তরাঁ, কাফেটারিয়া বা স্টেক হাউসে খেতে যায়। তাই বলে হল্লাবাজি নয়। চোখ বুজলে খালি পায়ের শব্দ। চোখ খুললে রঙ বেরঙের মানুষ। আর ওই সবুজ গাছ। গাছ আর গাছ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আমণন্ত্রণপত্রে তামাশা করে বলা হয়েছিল, "আইওয়া ইজ ফুল অব ট্রিজ। বৃক্ষনগরী বলতে পারো। এসে দেখবে অকুতোভয়ে বিচরণরত কাঠবেড়াল, দুএকটি অমলধবল খরগোশ, অসংখ্য পাখি। দুক্কুরবেলা শুনবে ঝিঁঝির অর্কেস্ট্রা। কিন্তু সাবধান! সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি ফল অর্থাৎ পাতা ঝরার দিন শুরু। তারপরই দিনে-দিনে ঠাণ্ডাহিম আবহাওয়া। নভেম্বরে আর বাইরে তিষ্ঠোতে পারবে না। অতএব সঙ্গে প্রচুর গরম পোশাক আনতে ভুলো না।"

হয়তো এই গরমের দেশের লোকটাকে তাক লাগাতেই অক্টোবরে হঠাৎ একদিন বরফপড়া শুরু হয়েছিল। কস্মিনকালে এমন আজব কাণ্ড দেখিনি। ভোরবেলা থেকে ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছিল। বিকেলে জানালা দিয়ে দেখি, আরে এ কী! চারদিক সাদা। আকাশ ধূসর। আর সাদা মুরগির রোঁয়ার মতো হালকা ফুরফুরে বরফ পড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে। জমে উঠছে ঢালু লনের ঝাউঝোপ, রাস্তার ধারে খালের ওপর ঝুঁকে থাকা উইলো আর দীর্ঘ পপলার শ্রেণীর ওপর। তখনই জনহীন রাস্তার ল্যাম্পপোস্টে ভুতুড়ে আলো জ্বলে উঠেছে। মার্কিন দেশটা, সত্যি বলতে কী, রাস্তা আর মোটর গাড়ির দেশ। সেদিন রাস্তায় তত বেশি গাড়িও দেখলুম না। শহরতলিতে বিশাল আটতলা যে বাড়িতে ছিলুম, তার নাম মে-ফ্লাওয়ার। নীচে রাস্তা। তার ওপারে পার্ক। পার্কের গা ঘেঁষে বইছে আইওয়া নদী। সব বরফে ঢেকে যাচ্ছে।

কিন্তু 'ফল' কী জিনিস, তার আগে দেখা হয়ে গেছে। প্রকৃতি যে এমন রঙের খেলা খেলে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। 'ফল' শুরু হয়েছিল সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি। রোদে ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু কী কনকনে ঠাণ্ডা! রাগ হত, যখন আমাদের প্রোগ্রাম অফিসার এডুইন একমুখ খুশি নিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে বলত, এ বিউটিফুল ওয়ার্ম ডে! ওয়ার্ম? বলে কী। ওই সময় চোখে পড়েছিল, পার্কের মেপল গাছটার পাতা উজ্জ্বল লাল হলুদ হয়ে গেছে কবে। পপলার আর এলম সারা গায়ে হলুদ মেখেছে। আইওয়া নদীর ওপারে এক বনভূমি। তার মাথা লালে লাল। তারপর লাল আলোয়ান ছড়ানো হয়ে গেল দেখতে দেখতে। তারপর একদিন গেছি ঈগল মার্ট নামক খাদ্যভাণ্ডারে। বব গাড়ি আনবে, প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখি,

লাল হলুদ ঝরাপতার পোশাক পরে গাছ-গাছালির তলায় কারা যেন উদ্দাম ঘূর্ণিনাচ জুড়ে দিল। নাচতে-নাচতে একেবারে রাস্তায়। রাস্তা জুড়ে চলছে রঙিন পোশাক পরা অদৃশ্য শয়ে-শয়ে নাচিয়ে। হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে মেরি বলল, 'দেখছ তো? এই হচ্ছে ফলের এক খেলা।'

সেই ফলের মরসুমে ছুটিছাটার দিন আইওয়ার নদীতে ছিপ ফেলে একটা আস্ত মার্কিন রুই ধরে ফেললুম এবং তাকে লাগিয়ে দিলুম সব্বাইকে। মাছ ধরার অনুমতি নিতে হয়। কিছু পয়সাকড়ি লাগে। কিন্তু আবার বরাত। কুকুরকে বেজায় ভয় পাই। একটা প্রকাণ্ড কেলে টেরিয়ার কোথ্থেকে এসে পেছনে গর্‌র্ করতেই উলটে পড়লুম একেবারে নদীর জলে। ঠাণ্ডা হিম জল। ওপরে কুকুরটা তখন ফিকফিক করে নিশ্চয় হাসছিল। দূর থেকে ব্যাপারটা দেখেছিলেন আফ্রিকান স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক পিটার। উনি তখন জগিং করছিলেন। অর্থাৎ দৌড়নোর ব্যায়াম করছিলেন। কুকুরটাকে ধমক দিয়ে হটিয়ে আমাকে ওঠালেন। বনের ভেতর থেকে প্রকাণ্ড মোরগের মতো এক ভদ্রলোক বেরিয়ে কাচু-মাচু মুখে বললেন, "জিম তত দুষ্টু নয়। নেহাত বিদেশি দেখে ওর একটু কৌতূহল হয়েছিল হয়েতো। ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ওর হয়ে।"

কুকুরের পাল্লায় আরেকদিন পড়েছিলুম। মিশরের কবি আবু সেন্নার সঙ্গে ঘুরতে বেরিয়েছিলুম। মাইলটাক দূরে কয়েকটা টিলা জুড়ে ঘন বন। বনের ভেতর একফালি রাস্তা, এবড়োখেবড়ো ধূসর পাথুরে মাটির। দু'জনে মহানন্দে যে-যার মাতৃভাষায় গান গাইতে গাইতে চলেছি। হঠাৎ কোথ্তেকে একটা বাদামি আর একটা সাদা কুকুর এসে আমাদের চারপাশে ঘুরতে ঘুরতে গজরানি শুরু করল। ভয়ে আমরা কাঠ। বুকে দুই ঠ্যাং তুলে দিতেই আবু সেন্না আরবি ভাষায় বিড়বিড় করে কী আওড়াতে থাকল। বুঝলুম, ধর্মগ্রন্থের আপৎকালীন মন্তরটা আওড়াচ্ছে। সেদিনও ভাগ্যিস এক জগিংকারী দৈবাৎ এসে পড়ে উদ্ধার করল। আশ্চর্য, কুকুর দুটো তার কথা মেনে বনে গিয়ে ঢুকল। তাকিয়ে দেখি বনের ভেতর বাড়ি। ওরা তার প্রহরী। কিন্তু তাই বলে আমরা কি চোর না চোরের মাসতুতো ভাই? আবু সেন্নার রাগ আর পড়তে চায় না। ফেরার পথে সে বারবার বলে, এ দস্তুরমতো অপমান। আইওয়ার প্রায় সব বাড়িতেই দরজায় কেউ তালা দেয় না জানো? চোর নেবেটা কী? টাকাকড়ি থাকে ব্যাংকে। বাড়িতে খালি আসবাবপত্তর, কিছু বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, জামাকাপড়, আর খাবার-দাবার। এসব জিনিস নেবে না চোর। তাছাড়া মার্কিন দেশে আজকাল ছোট শহর এবং কান্ট্রি এলাকা অর্থাৎ গাঁ-গেরাম একেবারে নিরুপদ্রবে বাসযোগ্য জায়গা। গাঁ-গেরাম বলতে কয়েকটা চাষি-বাড়ি।

এরকম একটা চাষি-বাড়িতে এক রাত্তির কাটিয়েছিলুম। আইওয়া থেকে পঁচিশ মাইল দূরে খাঁ-খাঁ মাঠের মধ্যে বাড়িটা। এদিকে-ওদিকে শুকনো ভুট্টাক্ষেত ধূসর বনের মতো। হাইওয়ে থেকে একটু দূরে। এমনিতেই নেহাত ডাউন-টাউন ছাড়া লোকজন চোখে পড়ে না কোথাও। ওখানে তো নিঝুমপুরী। চাষির নাম জনসন। বয়স বাহাত্তর। কিন্তু জগিং করেন দুবেলা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মালয়ে যুদ্ধ করে এসেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি আছে। তাঁর গিন্নিও সুশিক্ষিতা। দুই ছেলে, এক

মেয়ে। মেয়ে আইওয়ায় থাকে। কলেজের ছাত্রী। ছেলে দুটোর দশ এবং বারো বছর বয়স। হ্যাঁ, কুকুর আছে গোটা তিনেক। কিন্তু আমার দিকে তারা ঘুরেও তাকাল না। ক্রমে ক্রমে ভয় ভেঙে যেই একটার মাথায় হাত রেখেছি আমার মুখ চেটে নিল। ছ্যা, ছ্যা। বাথরুমে ঢুকলাম। ঢুকে তাক লেগে গেল। অন্য পাশে ল্যাট্রিনের মেঝে রঙিন পুরু কার্পেটে ঢাকা। দেয়াল জুড়ে ছবি। মাঠের বাড়ি শহরের তাবৎ আধুনিক সরঞ্জাম ভরা। সন্ধেবেলা বসার ঘরে পর্দা টাঙিয়ে সিনেমা দেখা পর্যন্ত হয়ে গেল। রাতে খেতের টাটকা শাকসবজি আর মাংস দুধ খেতে খেতে ভারতের গল্প শোনালুম। বাইরে তাপাঙ্ক চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কিন্তু ঘরে আরামদায়ক গরম। মধ্যরাতে পর্দা সরিয়ে কাচের জানলা দিয়ে দেখি, জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে সারা মাঠ। বুড়ো ওকগাছটা যেন হাতছানি দিয়ে বলছে, "আয়, রেড ইন্ডিয়ান সর্দার ওয়াকিমোর গপ্পো শোনাব। সে আমার ছায়ায় বসে দুঃখ করে বলেছিল, "সাক্ষী থেকো বন্ধু। সাগরপারের বিদেশীরা এসে আমাদের সাতপুরুষের সুখের দুনিয়াটা কেড়ে নিল।" কিন্তু বুড়ো ওকের গপ্পো শুনতে গেলেই যে ঠাণ্ডায় জমে যাব।

পরে মে-ফ্লাওয়ারে আমার ঘরে টিভিতে সেন্টিনিয়েল নামে একটা ধারাবাহিক ম্যুভি দেখেছিলাম। আমেরিকায় প্রথম ইউরোপীয়দের আবির্ভাব এবং রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে সংঘর্ষের কাহিনী। খুব জনপ্রিয় হয়েছিল ছবিটা। যে-বইয়ের কাহিনী থেকে এ-ছবি, সে-বইটার লক্ষ লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে। বড় রোমাঞ্চকর কাহিনী। তিন পুরুষের নানা ঘটনায় জমজমাট।

তবে মজার কথা, আমাদের দেশের মতো সিনেমা-হলে কিন্তু ভিড়ই থাকে না। আইওয়ার অনেকগুলো থিয়েটার অর্থাৎ ছবি দেখানোর ঘর আছে। ঢুকে দেখেছি খাঁ-খাঁ অবস্থা। কখনও বড়জোর জনাবিশেক দর্শক। লোকে ভিড় জমায় নৃত্যনাট্য, অপেরা আর গানের জলসায়। নদীর ধারে বিশাল অডিটোরিয়ামে কত বিচিত্র ব্যালে দেখেছি। কিন্তু সিনেমায় উৎসাহ কারুর নেই তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বিজু' ভবনে রোজ পরীক্ষামূলক ম্যুভি দেখানো হয়। প্রচণ্ড ভিড় করে সবাই দেখে। ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়টাই বেশি। আইওয়া তো আসলে ওদেরই শহর। তাই বিনিপয়সায় পনেরো মিনিট অন্তর বাস চলে। নাম ক্যামবাস। পয়সা লাগে যে বাসে তাতে কিন্তু যাত্রী খুব কম। ৩৫ সেন্ট ভাড়া। শনিবার ২৫ সেন্ট। রবিবার কিন্তু সব বাস বন্ধ। কোনদিনেই ভাব হয়ে যাবে ড্রাইভারের সঙ্গে। মেয়ে ড্রাইভারও আছে। এমন কী বিশাল-বিশাল ট্রাকও চালায় মেয়েরা। আমাদের মে-ফ্লাওয়ারের তদারকি অফিসের সবাই মেয়ে। শহরের রেস্তরাঁগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীরাও ঠিকে কাজ করে। বাসনধোয়া কাজও। কখনও কোন বাড়িতে দু ঘণ্টা লনের ঘাস ছাঁটাই করে ঘণ্টায় চার ডলার রোজগার মন্দ কী। কাজ করাটাই মর্যাদার ব্যাপার। কেউ চুপচাপ বসে থাকতে রাজি নয়। করার-মত কাজ না থাকলে বরং কিছুক্ষণ জগিং করে এসো মাইলটাক। সব সময় চঞ্চল থাকো। প্রাণবন্ত হও এবং হাসো। চার মাসে একটাও গোমড়ামুখো মানুষ দেখিনি। মামুলি ভদ্রতা বলবে? কিন্তু তাই বা মন্দ কী? বিশেষ করে দোকানে গিয়ে সেলসবয় বা সেলসগার্ল কিংবা আপিসে গিয়ে কোনো কর্মীকে যখন একমুখ হাসি নিয়ে বলতে শুনেছি, ক্যান আই হেলপ ইউ স্যার, এবং চলে আসার সময়

হ্যাভ এ নাইস ডে, তখন মনে খুশির হাওয়া বয়ে যায়।

আইওয়াতে বিদেশীরা কতটা আপন হয়ে ওঠে ওদের, টের পেয়েছিলুম 'অক্টোবরে হ্যালউইন পরবের রাতে'। এ এক মজার পরব। যে-যার খুশিমতো ছদ্মবেশ পরে বা রঙচঙ মাখে। এড়ুইক আর মারিয়া তো ড্রাকুলা আর মড়া আর মড়া সেজে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। রাতে বাড়ি-বাড়ি হ্যালউইন পার্টির নেমতন্ন। ওই বেশ নাচগান। আমরাও বিকট সেজেছিলুম রঙ মেখে এবং মুখোশ পরে। রাতভর ঠাণ্ডার মধ্যে বাড়ি-বাড়ি হানা দিয়েছিলুম।

তার চেয়েও বড় কথা এখানকার মানুষরা বেজায় আলাপী। গায়ে পড়ে আলাপে ওদের জুড়ি নেই। আর কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীর প্রতি ওদের আগ্রহও প্রচণ্ড। আইওয়ার রাম-শ্যাম-যদু-মধুও দেখা হলে আমাকে মিষ্টি হেসে বলেছে, কিছু লিখছ কি এখন? আইওয়া নিয়ে লেখো না বাপু। জানতুম আইওয়া ওদের বড় প্রিয় শহর।

কিন্তু ডিসেম্বরে আইওয়া যখন বরফে সাদা হতে থাকল, তাপাঙ্ক নামল শূন্য ডিগ্রীর নীচে তেরোতে এবং চারদিকে গাছপালা কঙ্কাল হয়ে গেল, তখন বেজায় রেগে ঠিক করে ফেললুম, হ্যাত্তেরি। এ ভূতের দেশে কি মানুষ থাকে? আসার দিন প্লেন থেকে মনে হচ্ছিল, উত্তরমেরু পেরুচ্ছি।

শর্মার বকলমে

সত্যি বলতে কী বংশীধর অধিকারীর জ্বালায় আমাকে মীর্জাপুরের অত ভাল মেসটা ছাড়তে হয়েছিল। যেই কাগজ কলম নিয়ে একটা গল্প লিখব বলে বসেছি, ভদ্রলোক এসে একগাল হেসে বলতেন, কী লিখলেন একটু পড়ুন না শুনি।

এখনও লেখা হয় নি বললেও রেহাই ছিল না। খুব আগ্রহ দেখিয়ে বলতেন, কী লিখবেন ভাবছেন, তাই বলুন না শুনি।

দিনের পর দিন এরকম জ্বালাতন। মনে মনে যাচ্ছে-তাই বিরক্ত হলেও চেপে থাকতুম ভদ্রতার খাতিরে। বংশীধরবাবু কিন্তু অতি অমায়িক মানুষ। মাথায় টাক ছিল। গোল গোল মুখ। হাসিটি ছিল ভারি মিঠে। নাদুস-নুদুস বেঁটে শরীর নিয়ে ধুপ ধুপ শব্দ করে মেসবাড়ির এঘর থেকে ওঘরে ঘুরে বেড়াতেন। সবার সুখ-দুঃখের খোঁজখবর নিতেন। গায়ে পড়ে উপকার করতে চাইতেন। কিন্তু আমার সহ্য হচ্ছিল না ওঁকে। তিনমাস লেগে যেত একটা ছোটগল্প লিখতে। আর আশ্চর্য ব্যাপার কী ভাবে যেন টের পেয়ে যেতেন, আমি লিখতে বসেছি। অমনি চলে আসতেন আমার কাছে। পাশে বসে মুণ্ডু বাড়িয়ে বলতেন, 'কৈ একটু পড়ুন না শুনি!'........

বর্ষানাগাদ নকুড় মল্লিক লেনে তিনতলা বাড়ির ছাদে একটা চিলেকোঠা গোছের ঘর খুঁজে বের করলুম। বাড়ির মালিক এক কথাতেই ভাড়া দিতে রাজি হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, বললেন, 'ভাড়া যা দেবার দেবেন খুশিমতো। ও নিয়ে দরাদরি করব না। আপনি মশাই লেখক মানুষ! আমি আপনার লেখার ভক্ত।'

কলকাতা শহরে কোনো বাড়িওলা এমন কথা বললে কোন লেখকের না মন

আনন্দে থই থই নেচে ওঠে! তবু ভাড়ার ব্যাপারটা ঠিক করাই ভাল। অনেক বলেকয়ে পঞ্চাশ টাকা দিতে চাইলুম। বাড়িওলা ভদ্রলোক তাও নেবেন না। বলেন, 'বরং তিরিশ দেবেন। ওরে বাবা! আপনি একজন লেখক বলে কথা!'

মেস থেকে পাত্তাড়ি গুটিয়ে যখন ও বাড়িতে চলে যাচ্ছি, বংশীধর খুব বাধা দিয়েছিলেন। প্রায় কেঁদে ফেলার অবস্থা। একটু কষ্ট হয়েছিল বৈকি, এতকাল একসঙ্গে বাস করেছি।

নকুড় মল্লিক লেনের বাড়িতে গিয়ে মহানন্দে গল্প লেখা শুরু করলুম। কেউ বাধা দেবার নেই। নিরিবিলি তিনতলার ওপর ছোট ঘর। এত বড় ফাঁকা ছাদ। প্রাণভরে আকাশ দেখা যায়। আর আমায় পায় কে? আকাশ না দেখতে পেলে কি মাথায় কিছু বড় বড় ভাব আসে?

প্রথম রাতেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় কাগজ-কলম নিয়ে বসলুম। বসামাত্র প্লট এসে গেল! প্লটটা এই ঃ

এক শিকারী বনের মধ্যে পথ হারিয়ে অবশেষে একটা পুরনো ভাঙাচোরা দুর্গে পৌঁছেছেন। খুঁজে খুঁজে একটা অক্ষত ঘরে ঢুকে রাত কাটানোর কথা ভাবছেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন একটা অদ্ভুত চেহারার লোক তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে—দরজা দিয়ে নয়, দেয়াল থেকে। তার মানে দেয়ালে টাঙানো একটা ছেঁড়া ছবি থেকে। শিকারীর বন্দুকে আর গুলি নেই। ছবির লোকটা তাঁর গলা টিপতে আসছে।

শিকারীকে না বাঁচালে গল্প হবে না। কীভাবে বাঁচাব তখনও ভাবিনি। লেখাটা তো শুরু করা যাক্।

সবে দু'লাইন লিখেছি, আমার কাঁধের ওপর কার নিঃশ্বাস পড়ল। চমকে উঠে দেখি কী আশ্চর্য—কী অসম্ভব ব্যাপার, মীর্জাপুরের মেসের সেই বংশীধর অধিকারী পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন। একগাল হেসে ঠিক তেমনি চাপাগলায় বলে উঠলেন, 'কী লিখলেন, পড়ুন না শুনি!'

আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। ঘরের দরজা কি বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলুম? নিশ্চয় মীর্জাপুর থেকে ভদ্রলোক এই বৃষ্টির মধ্যে নকুড় মল্লিক লেনে হাজির হয়েছেন।

কিন্তু আমার ও ঠিকানা তো ওখানে কাউকে জানিয়ে আসিনি। উনি টের পেলেন কেমন করে?

মনের কথা চেপে ভদ্রতা করে বললুম, 'আরে আসুন আসুন বংশীধরবাবু। বসুন।'

বংশীধরবাবু বললেন, 'কৈ একটু পড়ুন না শুনি।'

'পড়ছি, পড়ছি, সবে তো দু'লাইন লিখেছি। কিন্তু আশ্চর্য, আপনি এ বৃষ্টির মধ্যে...' বলতে বলতে থেমে গেলুম। বংশীধরবাবু হঠাৎ আঁতকে উঠে পিছিয়ে গিয়ে বললেন, 'ওরে বাবা! এ ব্যাটা আবার কে?' বলেই আবছায়া হয়ে গেলেন। তারপর বেমালুম অদৃশ্য।

তারপর দেখি ঢ্যাঙা রোগা এক গুঁফো ভদ্রলোক ঘরের কোনা থেকে এগিয়ে আসছেন। এঁকে দেখেই বুঝি বংশীধরবাবু ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলেন?

গুঁফো ভদ্রলোক চোখ কটমট করে বললেন, 'কে হে ছোকরা? কী লিখছো পড়ে

শোনাও তো।'

খুব রাগ হল এবার। নিশ্চয় দরজা বন্ধ করতে ভুলেছি। দরজার দিকটা ছায়ার মধ্যে বলে বোঝা যাচ্ছে না। বললুম, 'আপনি কে মশাই বলা কওয়া নেই ঘরের মধ্যে হুট করে ঢুকে পড়লেন যে?'

গুঁফো ভদ্রলোক হি হি করে হাসলেন। 'ইস! বিষ নেই কুলোপানা চক্কর। ভারি দু'লাইন ছাইপাঁশ লিখেই ধরাকে সরা জ্ঞান করা হচ্ছে! জানো আমি কে? আমি বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক হলধর শর্মা।'

শুনেই বড় লজ্জায় পড়ে গেলুম। হেঁট হয়ে পা ছোঁবার চেষ্টা করে বললুম, 'ক্ষমা করবেন! আপনার কত বই আমি ছেলেবেলায় পড়েছি। তা আপনি বুঝি এ বাড়িতেই থাকেন?'

'এ বাড়িতে কি বলছ হে? এই ঘরেই থাকি। তার আগে পড়ো কী লিখলে শুনি।'

হলধর শর্মা দুপা এগিয়ে এলেন। অগত্যা পড়তেই হল। লাইনদুটো শোনার পর শর্মা মশাই বললেন—'হুঁ শুরুটা ভালই। তবে শিকারীকে একটা ঘোড়া দাও। বন্দুকের বদলে দাও তীর-ধনুক জমবে ভালো।'

'গল্পটা যে একালের শর্মামশাই!'

'গল্পটা আবার কাল? যা বললুম লেখ। এই আমি বসলুম। পুরো লিখে ফেলো। শুনে তবে যাব।'

বেগতিক দেখে বললুম, 'বাইরের লোকের সামনে আমার লেখা আসে না শর্মামশাই।'

শর্মা চটে বললেন, 'বাইরের লোক মানে? আমি তো এ ঘরেই থাকি বললুম না?'

'এঘরে আপনি থাকেন মানে?' অবাক হয়ে বললুম। 'এঘর তো খালি পড়ে ছিল। আমি বাড়িওলার কাছে ভাড়া নিয়ে আজ বিকেলে এঘরে এসেছি!'

'ট্রেসপাস করেছ বাপু! পরের ঘরে এসে থাকা কি ভাল? একসময় এই ঘরেই আমি থাকতুম। তবে নেহাত এসেই গেছ যখন আপত্তি করব না। বিশেষ করে তুমি নতুন লেখক। তোমায় উপদেশ দেওয়া এবং সাহায্য করাই আমার কর্তব্য। কৈ লিখতে শুরু করো। আটকালে বলবে। আমি বলে দেব।'

কাঁচুমাচু মুখে বললুম, 'সেটা কি ঠিক হবে?'

হলধর শর্মা খাপ্পা হয়ে বললেন, 'আলবাৎ ঠিক হবে। নাও-আমি ডিকটেশান দিচ্ছি, লিখে যাও।'

প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিকের কথা অমান্য করি কোন মুখে? অগত্যা ডিকটেশান নিতে শুরু করলুম। গোড়ায় যে দুইলাইন লিখেছিলুম, তা কেটে দিতেও হল ওঁর নির্দেশে। তারপর লিখতে লিখতে টের পেলুম, সত্যি—এই হল পাকা হাতের রচনা। কী জমাট এই গল্পটা! ছাপা হলে হইচই পড়ে যাবে এবার।

লেখা শেষ হবার পর হলধর শর্মা বললেন, 'আর তোমায় কষ্ট দেব না। এবার আমার প্রাতঃভ্রমণের সময় হল! তুমি বিশ্রাম করো। আবার কাল রাতে যথাসময়ে দেখা হবে।'

কাগজগুলো গোছাচ্ছিলুম। গোছানো শেষ করে ঘুরে দেখি শর্মামশাই নেই। বুঝলুম, তাহলে এই বাড়িতেই কোনো ফ্লাটে থাকেন! আমার সঙ্গে রসিকতা করছিলেন। কিংবা হয়তো লেখার জন্য ঘরটাও ভাড়া নিয়েছিলেন।

কিন্তু তারপর বুকটা ধড়াস করে উঠল, যখন দরজার কাছে গেলুম তখন। এ কী! দরজা তো ভেতর থেকে বন্ধ রয়েছে। হ্যাঁ—আমিই বন্ধ করেছিলুম, মনে পড়েছে। তাহলে?

ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বিছানায় শুড়ে পড়লাম। তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে।

ঘুম হবার কথা নয়। একটু বেলা হলে বেরিয়ে দেখি ছাদের কোনায় দোতলায় মধুবাবু ডন টানছেন। কাল বিকেলেই আলাপ হয়েছে! ডন শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নমস্কার স্যার! আশাকরি সুনিদ্রা হয়েছে?'

বললাম, 'মোটেও না মধুবাবু! সারারাত.....'

মধুবাবু চাপা হেসে বললেন, 'শর্মামশাই জ্বালিয়েছেন বুঝি? আপনাকে খুলেই বলি স্যার, এঘরে কেউ একরাত্তিরের বেশি বাস করেন না। তাই অ্যাদ্দিন খালি পড়েছিল। আপনাকে কালই আভাস দেব ভেবেছিলুম, রাগ করবেন বলে সাহস পাইনি।'

'ব্যাপারটা কী বলুন তো?'

মধুবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'সে কী স্যার? নিজে লেখক হয়েও জানেন না? শিশুসাহিত্যিক হলধর শর্মা কবে গত হয়েছেন। সেকি আজকের কথা? বছর সাতেক তো হবেই। তখন আমি স্কুলের ছাত্র।'

কী করে জানব? আমি গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছি মাস কয়েক আগে। সাহিত্যিকদের কে জীবিত, কে মৃত, তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। গল্প লিখি আর কাগজে পাঠাই। কোনো কোনো লেখা ছাপাও হয়।

চুপ করে আছি দেখে মধুবাবু বললেন, 'জ্বালাতন বলতে ওই এক-ডিকটেশান নিতে হবে। তা নিজেও যখন লেখেন, তখন আর অসুবিধেটা কী! দেখবেন সয়ে যাবে ক্রমশ।'

শর্মারহস্য তাহলে ফাঁস হল। কিন্তু বংশীধর অধিকারী? তার আবির্ভাব দরজা আঁটা ঘরে! মেসে খোঁজ নিয়ে জানলাম যেদিন আমি মেস ছেড়ে আসি, সেদিনই সন্ধ্যায় হার্টফেল করে মারা গেছেন। বয়স হয়েছিল ষাট। তবে সুখের কথা হল শর্মার ভয়ে বংশীধর আর আমায় জ্বালাতে যাননি। এদিকে শর্মা রোজ রাতে ডিকটেশান দিতে দিতে বলেন, 'শিগগির এবার তুমি ভাল গল্প লিখতে পারবে' এটাই শেষ পর্যন্ত আমার পক্ষে আশার কথা।

শ্যামখুড়োর কুটীর

সেই যারা বাংলা মুলুকের পাড়াগাঁয়ে রাতবিরেতের অন্ধকারে নিরিবিলি জায়গায় আলো জ্বেলে কীসব খুঁজে বেড়ায়, এই মার্কিন মুলুকে এসেও তাদের দেখা পেয়ে যাব ভাবতেও পারিনি।

তফাতটা শুধু দেখলুম ভাষার। সেই একই রকম তিনটে আলো নিয়ে তিনটে ছায়ামূর্তি জলার ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নাকি স্বরে একজন বলল, "এখানেই তো থাকার কথা। গেল কোথায়?"

অন্যজন বলল, "ভাল করে খুঁজে দ্যাখ না।"

তৃতীয়জন বলল, "কেউ মেরে দেয়নি তো?"

ভাষাটা ইংরেজি, এমনিতে বেশির ভাগ মার্কিন একটু নাকি স্বরে কথা বলে। এরা তো ভূত। গলার স্বর বেজায় রকমের খোনা।

আমার সঙ্গী সব তেজী ছোকরা। ভূত বিশ্বাস করে না। সকালবিকেলে রোজ দেড় মাইল করে জগিং অর্থাৎ দৌড়ব্যায়াম করে। গাড়ি চালায় দুর্ধর্ষ বেগে। বলল, "একটু অপেক্ষা করো। ওদের ডেকে আনি। মনে হচ্ছে, গাড়িটা ঠেলতে হবে। উনষাট বছর বয়সের এই বড়ো গাড়ির পক্ষে এমনটা হবেই।"

উঁচু হাইওয়ের ডান ঘেঁষে আমাদের গাড়িটা দাঁড় করানো। ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত। কনকনে হাওয়া বইছে। ঠাণ্ডায় হিম হয়ে গেছি গাড়ি থেকে নেমেই। দূরে— বহু দূরে আলোর ফুটকি দেখা যাচ্ছে। হাইওয়েতে কয়েক ফার্লং অন্তর 'ল্যাম্পপোস্ট' যদিও রয়েছে, আমরা থেমেছি দুই ল্যাম্পপোস্টের মাঝামাঝি জায়গায়।

ইচ্ছে করে কি কেউ থামে? একেই বলে, যেখানে ভূতের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়। বব হাইওয়ের ধারে ঢালু জমির দিকে পা বাড়াচ্ছে দেখে পিছু ডেকে বললুম, "বব! বব! কথা শোন!"

নীচের দিকে আবছাভাবে একটা জলা দেখা যাচ্ছে। নক্ষত্রের প্রতিবিম্ব পড়েছে। ঝিকমিক করে কাঁপছে। সেখানে তিনটে আলো ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে। সেদিকে দেখিয়ে বব বলল, "ওদের ডেকে আনি। তুমি কি একা ঠেলতে পারবে ভাবছ? তুমি ত বাতাসেই উড়ে যাচ্ছ দেখছি।"

বব হাসলেন। বললুম, "বব! ওরা কারা ভাবছ তুমি?"

বব সেদিক তাকিয়ে নিয়ে বলল, "এখানে একটা গোরুর খোঁয়াড় আছে দেখেছি। ওরা খোঁয়াড়েরই লোক হবে। না হলে খামাড়বাড়ির চাষাভূষো।"

দু-পা এগিয়ে চাপা গলায় বললুম, "ওরা কী বলাবলি করছিল আমার কানে এসেছে বব।"

এবার বব একটু চমকাল বুঝি। সেও গলা চেপে বলল, "আমাদের ওপর ওরা হামলা করবে বলছিল নাকি? দ্যাখো, হাইওয়েতে এমন হামলা প্রায়ই হয়। তবে আমাদের কাছে দামি কিছু তো নেই। তাছাড়া আমার কাছে একটা অটোমেটিক রিভলবার আছে। ভেবো না।"

বললুম, "না না। আমার ধারণা, ওরা হয়ত মানুষ নয় বব!"

বব অবাক হয়ে বলল, "মানুষ নয় মানে? তবে ওরা কী।"

"দ্যাখো বব, তাহলে তোমায় অনেক গল্প বলতে হয়।" ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে এবং ভূতঘটিত অস্বস্তিতে ব্যস্তভাবে বললুম। "বরং হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে থেকেই আমরা কোনো গাড়ি থামিয়ে সাহায্য চাইব।"

বব রাস্তার দুদিকে ঘুরে দেখে নিয়ে বলল, "আশ্চর্য তো! এখন কোনো দিক থেকেই গাড়ি আসছে না। এ তো ভারী অস্বাভাবিক ব্যাপার। এটা এক আন্তঃরাজ্য হাইওয়ে। চব্বিশ ঘণ্টা গাড়ির বিরাম থাকে না। হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল কেন?"

"সেজন্যেই তো বলছি, গতিক ভাল নয়। এসো, আপাতত গাড়ির ভেতর ঢুকে সিগারেট টানি। ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছে না।"

বলে আমি গাড়িতে ঢুকে বসলুম। বব কিন্তু এল না। বলল, "এদিকে লোকগুলোও চলে যাচ্ছে যে! হ্যাত্তেরি, তোমার কথার নিকুচি করেছে। বোসো, এক্ষুণি এসেছি।"

সে দৌড়ে ঢাল বেয়ে নেমে গেল। নীচে জলার ধারের আলো তিনটে ওদিকে উঁচুতে উঠে এগিয়ে যাচ্ছে কালো টিলার মতো উঁচু জায়গার দিকে। একটু পরে কিন্তু তিনটে আলোই মিলিয়ে গেল। তখন বব ফিরে এসে বলল, "ব্যাটাচ্ছেলেদের অত করে ডাকলুম। শুনতেই পেল না। দ্যাখো দিকি, কী মুশকিলে পড়া গেল! ওহে, একবার বেরিয়ে একটু ঠেলে দাও না, দেখি কী হয়। এসো এসো।"

অগত্যা বেরোতে হল। বব একপাশে দাঁড়িয়ে ঠেলতে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করল। অন্যদিকে আমি কাঁধ লাগালুম। কিন্তু গাড়ি কান্নার মতো শব্দ করতে থাকল শুধু। স্টার্ট নিল না। এই সেকেলে ১৯২১ সালের মডেল ভিনটেজ গাড়িটা তবু মায়াবশে বব ছাড়তে নারাজ।

হতাশ হয়ে বব অন্ধকারে সেই কালো টিলাটার দিকে তাকিয়ে রইল। সেই সময় দেখলুম, এবার তিনটে নয়, একটা আলো নেমে আসছে জলার দিকে। আলোটা জলা অব্দি এসে একবার থামল। তারপর আমাদের দিকে উঠতে থাকল। অস্বস্তি হচ্ছিল আমার। কিন্তু বব নেচে উঠল প্রায়। সে জোর গলায় ডেকে বলল, "ওহে লোকটা, আরও একটু পা চালিয়ে এসো দিকি! বড্ড বিপদে পড়েছি আমরা।"

আলোটা ঢালু জায়গায় থেমে গেল। তারপর খনখনে গলায় জিজ্ঞেস করল, "কে তোমরা? হয়েছেটা কী?"

বব বলল, 'গাড়িটা স্টার্ট নিচ্ছে না; একটু ঠেলে দিলে বোধ হয় নেবে।"

"আমার এত সময় নেই। কর্তার কুকুরের লেজ হারিয়ে গেছে। খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"কী হারিয়েছে বললে?"

"লেজ।" বলে আলোওয়ালা ছায়ামূর্তিটা গাড়ির সামনে দিয়ে রাস্তা পেরুতে থাকল।

বব হাসতে হাসতে বলল, "তুমি তো ভারি রসিক লোক দেখছি!"

আলোওয়ালা বলল, "রসিকতা কী বলছ? প্রাণ নিয়ে টানাটানি। কর্তার যে মেজাজ। জিমের লেজ খুঁজে না আনলে চাকরি চলে যাবে।"

আলোওয়ালা রাস্তার ওধারে গিয়ে মাঠে নামল। বব বলল, "উঁহু উঁহু। এভাবে

রাত কাটানোর মানে হয় না। তুমি অপেক্ষা করো. আমি ওর কর্তার কাছে গিয়ে সাহায্য চাই।"

আমি তো ভুক্তভোগী যাকে বলে। বাংলার পাড়াগাঁয়ে একবার ঠিক এমন আলোওয়ালাদের পাল্লায় পড়ে যা ভুগেছিলাম কহতব্য নয়। এটা তো বিদেশ বিভুঁই! একা এখানে থাকি, আর সে আলোওয়ালাটা সদ্য ওধারে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাকে বাগে পেয়ে ঘাড় মটকাক আর কি! তাই বললুম, "চলো বব। তোমার সঙ্গে আমিও যাই!"

বব খুশি হয়ে বলল, "এসো।"

মনে একটা ভরসা হচ্ছে, দুজনে একসঙ্গে থাকলে ওরা সুবিধা করতে পারবে না। তাছাড়া ববের গায়ে অসুরের জোর আছে। পকেটে রিভলভারও আছে, রিভলভারের গুলিতে ওদের ক্ষতি কিছু না হোক, আমরা অন্তত মনে সাহস পাব। রাতবিরেতে ভয় পেলে আওয়াজ একটা মোক্ষম দাওয়াই কিনা। সেজন্যই নিয়ম আছে ভয় পেলে গান গাইতে হয় কিংবা আপন মনে মনে কথা বলতে হয়। সাহস ছাড়া ভূতপ্রেতকে হারানোর আর কোন উপায় নেই। ভয় পেয়েছি টের পেলেই ওরা ঘাড়টি মটকে দেবে। কাজেই ভূতের পাল্লায় পড়লেই হাবভাবে দেখাতে হবে তুমি ভীষণ সাহসী। তাহলে উল্টে ভূতই ভয় পেয়ে পালাবে।

জলার ধার দিয়ে গিয়ে নরম ঘাসে ঢাকা টিলায় উঠতে উঠতে বললুম, "রিভলবারটা তৈরি রেখো কিন্তু। কিছু বলা যায় না।"

বব বলল, 'না না। এরা চাষাভুষো লোক। বড্ড গোবেচারা।"

"বব, কুকুরের লেজ খোঁজাখুঁজির ব্যাপারটা নিয়ে তোমার মনে সন্দেহ জাগছে না?"

"ওটা তো রসিকতা। তুমি মার্কিন চাষাভুষোদের হালচাল জানো না। ওরা ভারি রসিক।"

"যে-কর্তার কথা বলল, সে রসিক না হতেও পারে।"

"চলো তো দেখি লোকটা কেমন।" বলে বব জগিংয়ের ভঙ্গিতে টিলাটা বেয়ে উঠতে থাকল।

আমার হাঁপ ধরে যাবার দাখিল। তবে শিগগির থামতে হল আমাদের। সামনে ঘন গাছপালা। ততক্ষণে অন্ধকারে দৃষ্টি পরিষ্কার হয়েছে। একফালি পথ খুঁজে পেলুম। পথ ধরে একটু এগোলে কুকুরের ডাক শোনা গেল।

কুকুরের ডাকটা সত্যি বলেই মনে হচ্ছিল আমার। ভূতদের কুকুর থাকতেও পারে। কিন্তু তারা কখনও ডাকে বলে শুনিনি। যত এগোচ্ছি, কুকুরটার হাঁকডাক তত বেড়ে যাচ্ছে। সামনে আবছা একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু কোনো আলো নেই। এমন তো হবার কথা নয়। এদেশে বিদ্যুৎ ছাড়া চলে না। শুধু আলো নয়, হাজার রকমের দরকারি কাজে বিদ্যুৎ লাগে।

বব বলল "ভারি অদ্ভুত তো! মনে হচ্ছে, বাড়ির ভেতর কুকুরটাকে বেঁধে রেখে বাড়ির লোকেরা কোথায় বেরিয়েছে। কিন্তু আলো নেই কেন?"

এবার ফিসফিস করে বললুম, "বব। সেজন্যই তো তখন বলছিলুম, এরা মানুষ

নয়।"

বব আমার কথা শুনে হেসে উঠল। "তখন থেকে তুমি মানুষ নয় মানুষ নয় করছ কেন বলো তো?"

আসল কথাটা বলতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ বাড়ির সবগুলো আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠল। কুকুরের ডাকটাও থেমে গেল। সামনে সুন্দর একটা কাঠের বাড়ি দেখতে পেলুম। ছোট্ট লনে একটা ফুলবাগিচাও দেখলুম। বব দৌড়ে গিয়ে বারান্দায় উঠল এবং দরজায় নক করল। আমি লনে দাঁড়িয়ে আলো-অন্ধকারে চোখ বুলিয়ে বিপজ্জনক কিছু আছে কি না খুঁজতে থাকলুম।

দরজা ফাঁক করে এক বুড়ো ভদ্রলোক উঁকি মেরে বললেন, "কী চাই?"

বব সবিনয়ে বলল, "দেখুন, আমরা আসছিলাম সিডার র‍্যাপিড এয়ারপোর্ট থেকে। এক বন্ধুকে প্লেনে তুলতে গিয়েছিলুম। ফেরার পথে গাড়িটা বিগড়ে গেছে।"

বুড়ো নির্বিকার মুখে বললেন, "তা আমি কী করতে পারি?"

"দয়া করে যদি আপনার লোকদের একটু বলেন........"

কথা কেড়ে বুড়ো ভদ্রলোক লোক বললেন, "আমার লোকেরা সবাই এখন কাজে বেরিয়েছে।"

রাগী বব খাপ্পা হয়ে বলল "কুকুরের লেজ খুঁজতে বুঝি?"

আশ্চর্য, ভদ্রলোক খিকখিক করে হাসলেন, "তাহলে তো জানোই দেখছি। আমার জিমের ওই এক দোষ বুঝলে? বেড়াতে গিয়ে একটা না একটা কিছু ফেলে আসবেই! প্রত্যেক দিন! আজ তো লেজ ফেলে এসেছে। কাল এসেছিল সামনের বাঁ ঠ্যাংটা ফেলে। হতভাগা খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ফিরেছিল। শেষে অনেক খোঁজাখুঁজি করে পাওয়া গেল একটা ওক গাছের মাথায়।"

বব রাগ চেপে বলল, "উড়ে গিয়ে আটকে ছিল বুঝি?"

"না না।" বুড়ো খুব হাসলেন। "দুষ্টু বাজপাখির কাজ। ভাগ্যিস পরদিন খাবে বলে বাসায় রেখে দিয়েছিল। নইলে জিম খোঁড়া হয়ে থাকত।"

বলেই বুড়োর চোখ পড়ল আমার দিকে। বললেন, "ওটা কে?"

চটপট বললুম, "আমি ভারতের লোক। এদেশে বেড়াতে এসেছি।"

দরজাটা পুরো খুলে ভদ্রলোক বেরুলেন। মস্ত আলখাল্লার মতো কালো ওভারকোট গায়ে চাপানো। লম্বাটে চেহারা! নাকটা অসম্ভব খাড়া আর লম্বা। কোটরগত ছোট্ট দুটো চোখ। ভুরু, চুল, দাড়ি সব সাদা। হাত বাড়িয়ে বললেন, "স্বাগত, সুস্বাগত। তুমি ভারতের লোক! এসো এসো। ভেতরে এসো। কী সৌভাগ্য আমার, এতকাল পরে একজন ভারতের লোক পাওয়া গেল। এসো তোমায় আমার বড্ড দরকার।"

বব তো হতভম্ব। কিন্তু বাইরের কনকনে ঠাণ্ডায় ততক্ষণে রক্ত যেন জমে গেছে। ভূত হোক, আর প্রেতই হোক, ঘরের ভেতর ঢোকাটাই এখন জরুরি।

ভেতরটা সেকেলে আসবাবে ঠাসা। একপাশে ফায়ারপ্লেসও রয়েছে সাবেকি রীতিতে! কানট্রি এলাকায় মার্কিনদের ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা সত্ত্বেও শখ করে ওরা সেকালের মতো ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালে এবং সেখানে বসে গল্পসল্প করে।

বব গুম হয়ে বসে রইল। ভদ্রলোক বললেন, "আমার নাম শ্যাম বানভিল। এই এলাকায় লোকে আমায় আংকল স্যাম—শ্যামখুড়ো বলে ডাকে। হুম! আগে কফি খাও। পরে কথাবার্তা হবে।"

দুধ-চিনি ছাড়া কালো কফি খেতে আমি ততদিনে অভ্যস্ত। কিন্তু মুখে দিয়েই বুঝেছি, গণ্ডগোল আছে। রুমাল বের করে মুখ মোছার ছলে তরল পদার্থটুকু পাচার করে দিলুম। তারপর আড়-চোখ দেখি, বব কাপ থেকে বাঁ হাতের দুই আঙুলে সরু কী একটা টেনে তুলল। তুলে বলল, "এটা কী শ্যামখুড়ো? বাজ পাখিটার আঙুল নাকি?"

শ্যামখুড়ো চোখ বুজে দুলতে দুলতে বললেন, "না, না, ঘাসফড়িং।"

বব বলল, "চীনে পাখির বাসার ঝোল রান্না করে খায় শুনেছি। ঘাসফড়িং সেদ্ধ করে কফি খাওয়ার কথা জানা ছিল না। আশা করি ডিনারে আপনি ছুঁচোর রোস্ট এবং প্যাঁচার পালকের স্যালাড খেয়েছেন?"

শ্যামখুড়ো খিকখিক করে হেসে বললেন, "তোমাদের আমি ডিনার খাওয়াতে পারতুম। তুমি ঠিকই ধরেছ।"

বাঁচা গেল। মার্কিনরা রাতের খাওয়া সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে খেয়ে নেয়। কাজেই আমি ও বব শ্যামখুড়োর কাছে যদি ওই সময় আসতুম, কী হত ভেবে শিউরে উঠলুম। বব কফির কাপটা রেখে দিয়েছে ততক্ষণে। খুড়ো আপন খেয়ালে বসে বসে দুলছেন। নইলে নিশ্চয় আপত্তি করতেন এবং গিলতে বাধ্য করতেন। দেখাদেখি আমিও কাপটা রেখে দিলুম।

এই সময় একটা প্রকাণ্ড কালো কুকুর নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে খুড়োর পায়ের কাছে বসল। অবাক হয়ে দেখলাম, তার লেজটা পুরোপুরি বাদ। লেজের জায়গায় একটু গর্ত-মতো রয়েছে। কুকুরটার জ্বলজ্বলে চোখ। সেই চোখে আমায় দেখছে দেখে ভীষণ ভড়কে গেলুম। কিন্তু ভড়কালে চলবে না। সাহস চাই, প্রচুর সাহস।

বব কুকুরটাকে দেখে বলল, "খুড়ো আশাকরি জিমকে কুকুরের স্বাভাবিক খাদ্য খাওয়ান?"

শ্যামখুড়ো জবাব দেবার আগেই জিম করল কী, যেন ববকে দেখাবার জন্য মুখ বাড়িয়ে ফায়ারপ্লেস থেকে একটা জলন্ত কাঠের টুকরো কামড়ে নিল। তারপর মুখ কাত করে হাড় চিবুনোর ভঙ্গিতে চিবুতে শুরু করল। অঙ্গারের কুচি চিড়বিড় করে ছিটকে পড়তে থাকল।

এতক্ষণে বব ভীষণ চমকে উঠল এবং তার চোখদুটা ছানাবড়া হয়ে গেল। সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। শ্যামখুড়োর চোখে পড়লে ব্যস্তভাবে বলে উঠলেন, "আঃ জিম! খায় না, ছিঃ খায় না! বদহজম হবে। তখন সেদিনকার মতো ঘোড়ার নাদির গুলি গিলতে হবে।

জিম বারণ মানল। হয়তো ঘোড়ার নাদির গুলি গিলতে হবে বলেই।

এবার শ্যামখুড়ো আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "হুম! তোমার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করা যাক। হ্যাঁ হে, তোমরা ভারতীয়রা নাকি অনেক রকম গুপ্তবিদ্যা জানো—মানে, অকাল্টের কথাই বলছি। একটু নমুনা দেখাও না আমায়?"

"খুড়োমশাই, আমি তো কিছু জানি না।" করুণ মুখভঙ্গি করে বললুম। আড়চোখে লক্ষ্য করলুম, ববের ঠোঁটের কোনায় মুচকি হাসি ফুটেছে। আমার অবস্থা দেখেই হয়তো বা।

শ্যামখুড়ো বললেন, "জানিনে বললে ছাড়ছিনে বাপু। বলি, আপত্তিটা কীসের? বিদ্যা তো অপরের কাছে জাহির করার জন্যই! বিদ্যা জেনে কি কেউ ঘরে চুপচাপ মুখ বুজে বসে থাকে? কই, ঝাড়ো একখানা নমুনা। ধরো, শূন্যে মাটি ছাড়া হয় বসা—কিংবা জ্বলন্ত আগুনে পিঠ দিয়ে শুয়ে থাকা। যে-কোনোটা।"

বেগতিক দেখে বব বলল, "বরং তোমার তাসের ম্যাজিকটা দেখাতে পারো খুড়োকে।"

খুড়ো ভুরু কুঁচকে বলল, "ম্যাজিক? ম্যাজিক কে দেখতে চেয়েছে ছোকরা?"

তেজী বব বলল, "সবই তো ম্যাজিক। ওই যে অকাল্ট না ফকাল্ট না গুপ্তবিদ্যার কথা বললেন, তা স্রেফ ম্যাজিক ছাড়া কী? একটু আগে আপনার জিমের আগুন খাওয়াটাও তাই। আপনি আসলে একজন ম্যাজিশিয়ান। তা কি বুঝিনি?"

"কী বললে? কী বললে? কী বললে?" শ্যামখুড়ো রাগের চোটে সটান উঠে দাঁড়ালেন।

"আপনি ম্যাজিশিয়ান।" বব অকুতোভয়ে বলল।

আমি ববের দিকে বারবার চোখ টিপছি। এ বিপদের সময় তর্ক করতে নেই। গোঁয়ার বব আমার দিকে তাকাচ্ছেই না। এদিকে শ্যামখুড়ো দাঁত কিড়মিড় করে তাকিয়ে আছেন। গুলি গুলি চোখদুটো থেকে দেখতে পাচ্ছি, স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে। তবু হাঁদারাম বব কিছু আঁচ করছে না।

হঠাৎ লিকলিকে আঙুল তুলে খুড়ো চেরা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, "বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও!"

"যাচ্ছি।" বলে বব উঠে গটগট করে বেরিয়ে গেল।

আমি উঠতে যাচ্ছি, খুড়ো আমার কাঁধ চেপে বসিয়ে দিলেন। সারা গা হিম হয়ে গেল। কিন্তু খুড়োর মুখে মিঠে হাসি ফুটেছে তক্ষুনি। বুড়ো আঙুল তুলে ববের উদ্দেশে বললেন, "কিস্যু জানে না ও ছোকরা। কখনো ওর সঙ্গে আর মিশো না। তার চেয়ে তুমি আমার কাছে থেকে যাও।"

মৃদু আপত্তি করে বললুম, "পরে সময় করে আসব খুড়ো! এখন বরং আমায় যেতে দিন।"

"এই ঠাণ্ডায় কোথায় যাবে বাপু?" শ্যামখুড়ো সস্নেহে বললেন, "পাশের ঘরে আরামে ঘুমোতে পারবে। যাকগে যা নিয়ে কথা হচ্ছিল। কই, শূন্যে বসে থাকাটাই একটু দেখাও।"

অগত্য বললুম "যখন-তখন এ বিদ্যা প্রকাশ করতে নেই খুড়ো। শাস্ত্রে নিষেধ আছে। তিথি নক্ষত্র এসব দেখে তবে না। পাঁজি দেখে দিনক্ষণ ঠিক করতে হবে।

খুড়ো বললেন, "তাই বুঝি? ঠিক আছে, তাহলে ওই তো আগুন রয়েছে। অন্তত আগুনে পিঠ রেখে শোয়াটা একবার দেখাও। ওঠো, দেরি করো না। টম ডিক হ্যারি এক্ষুনি এসে পড়বে। ওরা এলে আমার অন্য সব কাজকর্ম আছে। তখন ফুরসত

পাব না। ওঠো, ওঠো।"

আগুনটাও এসময় ফায়ারপ্লেসে কেন কে জানে, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আঁতকে উঠলুম। শ্যাম খুড়ো লিকলিকে আঙুলে আমাকে খোঁচাতে শুরু করেছেন। পাঁজি তিথি-নক্ষত্রের কথা তুলব কী, ক্রমাগত পাঁজরে ও পেটে খোঁচা খেয়ে কাতুকুতু লাগছে। হি হি করে হাসি পেয়ে, গেল শেষঅব্দি। তখন শ্যামখুড়োও হি হি করে হাসতে হাসতে কাতুকুতুটা বাড়িয়ে দিলেন।

কাতুকুতুর চোটে ফায়ারপ্লেসে গিয়ে ছিটকে পড়ি আর কি, হঠাৎ হইহই করে দরজা দিয়ে তিনটে লোক ঢুকল। তিনজনের হাতেই তিনটে অদ্ভুত লণ্ঠন। হ্যাঁ, এরাই জলার ধারের সেই তারা। শ্যামখুড়ো আমায় ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, পাওয়া গেল?"

টম হ্যারি ডিক তুমুল কোলাহল করে জবাব দিল, "পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে।"

শ্যামখুড়ো বেজায় খুশিতে নাচতে নাচতে বললেন, "কোথায় পেলি?"

ওরা কোরাস গাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, "ভোঁদড়ের গর্তে।"

"কাল ব্যাটাকে দেখব। এখন আর তোরা, জিমকে ধর। লেজটা পরিয়ে দিই।"

চারজনে জিমকে নিয়ে ব্যস্ত হল। আর সেই সুযোগে আমি ফুড়ুত করে কেটে পড়লুম দরজা গলিয়ে। তারপর দৌড়ে, দৌড়ে, দৌড়ে। অন্ধকারে কতবার ঠোক্কর খেলুম। রাস্তায় গড়িয়ে পড়লুম। শিশিরে কাদায় পোশাকের অবস্থা যা হল, বলার নয়।

হাইওয়েতে পৌঁছে ভ্যাগ্যিস গাড়িটা পাওয়া গেল। ভেতরে বব নির্বিকার ঘুমোচ্ছিল। ঘুমজড়ানো গলায় বলল, "শুয়ে পড়ো। সকাল অব্দি উপায় নেই।"

হাইওয়েতে পুলিশের টহলদারি আছে। শেষরাতে তাদের ডাকে ঘুম ভেঙেছিল। গাড়ির অবস্থা দেখে তাদের অফিসার ববকে বলেছিল, "এই ভিনটেজ মালটা ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে নতুন একটা কেনো।" বব তাতে রাজি। তাদের গাড়িতেই আমাদের লিফট দিয়েছিল।

পথে বব হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিল, "গাড়ি খারাপ হওয়া জায়গাটার ওখানে টিলার ওপর কে থাকে বলুন তো? ভারি অদ্ভুত লোক।"

অফিসার চোখ পাকিয়ে বলেছিলেন, "গাঁজা খাও নাকি?"

বব খাপ্পা। "সিগারেট খাওয়া নিশ্চয় গাঁজা খাওয়া নয়।"

অফিসার একটু হেসে বলেছিলেন, "ও জায়গাটার নাম আংকল স্যাম্‌স্‌ কেবিন। শ্যামখুড়োর কুটির। বিখ্যাত বই আংকল টমস্‌ কেবিনের অনুকরণ। ওখানে স্যাম নামে একটা লোক থাকত। ভাঙা বাড়িটার সামনে তার কবর দেখেছি। ফলকে মৃত্যুসাল লেখা আছে ১৮৩৫।"

বব আমার দিকে চোখ টিপে, কেন কে জানে, শুধু মুচকি হেসেছিল। আমি হাসিনি। ফোঁস করে বড় রকমের একটা নিশ্বাস ফেলেছিলুম। কারণ এই নিয়ে দু-বার ফাঁড়া গেছে। একবার বাংলামুলুকে, আর একবার মার্কিন-মুলুকে। তফাতটা শুধু ভাষার।...

জটায়ুর পালক

সেদিন খুব মন দিয়ে একটা বই পড়ছি, পায়ে কুট করে যেন পিঁপড়ে কামড়াল। পা আলগোছে নাড়া দিয়ে ফের বইয়ের পাতায় ডুবে রইলাম। ভারি জমাটি গোয়েন্দা কাহিনী। গোয়েন্দা অফিসারকে বেঁধে ডাকাতরা বস্তায় ভরছে। এক্ষুণি সমুদ্রে ফেলে দেবে। কী হয় কী হয় অবস্থা। উত্তেজনায় আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে।

ফের কুটুস করে যেন পিঁপড়ের কামড়। এবার যেন ডেয়ো পিঁপড়ে। বিরক্ত হয়ে থাপ্পড় মারতে গিয়ে দেখি, শ্রীমান ডন টেবিলের তলায় বসে এই কম্মটি করছে।

খপ্ করে তার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে তাকে বের করলুম। তারপর গর্জে বললুম, "তবে রে বাঁদর ছেলে! গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি!"

ডন কাঁচুমাচু মুখে বলল, "অত যে ডাকলুম, তুমি তো শুনতেই পেলে না!"

"তাই বলে তুই চিমটি কাটবি হতভাগা?"

"তোমার সঙ্গে যে আমার ভীষণ দরকার মামা!" ডন মুখে-চোখে কাকুতি-মিনতি ফুটিয়ে বলল, "সত্যি বলছি, দারুণ দরকার।"

ডনের দরকারে আমার সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। কারণ, তাহলে আর বইটি পড়াই হয়ে উঠবে না। পিঁপড়ের কামড় দিয়ে সবে তার জ্বালাতনের নমুনা শুরু। এর পর জানলা দিয়ে আস্ত ইঁটের টুকরো এসে পড়ারও চান্স আছে। যা বিচ্ছু ছেলে!

তাই বললুম, "ঝটপট বলে ফেল তাহলে। দেরি করো না। দেখছ না আমি এখন ব্যস্ত।"

ডন তার পিঠের দিকে জামার ভেতর থেকে কী একটা টেনে বের করল। অবাক হয়ে দেখি, আন্দাজ ফুটখানেক লম্বা একটা সাদাকালোয় চকরা-বকরা পালক। জানলা দিয়ে উপচে আসা শেষবেলার রোদ্দুরে পালকটাতে ফিনফিনে সবুজ রঙও ঝিলমিলিয়ে উঠল একবার। ডন বলল, "বলো তো মামা, এটা কোন্ পাখির পালক?"

পালকটা ওর হাত থেকে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে বললুম, "ঠিক বুঝতে পারছি না। সারস জাতীয় কোনো পাখির পালক হয়তো। এ তুই কোথায় পেলি রে?"

ডন মুখ টিপে হাসল। "বলতে পারলে না তো। মামা, তুমি রামায়ণের গল্প পড়োনি?"

"রামায়ণের সঙ্গে এটার কী সম্পর্ক?"

ডন ফিসফিস করে বলল, "রাবণরাজা সীতাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তখন সেই যে একটা পাখি এসে রাবণরাজার মাথায় ঠুকরে দিল আর মুকুট পড়ে গেল-তখন রাবণরাজা মারল তলোয়ারের কোপ। এক কোপে পাখিটার ডানা কেটে গেল।কী যেন নাম পাখিটার, বলো না মামা? পেটে আসছে মুখে আসছে না......"

হাসতে হাসতে বললুম, "হুঁ—জটায়ু পক্ষী।"

"পক্ষী না মামা, পাখি!"

"বেশ তাই হল।" স্বীকার করে নিলুম। নইলে কথা বাড়বে। ডনটা যা তক্কবাজ! "তো, তুই কি বলতে চাস, এটা সেই জটায়ুর পালক—মানে, রাবণের তালোয়ারের কোপে যেটা কাটা পড়েছিল?"

ডন রহস্যের ভঙ্গি করে বলল, "ঠিক বলেছ। সেজন্যেই তো তোমার কাছে এলাম।"

"ঠিক আছে! এখন যাও। আমি ব্যস্ত।"

ডন গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "ধ্‌ুস্! এখনও আমার দরকারটা বলাই হয়নি। তুমি জিজ্ঞেস করো পালকটা কোথায় পেলুম!"

তারপর সে আমায় জিজ্ঞেস করার আগেই বলতে শুরু করল, "পালকটা পেয়েছিল হারু গয়লা—ওই যার খাটাল আছে শিবমন্দিরের পেছনে। কোথায় পেল জানো? তার একটা গরু বেজায় দুষ্টু। চরতে-চরতে নদীর ওপারে চলে গিয়েছিল। গরুটাকে খুঁজতে গিয়ে হারু পালকটা পেয়েছে।"

"বুঝলুম। এবার এসো।"

ডন গ্রাহ্য করল না। বলল, "এই পালকটা যদি সুতো দিয়ে পিঠে বাঁধো মামা, তাহলে তুমি দিব্যি পাখির মতো উড়তে পারবে। দাও না মামা খানিকটা সুতো!"

জানি, সুতো যেভাবে হোক ওকে জোগাড় করে দিতেই হবে। নইলে রেহাই পাব না। কাজেই উঠতে হল। পাশের ঘরে ডনের দাদা শ্রীমান টমের ঘুড়ির লাটাই থেকে খানিকটা সুতো ছিঁড়ে আনতেই হল। টিম এখন ক্রিকেট খেলতে গেছে। বাড়ি থাকলে কাজটা কঠিনই হত।

ডন ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "পালকটা পিঠে বেঁধে দাও মামা। শক্ত করে বাঁধবে যেন। নইলে যদি খুলে যায়, পড়ে ছাতু হয়ে যাব।"

কষে বেঁধে দিলুম ওর ডান কাঁধের কাছে পালকটা! তারপর ডন বলল, "এবার দেখ মামা, আমি উড়ে চললুম! রেডি! ওয়ান.......টু.......থ্রি......."

সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। তখন আমি ফের গোয়েন্দা কাহিনীর পাতায় চোখ রাখলুম।.......

ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত এতদূর গড়াবে ভাবতে পারিনি। সন্ধ্যার মুখে টম ফিরে এসে যেভাবেই হোক টের পেল যে, তার লাটাইয়ের সুতো ছেঁড়া হয়েছে। খুব লম্ফঝম্প করে সে ডনকে খুঁজে বেড়াল। আলমারির পেছন, টেবিলের তলা, এমন-কী খাটের তলা খুঁজে ডনকে পিট্টি দেবার তাল করল। কিন্তু কোথায় ডন? দিদি চেঁচামেচি করেও ছেলেকে শান্ত করতে পারলেন না। শেষে ওদের বাবার নামে শাসালেন। জামাইবাবু মফস্বলে শহরের উকিল। কোর্ট থেকে ফিরে কোন ক্লাবে যেন দাবা খেলতে যান। ফেরেন রাত নটার পরে।

বেগতিক দেখে বললুম, "টম! তোর সুতো ইঁদুর ছিঁড়েছে। বাড়িতে কত ইঁদুর দেখতে পাসনে? থাম্, কালই একডজন বেড়াল এনে রাখব।"

টম শান্ত হয়ে পড়তে বসল। এবার আমিই ডনকে খুঁজতে থাকলুম! টমের ভয়েই ডন নিশ্চয় কোথাও লুকিয়ে আছে। বাড়ির চারধারে সবজি ও ফুলফলের বাগান।

জ্যোৎস্না ফুটেছে। বাগানে গিয়ে চাপাগলায় ডাকলুম, "ডন! ও ডন! বেরিয়ে আয়। অল ক্লিয়ার! তোর ভয় নেই। চলে আয়?"

কিন্তু কোনো সাড়া পেলুম না। তাহলে কি পাশের বাড়ির ওর বন্ধুদের কাছে আছে? গিয়ে দেখি, সেখানেও নেই! গেল কোথায় ও? কাছাকাছি আরও কয়েকটা বাড়ি খোঁজাখুঁজি করলুম। কোথাও নেই। এবার একটু ভয় পেয়ে গেলুম। বাড়ি ফেরার মুখে নিশ্চয় টমের চেঁচামেচি শুনে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। কিন্তু কোথায়?

হঠাৎ মনে পড়ল নাদুবাবুর ছেলে ন্যাড়ার সঙ্গে ডনকে ঘুরে বেড়াতে দেখি। নিশ্চয় ন্যাড়ার কাছে আছে ও। নাদুবাবুর বাড়ি নদীর ধারে খেলার মাঠের কাছে। সেখানে গিয়ে দেখি, ন্যাড়া তুম্বো মুখ করে পড়তে বসেছে। নাদুবাবু গম্ভীর গলায় ওঁকে মুখস্ত করাচ্ছেন, "ক মূর্ধন্য ষয়ে টয়ে কষ্ট! জোরে জোরে বল ক মূর্ধন্য ষয়ে......আমাকে দেখে মুখ নামিয়ে চশমার ওপর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কে হ্যা?"

"আমি জ্যাঠামশাই! ন্যাড়ার সঙ্গে একটু দরকার ছিল।"

"ন্যাড়ার সঙ্গে?" খুব অবাক হয়ে নাদু সিঙ্গি অকেকটা হাঁ করে ফেললেন। "নেড়ুর সঙ্গে তোমার কী?"

ঝটপট বললুম, "মানে ডনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! তাই..."

খাপ্পা হয়ে সিঙ্গিমশাই বললেন, "বোলো না। ওই পাজি হতচ্ছাড়া ছেলেটার কথা আমায় বলতে এসো না।"

"আজ্ঞে না জ্যাঠামশাই। আপনাকে বলতে আসিনি। ন্যাড়াকে জিজ্ঞেস করতে এসেছি।"

"নেড়ু কিচ্ছু জানে না। দেখছ না এখন ও পড়তে বসেছে? ওকে ডিসটার্ব কোরো না।"

ন্যাড়া বইয়ের পাতায় চোখ রেখে পড়া মুখস্থ করার সুরে বলে দিল, "ডন জটায়ুর পালক পেয়েছে। ডন মাঠে উড়ে চলে গেল।"

"মাঠে! মানে খেলার মাঠে?" উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করলুম। "কিন্তু ও নেড়ু! উড়ে চলে গেল কী বলছ?"

নাদুবাবু গর্জে উঠলেন, "হয়েছে হয়েছে। আর কোনো কথা নয়। কাজ নেই কম্ম নেই, রোজ খালি ডন ডন ডন। ডন ডন ডন ডন! হুঁ! উড়ে যাবে না তো কি হেঁটে যাবে? ভাগ্নের পিঠে ডানা গজিয়েছে যে। এবার চাঁদে গিয়ে বসে থাকবে।"

হন হন করে খেলার মাঠে চলে গেলুম। তারপর যত জোরে পারি গলা ছেড়ে ডাকলুম, "ডন!" "ডন!" আচমকা একটা গাধা বিকট চেঁচিয়ে সাড়া দিল। পিলে-চমকানো ডাক। আকাশে টোল-খাওয়া চকচকে চাঁদ যেন মজা পেয়ে মুচকি মুচকি-হাসতে লাগল। ঘাসে ভরা মাঠে জ্যোৎস্না ঝলমল করছিল। মাঠের শেষে নদীর ধারে পোড়া মন্দির ঘিরে একটা জঙ্গল। সেদিক থেকে ভেসে এল পেঁচার ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও ক্র্যাঁও চেঁচানি। অমঙ্গের ডাক! বুক কাঁপতে লাগল। ডনের কোনো বিপদ হয়নি তো?

এই রাতবিরেতে জঙ্গলটার দিকে পা বাড়ালে গা ছমছম করছিল। ভূত না থাকলেও ভূতের ভয়টা থাকে। কিন্তু ডন বেচারার জন্য তখন ভূতের সঙ্গে লড়াই

করতেও তৈরি আছে। জঙ্গলের কাছাকাছি গিয়ে গলা ছেড়ে ফের ডাকলুম, "ডন ডন!"

এবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কান্না জড়ানো গলায় কেউ চিঁ-চি করে সাড়া দিল যেন। আরও খানিকটা এগিয়ে ডাকলুম, "ডন! তুই কোথায়?"

মাথার ওপর থেকে করুণ স্বরে ডন বলল, "এই যে এখানে মামা!"

"সর্বনাশ! তুই গাছের ডালে কেন রে?"

"নামতে পারছিনে মামা!" ডন ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল।

রেগেমেগে ভেংচি কেটে বললুম, "নামতে পারছিনে মামা! হতভাগা ছেলে! গাছে উঠতে গেলি কেন? উঠলি যদি নামতেই বা পারলিনে কেন?"

ডন কান্না থামিয়ে বলল, "আমি কি গাছে চড়তে পারি? জটায়ু পাখির পালক আমায় উড়িয়ে এনেছে না?"

হাসতে হাসতে বললুম, "উড়ে-উড়ে নামলিনে কেন তাহলে?

"গাছে ডালে লেগে পালকটা ভেঙে গেল যে!" ডন আবার চিক্কুর ছেড়ে কেঁদে উঠল!

"কৈ লাফ দে। তোকে ধরে ফেলব।"

"পারব না।"

"চেষ্টা কর্ বাঁদর! রেডি! ওয়ান.........টু থ্রি......"

ডন মরিয়া হয়ে লাফ দিল এবং তাকে ধরে ফেললুম। তারপর ছায়াঢাকা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ মাথায় এল, তাই তো! ডন গাছটাতে চড়তে পারল কেমন করে? চড়তে পারলে নামতে পারাটা কি কঠিন হত বরং চড়াটাই কঠিন, নামাটা সোজা।

আমার গা শিউরে উঠল। তাহলে কি সত্যি পালকটার কোনো আশ্চর্য ক্ষমতা আছে? মাঠে জ্যোৎস্নার দাঁড়িয়ে বললুম, "দেখি পালকটা!"

সত্যি পালকটা ভেঙে গেছে! পস্তানি হল, পালকটা না ভাঙলে একবার আমি নিজে পরখ করে দেখতুম। কিন্তু কী আর করা যাবে!

হাঁটতে-হাঁটতে বললুম, "হ্যাঁ রে বোকা! গাছ থেকে যে নামতে পারছিলিনে, চেঁচিয়ে কাউকে ডাকলিনে কেন? বুদ্ধি করে আমি না এলে সারা রাত্তির তোকে গাছের ডালে থাকতে হত।"

ডন এবার ফিক করে হাসল। "জানো মামা, রামু ধোপা ওর গাধার পিঠে কাপড় চাপিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখে যেই ডেকেছি, ও রামুকাকা! আমায় নামিয়ে দেবে? অমনি রামু রাম-রাম বলতে বলতে গাধাটাকে ডাকিয়ে নিয়ে পালিয়ে গেল। আমি সন্ধেবেলা গাছ থেকে ডেকেছি তো, ভেবেছে ভূত! হি হি হি!"

ডন খুব হাসতে লাগল। কথাটা কিন্তু ঠিক। ভাগ্যিস ডন আমার ভাগ্নে এবং তাকেই খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। নইলে অন্য কেউ ওই পোড়া মন্দিরের জঙ্গল থেকে ডাকলে আমিও বেজায় ভয় পেতুম না কি?

ডনকে সুতোর ব্যাপারে টমের কথাটা বললুম। তখন ডন বলল, "সুতোগুলো খুলে দাও মামা। শিগগির!"

সুতো খুলে ফেলে দিলুম। ভাঙা পালকটা হাতে নিয়ে ফের আমার গা শিরশির করতে থাকল। বললুম, "পালকটা তাহলে সত্যি জটায়ুর! হারুর কাছে কত দিয়ে কিনেছিলি রে?"

ডন আবার ফিক-ফিক করে হাসতে লাগল। জ্যোৎস্নায় ওর সাদা সরু দাঁতগুলো ঝিকঝিক করছিল। বললুম, "হাসছিস যে?"

ডন জবাব দিল না। গুলতির মতো হঠাৎ বোঁও করে ছুটে গেল। অদ্ভুত ছেলে তো! এমন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন পালকটার ওপর একটুও মায়া করল না দেখে অবাক লাগছিল।

কিন্তু হাসল কেন অমন করে? ভাঙা পালকটা পকেটে ভরে খুব ভাবতে ভাবতে বাড়ির দিকে চললাম। হুঁ, ব্যাপারটা ভাববার মতো।.....

ন্যাড়ারাজার বেলতলা গমন

রামনগরের রাজা আগের রাতে যখন খেয়ে দেয়ে পান চিবুতে চিবুতে রানীর সঙ্গে গল্প করতে করতে পালঙ্কে শুলেন, তখন তাঁর মাথায় ছিল লম্বা চুল, নাকের ডগায় তা-বড়ো গোঁফ আর চিবুকে বেজায় রকমের দাড়ি।

কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠেই ঘটল অবাক কাণ্ড। রানী হাঁ করে তাকিয়ে দেখে গালে হাত রেখে বললেন, ও রাজা! তোমার চুল কৈ? গোঁফ কৈ? দাড়ি কৈ?

সে কী! বলে রাজা হাত বুলিয়ে টের পেলেন চুল নেই। গোঁফ পাকাতে গিয়ে জানলেন গোঁফ নেই। দাড়িতে হাত রাখলে চিবুকে ঠেকল। এ কী বিদঘুটে কাণ্ড। রাজা আয়নার সামনে নিজেকে দেখে আর চিনতেই পারলেন না।

মাথা জোড়া টাক, মাকুন্দে মুখ এ-লোকটা কে? এই কি সেই রামনগরের রাজা, যাঁর দাপটে পাশের রাজ্য শ্যামনগরের রাজা ভয়ে থরথর করে কাঁপেন?

রামনগরের রাজা তক্ষুনি মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন।

মন্ত্রী এসে রাজাকে চিনতে পারলেন না। বললেন, ওহে! রাজামশাইকে খবর দাও। বলো আমি এসেছি। আহা, হাঁ করে আছ কেন বাপু? শিগগির যাও।

রাজা খুব চটে গিয়ে বললেন, আপনি কি চোখের মাথা খেয়েছেন মন্ত্রীমশাই? চিনতে পারছেন না আমাকে?

এবার ঠাহর করে দেখে মন্ত্রী জিভ কেটে বললেন, এ হে হে! বড্ড ভুল হয়ে গেছে। কিন্তু এ কী রাজামশাই! আপনার চুল কৈ? গোঁফ কৈ দাড়ি কৈ? কার শ্রাদ্ধ হল, তা তো জানতে পারলুম না।?

রাজা বললেন, আরে না না! সেটা বলতেই তো ডাকছি আপনাকে। রাত্তিরে দিব্যি সব ছিল। সকালে উঠে দেখি কিছু নেই। এখন কী করি বলুন তো?

মন্ত্রী ভেবে টেবে বললেন, আমার মনে হচ্ছে এটা শ্যামনগরের রাজার কারচুপি!

কী রকম, কী রকম?

দেখুন রাজামশাই, চুল গোঁফ দাড়ি না থাকলে আপনার যা রোগা চেহারা, কেউ আপনাকে রাজা বলে মানতেই চাইবে না! প্রজারা হাসাহাসি করবে।

ঠিক, ঠিক।

প্রজাদের কাছে আপনাকে হাসির পাত্র করতেই শ্যামনগরের রাজা কোনো যাদুকরকে দিয়ে এই অপকর্মটি করিয়েছে।

জাদুকরকে দিয়ে? রাজা ভাবতে-ভাবতে বললেন। তাহলে মন্ত্রীমশাই, আপনি এখনই শ্যামনগরে চর পাঠিয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে সেই জাদুকরকে এ রাজ্যে নিয়ে আসুন।

মন্ত্রী আন্দাজে জাদুকরের কথা বললেন বটে, কিন্তু মনে-মনে বড় ফাঁপরে পড়লেন। যদি সত্যি জাদুকরের যাদুমন্তরে এমনটি না হয়ে থাকে? যদি শ্যামনগরে সত্যি কোনো জাদুকর না থাকে? তাহলে তাঁর গর্দান যাবে না? বললেন, এক্ষুনি পাঠাচ্ছি। কিন্তু একটু পরেই তো আপনাকে দরবারে যেতে হবে। এ অবস্থায় দরবারে গেলে আপনাকে চেহারা দেখে যদি হো হো করে হেসে ফেলে?

রাজা রেগে বললেন, সবার গর্দান নেব।

কিন্তু নেবেন কি ভাবে? যদি জল্লাদও হো হো করে হেসে ওঠে? জল্লাদের গর্দান কে নেবে তখন, বলুন?

রাজা ভেবে মাথা নাড়লেন। ঠিক, ঠিক! তাহলে উপায়?

পরচুলা পরুন। নকল দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে নিন। আমি এক্ষুনি সব আনিয়ে দিচ্ছি। ....বলে মন্ত্রী হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন।.....

রামনগরের রাজা 'রোজকার মতো দরবারে বসেছেন। পাত্র মিত্র সেনাপতি প্রজা সবাই হাজির। কিন্তু কেউ টের পাচ্ছে না আসল ব্যাপারটা।

একটু পরে রাজা হঠাৎ মাথার মুকুটের তলা দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে চুলকোতে শুরু করেছেন। চুলকোতে গিয়ে মুকুট গেছে খসে। সেই সঙ্গে পরচুলটাও!

তারপর দাড়ি আর গোঁফও দুহাতে প্রচণ্ড চুলকোতে লাগলেন।

হয়েছে কী, চুল-গোঁফ দাড়িতে ছিল রাজ্যের উকুন, ছারপোকা আর পিঁপড়ে। কুটকুট করে কামড়াতে শুরু করেছে।

শেষে এক টানে রাজা গোঁফ দাড়ি খুলে ফেলে দিলেন। দরবারের সবাই এতক্ষণ হাঁ করে ব্যাপারটা দেখছিল। এবার হো হো হা হা হি হি করে হেসে লুটিয়ে পড়ল, যে যেখানে ছিল।

রাজা মহাখাপ্পা হয়ে গর্জন করলেন, গর্দান! গর্দান! জল্লাদ কোথায়?

জল্লাদ হাজির বটে, কিন্তু হাসির চোটে তার হাতের অস্ত্র পড়ে গেল। শেষে মন্ত্রীমশাইও আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। হাসতে হাসতে হাসির চোটে দরবার থেকে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।

হাসি দেখলেই হাসি পায়। তাছাড়া অনেকে হাসির চোটে অনেক কাণ্ড করেও ফেলে। কেউ হাসতে হাসতে অন্যকে খামচাতে ও মারতে শুরু করে। কেউ মাটিতে গড়াগড়ি খায়। আবার কেউ হাসির চোটে দৌড়োদৌড়ি করে বেড়ায়।

দরবারে মন্ত্রীর স্বভাবের অনেক লোক ছিল। তারাও মন্ত্রীর পেছন পেছন দৌড়ে

যাচ্ছিল। রাজধানীর পথে ঘাটে দোকান-বাজারে যত লোক ছিল প্রথমে অবাক হয়েছিল। পরে হাসির রোগে ধরতেই তারা নানা ভঙ্গিতে হাসতে লাগল। অনেকে মন্ত্রীর হাসির ঘোরে এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করতে থাকল।

ওদিকে দরবার থেকে রাজা বেজায় লজ্জা পেয়ে অন্তঃপুরে ঢুকেছেন। সেখানেও দাস-দাসীরা তাঁকে দেখে গোপনে হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে কে কোথায়! এমন কী রানীও এবার হাসি চাপতে পারছেন না।

রামনগরের রাজা সটান ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। দুঃখে বসে রইলেন চুপচাপ।...

কিন্তু রাজা ঘরে বসে থাকলে রাজ্য চলবে কী করে? মন্ত্রী ভাবনায় পড়লেন শেষমেশ। চর পাঠালেন শ্যামনগরে। সত্যি কি এ কোনো জাদুকরের কীর্তি?

চর এসে খবর দিল, সেই রকমই মনে হচ্ছে মন্ত্রীমশাই!

মন্ত্রী বললেন, কী রকম, কী রকম?

চর বলল, শ্যামনগরের রাজার মাথায় ছিল টাক। মুখে ছিল না গোঁফ-দাড়ি। সেই রাজার মাথায় দেখে এলুম লম্বা-লম্বা চুল আর মুখে দেখলুম বেজায় গোঁফ দাড়ি। কাজেই মনে হচ্ছে, আমাদের রামনগরের রাজার চুল-গোঁফ-দাড়ি চলে গেছে শ্যামনগরের রাজার কাছে। কিন্তু গেল কী করে, সেটা খুঁজে বের করতে পারলুম না।

মন্ত্রী বললেন, তুমি একটা অপদার্থ! এ নিশ্চয় কোনো জাদুকরের কাজ।

চর বলল, শ্যামনগর তন্নতন্ন ঢুঁড়ে কোনো জাদুকরের টিকিও দেখতে পাইনি মন্ত্রীমশাই! শুনলুম, শ্যামনগরের রাজা সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখেন, তাঁর চুল দাড়ি গজিয়েছে।

মন্ত্রী খাপ্পা হয়ে বললেন, মলো ছাই! তাহলে তো গণকঠাকুরকে ডাকতে হয়।

তাই ডাকুন। বলে চর প্রণাম ঠুকে চলে গেল।

তলব পেয়ে হাজির হলেন গণকঠাকুর। মস্ত টিকি। লম্বা বড়-বড় কান। বগলদাবা একগাদা পুঁথি-পত্তর! খড়ি দিয়ে মেঝেয়ে অনেক আঁক কেটে হিসেব করতে থাকলেন। হিসেব করে শেষ হয় না।

মন্ত্রী বলেন, কৈ ঠাকুর? গণনা হল?

গণক বলেন, আর একটু বাকি মন্ত্রীমশাই।

দিন গেল। রাত গেল। আবার দিন গেল। রাত গেল। গণনা আর শেষ হয় না। সাত দিন সাত রাত পরে গণক মুখ তুলে বললেন, হয়েছে।

মন্ত্রী বললেন, কী কী?

গণক বললেন, বিষ্যুৎবারের বারবেলায় রাজা বেল খেয়েছিলেন। যে গাছের বেল, সেই গাছে ছিল এক ব্রহ্মদত্যি। তার অভিশাপ লেগেছে।

মন্ত্রী বললেন, এ অভিশাপ দূর হবে কিসে?

গণক বললেন, থামুন। তাহলে ফের হিসেব কষে বের করি।

হিসেব কষতে আরও সাত দিন সাত রাত গেল। তারপর গণক এক টিপ নস্যি নিয়ে হ্যাঁচ্চো হেঁচে বললেন, রাজামশাইকে আবার সেই গাছের একটা বেল খেতে

হবে। কিন্তু বেলটা নিজের মাথায় ভেঙে খাওয়া চাই। এই হল প্রায়শ্চিত্ত।

কিন্তু রাজা তো ঘরে দরজা বন্ধ করে মনের দুঃখে বসে আছেন সেই থেকে। রানী মাথা ভেঙেছেন, মন্ত্রী ভেঙেছেন, দরজা খোলেন নি। না খাওয়া, না দাওয়া। ঘরের মধ্যে থেকে আরও শুকিয়ে চিমসে হয়ে গেছেন। নড়াচড়ার ক্ষমতাটুকুও নেই। মন্ত্রী বাইরে থেকে গণকঠাকুরের গণনার কথা বললে অতি কষ্টে চিঁ চিঁ করে বলেছেন, দরজা খোলার জোর নেই হাতে। ওঠারও সাধ্যি নেই। যা হয় করুন এখন।

তখন দরজা ভাঙা হল। মন্ত্রীমশাই আর রানী ঘরে ঢুকে রাজার দশা দেখে খুব দুঃখু পেলেন। রোগা প্যাকাটি—একেবারে কংকাল হয়ে গেছে শরীর। কিন্তু মাথাটি হয়েছে কুমড়োর মতো প্রকাণ্ড। কাঠির ডগায় আলু বসালে যেমন দেখতে লাগে তেমনি।

মন্ত্রী, রানী, দাস-দাসী মিলে রাজাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেলেন বাগানে। সেখানে আছে এক বেলের গাছ। গাছ ভরা বড়-বড় পাকা বেল। রাজাকে তলায় বসিয়ে মন্ত্রী উঠলেন গাছে।

বেল দেখে রাজার মনে পড়ে গেছে প্রবাদবাক্য : ন্যাড়া বেলতলায় যায় ক'বার?

ভয়ে-ভয়ে রাজা মুখ তুলে বেল দেখছেন! সবাই বেলতলা থেকে তফাতে সরে গেছে। মন্ত্রী বেলগাছ নাড়া দেবেন। মাথায় বেল পড়লে তো মুশকিল। অন্যদের তো শাপ লাগেনি। তারা তাকিয়ে আছে ব্যাকুল হয়ে। মন্ত্রী গাছের ডালে নাড়া দিচ্ছেন। বেল পড়ছে না। পড়ছে না। কিছুতেই পড়ছে না।

তারপর পড়ল। ফটাস করে রাজার টেকো মাথায় পড়ে ফাটল। সবাই চেঁচিয়ে উঠল খেয়ে ফেলুন! খেয়ে ফেলুন! খেয়ে ফেলুন!........

রামনগরের রাজা চোখ খুললেন।

চোখ খুলেই লাফিয়ে উঠে বসলেন। এ হে হে হে! কী লজ্জার কথা, কী বেআক্কেলে কাণ্ড এ বয়সে। ঘুমের ঘোরে পড়ে গেছেন পালঙ্ক থেকে।

পালঙ্কে রানী নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। ভোর হয়েছে। পাখ-পাখালি ডাকছে। প্রথমেই রাজা মাথায় হাত দিলেন। হুঁ, দিব্যি লম্বা লম্বা চুল আছে। গোঁফে আর দাড়িতে হাত বুলোলেন। তাও যথাস্থানে আছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারা দেখলেন। না—সবাই ঠিকঠাক আছে। উঃ বড় জোর বাঁচা গেছে।

তাহলে ব্যাপারটা স্বপ্ন? তা তো বটেই। ঘোর দুঃস্বপ্ন। তারপর রাজা জানালার ধারে গেলেন। বাইরে ফল ফুলের বাগান। চোখ গেল বেল গাছটায় দিকে। গাছ ভরা বড়-বড় বেল। পাকার সময় হয়েছে। কদিন থেকে ইচ্ছে করছিল, পাকা, বেল খাবেন। কিন্তু এই বিদ্‌ঘুটে স্বপ্নের পর বেল খাওয়ার কথা তো ভাবাই যায় না।.....

বাঁচা-মরা

অনেক বছর পরে গ্রামে যাচ্ছি। ট্রেন লেট করেছিল। স্টেশনে নেমে দেখি শেষ বাস চলে গেছে রাত নটায়। এখন বাজছে প্রায় দশটা। গ্রাম ছয় মাইল দূরে। কী করব ভেবে পেলুম না।

কয়েকটা সাইকেল রিকশো দাঁড়িয়েছিল। তাদের সাধাসাধি করলুম। এত রাতে কেউ অত দূর যেতে রাজি হল না। তখন হতাশ হয়ে একটা চায়ের দোকানে গেলুম চা খেতে।

এমন সময় রোগা হাড়গিলে চেহারার হাফপেন্টুল আর ছেঁড়া গেঞ্জি পরা লোক এসে হঠাৎ বলল—স্যার কি রিকশো খুঁজছিলেন? কোথায় যাবেন?

—হ্যাঁ। যাব দোমোহানী।

—আসুন তবে। লিয়ে যাই। চণ্ডীতলার একজনকে পেসেঞ্জার পেয়েছি। পথে আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাব। ঐ দেখুন আমার রিকশো।

আনন্দে লাফিয়ে উঠলুম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলুম, একটু তফাতে গাছ-তলায় একটা রিকশো দাঁড়িয়ে আছে। তাতে একজন লোক গুটিসুটি বসে আছে। গাছের পাতার ফাঁকে কুচিকুচি আলো পড়েছে মাছের আঁশের মতো। পাঞ্জাবি-ধুতিপরা লোকটাবে প্রৌঢ় বলে মনে হল। কোলে একটা ব্যাগও আছে। চুপচাপ বসে আছে!

—শিগগির চা খেয়ে আসুন। বলে রিকশোওলা চলে গেল। ভাড়ার কথা তোলার ইচ্ছে হল না। যা চায় দেব। এমন বিশ্রি অবস্থায় কখনও পড়িনি। আর স্টেশনটা এমন অখাদ্য জায়গায়, বাজার বা বসতি মাইলটাক দূরে। সেখানে গিয়েও যে রাতের আশ্রয় পাব, ভরসা নেই।

চা-ওলা আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। এতক্ষণে বলল—স্যার, ওহিদের রিকশোয় যাবেন না। বরং ঐ সিংহবাহিনীর মন্দিরে যান। ধর্মশালা আছে।

আমি জানি, হিন্দু মন্দির অথবা ধর্মশালায় আমাকে থাকতে হলে জাত ভাঁড়িয়ে থাকতে হবে। সে মিথ্যাচারিতা সম্ভব নয়। তাই বললুম—থাক। কিন্তু ওর রিকশোয় গেলে ক্ষতি কি বলুন তো?

চা-ওলা চাপা গলায় বলল—আপনি নতুন লোক বলেই বলছি। ওহিদ ওর রিকশোয় মড়া বয়।

হেসে বললুম—মড়া বয়? আমি ভাববাম বুঝি চোর-ডাকাত!

—না না। লোক খুব ভাল। তবে দোষের মধ্যে ব্যাটা রিকশোয় মড়া বয়। তাই চেনাজানা কেউ ওর রিকশোয় চাপে না। চা-ওলা ফের ষড়যন্ত্র-সংকুল গলায় বলল— বাত বিরেতে মড়াবওয়া রিকশোয় চাপতে নেই। আমি একবার ভারি বিপদে পড়েছিলুম জানেন? আসছিলুম মেয়ের শ্বশুরবাড়ি সেই হরেকেষ্টপুর থেকে। বেয়ানের সঙ্গে একটুখানি কথা কাটাকাটি হয়েছিল তাই...

ওহিদ রিকশোওলা এসে তাড়া লাগালো—আসুন স্যার।

রাত বেড়ে যাচ্ছে। তক্ষুনি উঠে পড়লুম। চা ওলা খুব জমিয়ে নিশ্চয় ভূতের

গল্প বলতে চাইছিল। বাধা পেয়ে গোমড়ামুখে বসে রইল।

আমার সঙ্গী ভদ্রলোক চোখ বুজে বসে আছেন। মনে হল, ঘুমোচ্ছেন। অনেকের এ অভ্যাস থাকে। তাছাড়া যেচে পড়ে কারও সঙ্গে আলাপ করার স্বভাব আমার নেই। রিকশো আস্তে-সুস্থে চলেছে। ওহিদ রিকশোওলা তেমন শক্ত সমর্থ জোয়ান নয় তা ওর গঠন দেখেই টের পেয়েছিলুম।

কিছুক্ষণ পরে কৃষ্ণপক্ষের ভাঙা চাঁদ উঠল। হাল্কা জ্যোৎস্না ছড়ালো পৃথিবীতে। এসব সময়ে এই নির্জন রাতে স্বভাবত ঘুম ঘুম আচ্ছন্নতা এসে যায়। কিন্তু ইন্দ্রিয় সজাগ রাখা দরকার। না, ভূতের ভয় দেখিয়েছে বলে নয়, নেহাত চোর-ডাকাতের ভয়েই। ভাবলুম, রিকশোওলার সঙ্গে গল্প করা যাক। তাই বললুম—ওহে তোমার নাম বুঝি ওহিদ?

রিকশোওলা জবাব দিল—হ্যাঁ, স্যার।

—তুমি থাকো কোথায়?

—আজ্ঞে, হরিণমারা-গোপপাড়ায়। ইস্টিশেনের ওপাশেই আমাদের গাঁ...... বলে সে আকাশে মুখ তুলে হাঁ করে দম নিল। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে চাঁদ দেখে ফের বলল—বড় গাঁ, স্যার। ইস্কুল পোস্টাপিস থানা হাসপাতাল সবই আছে।

এরপর সে তার গ্রাম সম্পর্কে মোটামুটি একটা ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিবরণ দিতে থাকল। লোকটির প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে গেল।

এই করে প্রায় মাইলটাক পথ আসা গেল। তারপর বেমক্কা হাসতে হাসতে বলে বসলুম—হ্যাঁ, তুমি নাকি এই রিকশোয় মড়া বও?

ওহিদ প্যাডেল থামিয়ে আমার দিকে ঘুরে ফ্যাঁচ তরে অদ্ভুত হেসে বলল—নেত্যদা বলল বুঝি? নেত্যদাটা ভারি দুষ্টু। আমার প্যাসেঞ্জারকে ভাঙচি দেয় খালি। কি আর বলব বলুন? এক জায়গায় আড্ডা দিই! তাসটা আরটা খেলি! বলতে গেলে বন্ধু মানুষ। তা স্যার, ইচ্ছে হলে চলুন আমার গাড়িতে। না ইচ্ছে হলে নেমে যান। ভেবে দেখুন এখনও।

সর্বনাশ! বলে কী ব্যস্তভাবে বললুম—না, না। মড়া বও তাতে কী হয়েছে?

ওহিদ প্যাডেলে আস্তে চাপ দিয়ে বলল—ইস্টিশনের পেছনে মা গঙ্গা। নানা জায়গায় মড়া যায় সেখানে। আমি মড়া বই। দোষ কী বলুন? তিনগুণ ভাড়া পাই। বইব না কেন? জ্যান্ত প্যাসেঞ্জার কি আমার স্বগ্গে নিয়ে যাবে?

—ঠিকই তো। বরং মড়া বইলে অনেক পুণ্যি। মড়ারা তো স্বর্গের পথেই পাড়ি জমায়। আগে থেকে চেনাজানা থাকা ভাল। নেহাত পাপ করে থাকলে তাদের কেউ স্বর্গে ঢুকতে পায় না। নরকে বেঁধে নিয়ে যায়!

ওহিত আমার কথায় খুশি হল! —তাহলেই দেখুন। তবে আসলে কী জানেন স্যার? মড়া বওয়া সহজ কাজ নয়। সবাই এটা পারে না। ইস্টিশনের যত রিকশোওয়ালা আছে, কারুর কি এ সাধ্যি হত? হ্যাঁ, পারলে তো সবাই বইত। তিনগুণ বেশি পয়সা পেত। কিন্তু মুরোদে কুলোয় না বলেই হিংসে করে আমায়।

—তাই বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। মড়া পেসেঞ্জার নিয়ে রিকশোর প্যাডেল ঘোরানো সোজা নয়। শালার কি ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করেনি কেউ? সব জানি বাবা। পারেই নি। একবার গোবর্ধন রাতের বেলায় চুপি চুপি মড়া চাপিয়েছিল। পরদিন সকালে দেখি, রিকশো নয়ানজুলির জলে উলটে পড়ে আছে মড়াসুদ্ধু। সে এক কেলেঙ্কারি।

ওহিদ খুব হাসতে লাগল। আমি বললুম— গোবর্ধনের কী হল?

—গোবর্ধন গতিক বুঝে রিকশোর সিট থেকে লাফ দিয়ে পালিয়েছিল। তাই রক্ষে। তো আর সেই থেকে সে মড়া দেখলে সরে যায় তফাতে।

—তা ওহে ওহিদ, তুমি কিসের জোরে মড়া বইতে পারো বলো তো শুনি?

ওহিদ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। একটু পরে বলল—আমি নিজেই এক মড়া।

—তার মানে?

—মড়া বৈকি। কারণ, আমাকে একবার জানঘরে দিয়েছিল।

—জানঘর! সে আবার কী?

—বলতে গেলে সে বড্ড দুখের কথা স্যার। আমার পেটে শূলের ব্যামো হয়েছিল। সদর হাসপাতালে ভর্তি হলুম। দেখে থাকবেন। হাসপাতালের একধারে একটা আলাদা ঘর থাকে। রুগী মারা যাবে টের পেলে কিংবা মারা গেলে সেই ঘরে রেখে আসে। তাকে বলে জানঘর! তো আমাকে সেই জানঘরে রেখে এসেছিল ডাক্তারবাবু।

—বলো কী? তারপর?

—ডাক্তারবাবু আমার নাড়ি খুঁজে পায় নি। খাবি খেতে খেতে মারা পড়েছিলুম।

—অ্যাঁ! সর্বনাশ!

—আজ্ঞে খোদার কসম। তো রোজ সকালে বউ খোঁজ নিতে যায় আর আমায় গালমন্দ করে আসে। এভাবে হাসপাতালে পড়ে থাকলে সংসারী লোকের চলে? ছেলেপুলে উপোস করে মরছে যে! বউ ভারি চটে গিয়েছিল। রোজ এসে বলত— মিনসের সব চালাকি! রিকশো টানতে আলিস্যি। তাই হাসপাতালে এসে মিছিমিছি পড়ে আছে। টাইমে দিব্যি পেটপুরে খেতে পাচ্ছে। বই রোজ গিয়ে গালাগালি করত। আমায় জানঘরে দেওয়া শুনে বউ আরো চটে গেল। বাড়ি থেকে একটা মুড়ো ঝাঁটা এনে জানঘরের দরজায় গিয়ে চেঁচিয়ে বলল—ন্যাকামির আর জায়গা পাওনি? ওঠ, ওঠ বলছি। এখানে পড়ে আছে, আর আমরা উপোস করে মরছি। না ওঠ তো, পিঠের চামড়া ঝাঁঝরা করে দেব। এই বলে যেই ঝাঁটা তুলেছে, আমি স্যার তড়াক করে উঠে পড়েছি।

—সর্বনাশ!

—সর্বনাশ বলে সর্বনাশ! আমার বউ তো স্যার দেখেননি।

—তারপর কী হল?

—দেখতেই পাচ্ছেন। রিকশোয় প্যাডেল ঘোরাচ্ছি। সে হাঁ করে দম নিয়ে ফের চাঁদটা দেখার পর বলল—আমি জানঘর থেকে পালিয়ে আসা মড়া, স্যার। আমি কেন মড়ার ভয় পাব বলুন?

সে ফ্যাঁচ করে অদ্ভুত হাসল এবার। এতক্ষণে তার মুখের একটা পাশ, একটা

চোখ অব্দি দেখতে পেলুম ফিকে জ্যোৎস্নায়। নীল ঝকঝকে ঐ চোখ কি জ্যান্ত মানুষের? আমার গা ছমছম করল।

এই সময় হঠাৎ দেখি, আমার সঙ্গী যাত্রীটিও এতক্ষণে একটু নড়লেন এবং গলার ভেতর খিকখিক করে হেসে উঠলেন। চোখও খুললেন।

ভয়ে ভয়ে বললুম—কী হল মশাই? হাসছেন কেন?

ভদ্রলোক ভারি গলায় বললেন—কে জ্যান্ত কে মড়া বোঝা ভারি কঠিন। এই আমায় দেখছেন, বলুন তো আমি জ্যান্ত না মড়া?

—মড়ারা কথা বলে না। আপনি তো দিব্যি কথা বলছেন।

—বলে মশাই বলে। আপনি জানেন না, সে আলাদা কথা। বলে ভদ্রলোক ফের খিকখিক করে হাসতে থাকলেন।

পাগল নাকি? বললুম—নিজেকে বুঝি আপনি মড়া ভাবেন?

—ভাবব কি মশাই? আমি যে সত্যি সত্যি মড়া!

—বলেন কি?

—হুঁউ! ঐ যে ওহিদ বলল, সে জানঘর থেকে পালিয়ে এসেছিল বউয়ের ঝাঁটার ভয়ে। আমিও আজ জানঘর থেকে পালিয়ে এসেছি জানেন?

—আপনিও কি বউয়ের ভয়ে পালিয়ে এসেছেন?

ভদ্রলোক জোরে ঘাড় নেড়ে বললেন—নাঃ! আমার মশাই বউটউ নেই।

—তাহলে?

—ডাক্তারবাবুর ভয়ে। মশাই সবে মারা গেছি—ডাক্তারবাবু কিনা ইয়াবড় ছুরি বাগিয়ে আমাকে টুকরো-টুকরো করে কাটার ফন্দি এঁটেছেন।

—পোস্টমর্টেম বলুন।

—ঠিক বলেছেন। তো যেই ছুরিটা আমার বুকের দিকে এনেছেন, অমনি একলাফে উঠে ডাক্তারবাবুকে ধাক্কা মেরে হটালুম। কারা চেঁচাল, ধর ধর। পালাচ্ছে, মড়া পালাচ্ছে। আমি ততক্ষণে পগার পার। বাপ্‌স, আর ভুলেও হাসপাতালে নয়।

ভদ্রলোক খিকখিক করে ফের হাসলেন। ওহিদ সায় দিয়ে বলল—কখনো নয়। ভাগ্যিস, মারা গিয়েছিলুম বলেই না উচিত শিক্ষেটা হল।

ভদ্রলোক হাসি থামিয়ে আমার দিকে ঘুরে বললেন—যাকগে। এবার আপনারটা শোনা যাক।

—আমার কী?

—লজ্জা কিসের মশাই? লুকোছাপা করে আর কি লাভ বলুন। এখানে তো কোনও জ্যান্ত মানুষ নেই। প্রাণ খুলে বলে ফেলুন, আপনি কীভাবে......

—কি মুশকিল! আমি হাসপাতালেও যাইনি। আপনাদের সেই জানঘর কিংবা লাশকাটা ঘরেও আমায় ঢোকানো হয়নি। আমি যাচ্ছি অনেক বছর পরে জন্মভূমি দেখতে।

ভদ্রলোক ধমক দিলেন—চালাকি হচ্ছে? আমরা মড়া চিনি না? কী রে ওহিদ, বল, না বাবা!

ওহিদ ফ্যাঁচ করে হাসল। —স্যারকে দেখেই চিনেছিলুম। নৈলে কেনই বা নিজে

গিয়ে সাধব?

রেগে গিয়ে বললুম—আমি নড়া নই, জ্যান্ত মানুষ। নাড়িটা টিপে দেখুন না।

ভদ্রলোক গম্ভীর গলায় বললেন—হ্যাঁরে ওহিদ, তাহলে কি ভুল করেছিস বাবা?

ওহিদ জোর গলায় বলল—আমার ভুল হতেই পারে না। এতকাল মড়া ঘাঁটছি।

ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে বললেন—দেখি, আপনার নাড়ি দেখি। বলে খপ করে আমার হাতেরক কব্জি ধরে ফেলতেই টের পেলুম, কী ঠাণ্ডা বরফের মত ওঁর হাতটা! আর চোখের ঐ দৃষ্টি—আবছা জ্যোৎস্নায় জ্বলজ্বলে নীল দুই চোখের দৃষ্টি!

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চলন্ত রিকশো থেকে লাফ দিলুম। আছাড় খেয়েই উঠে পড়লুম। তারপর দিগ্বিদিক না দেখে দৌড় দৌড়। পেছনে ওরা চেঁচাতে থাকল—ধর ধর। পালাল পালাল।

স্টেশনের আলো লক্ষ্য করে দৌড়োচ্ছিলুম। হাঁফাতে হাঁফাতে যখন সেই চায়ের দোকানে পৌঁছলুম, বিজ্ঞ চা-ওলা হেসে বলল—জানতুম। তখন নিষেধ করলুম, শুনলেন না। সোজা ধর্মশালায় চলে যান। সকালে রওনা হবেন।

তিব্বতী গুপ্তবিদ্যা

মাদাম ব্লাভাৎস্কির গুপ্তবিদ্যা

'গুম্ফার ভেতর গা ছমছম করা অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু একটু পরেই টের পেলুম, বাইরের উজ্জ্বল রোদ থেকে এসেছি বলেই এমন মনে হচ্ছে। অন্ধকারটা ক্রমশ ফিকে হয়ে গেল। তারপর চোখের দৃষ্টি যত পরিষ্কার হচ্ছিল, তত ভয় পাচ্ছিলুম। চৌকো বিশাল ঘরের ভেতর দুধারে দাঁড়িয়ে আছে যত সব ভয়ঙ্কর চেহারার মূর্তি।.....

'বিদ্ঘুটে মূর্তিগুলো চোখ কটমট করে এমন ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন আর এক পা বাড়ালেই ঝাঁপিয়ে পড়বে আমার ওপর। চোখের দৃষ্টি যখন একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেল, তখন মূর্তিগুলোকে জীবন্ত মনে হল। এমন কী, যেন তাদের ঘনঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের চাপা শব্দও কানে শুনতে পেলুম।......

'এই নির্জন পাহাড়ী গুম্ফায় খেয়ালবশে একা ঢুকে পড়াটা ঠিক হয় নি। সত্যের খাতিরে বলব, আমি ভিতু লোক নই। ভূতপ্রেত বিশ্বাস করি না। জীবনে কত সাংঘাতিক অবস্থায় পড়েছি, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি গুলিয়ে ফেলি নি। আজ ওই গুম্ফার ভেতর আমার জ্ঞানবুদ্ধি যেন গুলিয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, একটা নিষিদ্ধ জায়গায় ঢুকে পড়েছি এবং একদল সাংঘাতিক জীবের পাল্লায় পড়ে গেছি। শুধু সাংঘাতিক হলেও কথা ছিল, এরা বুঝি বাস্তব পৃথিবীর কেউ নয়—রূপকথার এক ভুতুড়ে এলাকার বাসিন্দা। হয়তো মানুষ দেখলেই এদের জিব লকলক করে ওঠে।.....

'কয়েক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলুম। না, ভয়ে পেয়ে পালিয়ে যাবার পাত্র আমি নই। আমার কোমরে রীতিমত একটা অটোমেটিক রিভলভার আছে। কিন্তুত

প্রাণীগুলো যদি আমার ওপর হামলা করে, যা থাকে বরাতে, গুলি আমি ছুঁড়বই। তাতে এদের গায়ে গুলি বিঁধবে কিংবা এরা ভড়কে যাবে কিনা সেটা কোন কথা নয়, কথা হল যে অন্তত আমার সাহস বাড়বে গুলির শব্দে।

'হুঁ ভয়ের সময় শব্দ একটা শক্তিশালী ব্যাপার। রাতবিরেতে একা কোথাও ভয় পেলে নিজের কাশির শব্দ কিংবা চেঁচিয়ে কথা বলা, অথবা গান করা মোক্ষম কাজ দেয়। সাহস ফিরে আসে। তাই না?'

মেজর হরগোবিন্দ সিংহ আমাদের দুজনের কাছে সায় চেয়ে একটু হাসলেন। আমি সায় দিয়ে বললুম, 'ঠিকই বলেছেন। তা আপনি কি সত্যি সত্যি রিভলভার করে গুলি ছুঁড়লেন?'

মেজর বললেন, 'আপনার মাথা খারাপ? ব্যাপারটা আসলে যাকে বলে হ্যালুসিনেশান—মনের ভুল থেকেই চোখের ভুল আর কানের ভুল। তিব্বতের বৌদ্ধ গুম্ফাগুলোর নতুন লোককে এভাবে ভড়কে দেয়। ওসব গুম্ফা মহাযানী সম্প্রদায়ের বৌদ্ধদের প্রার্থনাঘর। মহাযানীরা তন্ত্রমন্ত্র, গুপ্তবিদ্যা বা অকাল্টের চর্চা করে। এসবের সাহায্যে নাকি তারা অলৌকিক শক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। কর্নেল সরকার, আপনি নিশ্চয় মাদাম ব্লাভাৎস্কির কাণ্ডকারখানা জানেন?

আমার 'ফ্রেন্ড ফিলসফার অ্যান্ড গাইড' স্বনামধন্য বুড়ো ঘুঘুমশাই চোখ বুজে ইজিচেয়ারে আরামে বসে চুরুট টানছেন। গলার ভেতর শুধু একটা অস্পষ্ট শব্দ করলেন।

মেজর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মাদাম ব্লাভাৎস্কি উনিশ শতকে সারা পৃথিবীতে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়েছিলেন। মাদ্রাজের কাছে তিনি প্রেত-চর্চার একটা আখড়াও বানিয়েছিলেন। মাদাম বলতেন, তিব্বতের রহস্যময় সাধুরা তাঁর গুরু। এক গুরুর নাম ছিল কুট হুমি। অদ্ভুত নাম। এই গুরু দিব্যশরীরে চোখের পলকে তাঁর কাছে নাকি হাজির হতেন। কখনও মাদামে প্রেত-চর্চার আসরে শূন্য থেকে ছিটকে পড়ত গুরুদেবের চিঠি। এসব চিঠিকে উনি বলতেন মাস্টার লেটারস। তবে ভারতে স্বাধীনতাবোধক, স্বদেশপ্রীতি এবং আত্মমর্যাদার জ্ঞান সঞ্চার মাদামের প্রেরণা অনেক! সেজন্যেই তিনি ভারতে ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয়া। এই রুশ মহিলার কাছে সত্যি আমরা ঋণী।

এবার ঘুঘুমশায় শ্রীযুক্ত কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের কথা শোনা গেল। চোখ বন্ধ। ঠোঁটের ফাঁকে চুরুট। সাদা দাড়ি চুলকে বললেন, হুঁম! মাদাম ব্লাভাৎস্কি রাশিয়া থেকে ভাগ্যের খোঁজে মার্কিনমুলুকে পাড়ে জমান। যখন নিউইয়র্কে গুছিয়ে বসেন, তখন বয়স ছিল বিয়াল্লিশ। ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর তাঁর বাড়িতে এক ভদ্রলোক মিশরের মমিভূত হাজির করেন। তখনই থিওজফিক্যাল সোসাইটি নামে সর্বপ্রথম একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। সেই সন্ধ্যাতেই। তবে যাই রটুক, মাদাম কদাচ তিব্বতে যাননি।

মেজর বললেন, বলেন কী! আপনি তাহলে এসব মানেন?

কী সব?

অলৌকিক শক্তি—ভূতপ্রেত?

মানি বৈকি।

এবার আমার অবাক হবার পালা। জানি সর্ববিষয়ে, প্রাজ্ঞ এবং সবকিছুতে নাক গলানো এই ধুরন্ধর গোয়েন্দা ভদ্রলোকের জুড়ি নেই কোথাও। কিন্তু উনি নিজেও ভূত-প্রেত-ত্রৈত বিশ্বাস করেন, জানা ছিল না তো! বললুম, কর্নেল নিশ্চয় রসিকতা করছেন?

আমার বৃদ্ধ বন্ধু গম্ভীর মুখে বললেন, ডার্লিং। তুমি নিশ্চয় শেক্সপীয়ার পড়েছ। শেক্সপীয়ারের মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই : এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন অনেক ব্যাপার আছে, যাতে মানুষের আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে। জয়ন্ত, রবি ঠাকুরও বলেছেন, বিপুলা এ পৃথিবীতে কতটুকু জানি!

মেজরসায়েব হতাশ ও বিরক্ত হয়ে বাঁকা মুখে বললেন, আপনাকে আমি যুক্তিবাদী মানুষ ভেবেছিলুম। বোঝা যাচ্ছে মাদাম ব্লাভাৎস্কির কাণ্ডকারখানা আপনি সত্যি বলে মানেন। অথচ দেখুন, লণ্ডনের আত্মা-সংক্রান্ত গবেষণা সমিতির পক্ষ থেকে মাদামের ক্রিয়াকলাপের তদন্ত করে বলা হয়েছিল সব জোচ্চুরি। ইতিহাসে এই মহিলার মত ধূর্ত ঠগ আর দেখা যায়নি।

কর্নেল মৃদুহাস্যে বললেন, হুঁম। লণ্ডনের এই সমিতির সদস্য ছিলেন কবি টেনিসন, উইলিয়াম জেমস প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিরা। আর ওঁদের পক্ষ থেকে যিনি তদন্ত করেন, তার নাম রিচার্ড হজসন। মাদ্রাজের কাছে বঙ্গোপসাগরের তীরে আডিয়ারে মাদারের আখড়ায় তিনি এসেছিলেন। এটা ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের কথা।

মেজর হরগোবিন্দ বললেন, এত জেনেও আপনি অকাল্টে বিশ্বাস করেন? আশ্চর্য!

তারপর যেন ক্রুদ্ধ হয়েই উঠে দাঁড়ালেন। টুপিটি মাথায় চাপিয়ে এবং ছড়িটি তুলে নিয়ে ভদ্রতাসূচক বিদায় সম্ভাষণ না করেই ঘর থেকে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।

কর্নেল বললেন, জয়ন্ত! দরজাটা বন্ধ করে এস। শুয়ে পড়া যাক।

আদেশ পালন করে এসে বললুম, লোকটা ভারি অভদ্র তো!

হুঁম। সেজন্যে হরগোবিন্দের বদলে ওঁকে বলা যায় মেজর গোঁয়ারগোবিন্দ। বলে কর্নেল হাসতে হাসতে বিছানার দিকে পা বাড়ালেন।

বাথরুম থেকে ফিরে পোশাক বদলানোর সময় লক্ষ্য করলুম, কর্নেল নাক ডাকছে।

গ্যাংটক থেকে প্রায় একশো মাইল দূরে তিব্বত-সীমান্তে হিমালয়ের বুকে এই বাংলোটা সড়ক দফতরের। পেছনে খাড়া পাহাড় নেমে গেছে লাচেন চু নদীতে। তার ওপারে ঢালু হয়ে উঠে গেছে আরও পাহাড়। চিরতুষারের এলাকা ওদিকে।

বিকেলে নদীর ওপারের পাহাড়ে একটা গুম্ফা দেখেছিলুম। সেই নিয়ে কথা শুরু। মেজর হরগোবিন্দ আমাদের সঙ্গী নন। তিনি আগেই এসেছেন। যেচে পড়ে আলাপ করেছেন। কর্নেল এবং উনি দুজনেই সমরবিভাগের লোক। দুজনেই রিটায়ার করেছেন। অতএব দুজনের মধ্যে ভাব হতে দেরি হয়নি।

কিন্তু যেভাবে চটেমটে চলে গেলেন, আমার বিশ্বাস, কাল সকাল থেকে উনি

আর কর্নেলের মুখদর্শনও করবেন না। কাল সকালে তিনজনে মিলে নদী পেরিয়ে ওই গুম্ফা দেখতে যাবার কথা। মনে হচ্ছে, মেজর যদি যান, অন্যসময় একা-একা যাবেন।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তারপর দেখি, এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। একটা রাক্ষুসে চেহারার প্রাণী, কতকটা মানুষের মত দেখতে, হাঁ করে আমার দিকে তেড়ে আসছে। ভয় পেয়ে চেঁচাবার চেষ্টা করলুম। গলা থেকে আওয়াজ বেরোল না। প্রাণীটা অদ্ভুত গর্জন করতে লাগল। কোথাও ঘণ্টা বেজে উঠল।.....

তারপর ঘুম ভেঙে গেল। বুঝলুম, দুঃস্বপ্ন নিছক। কিন্তু বাইরে কিছু ঘটছে। একটা হুলস্থূল কাণ্ড বেধে গেছে যেন। হুঁ, ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য। সত্যি সত্যি কোথায় একটা ঘণ্টা বেজে চলেছে ঢং ঢং করে। ঘণ্টার শব্দটা বাড়ছে এবং কমছে। কখনও মনে হচ্ছে, বাইরে নয়, আমার মাথার ভেতরই বাজছে ঘণ্টাটা।

অতিষ্ঠ হয়ে ডাকলুম, কর্নেল! কর্নেল!

কর্নেলের সাড়া এল ওপাশের বিছানা থেকে।.......কী জয়ন্ত? ভয় পেলে নাকি?

ভয় পাবার কী আছে? ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে শুনছেন না?

হুঁম, শুনছি।

ঘণ্টা বাজছে কোথায় বলুন তো?

নদীর ওপারে সেই গুম্ফায়।

কিন্তু ওখানে তো শুনেছি কেউ থাকে না।

ঠিকই শুনেছ, ডার্লিং।

তাহলে ওখানে এ দুর্যোগে ঘণ্টা বাজাচ্ছে কে? কেনই বা বাজাচ্ছে?

জয়ন্ত, তখন বলছিলুম, পৃথিবীতে এখনও অনেক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে এবং আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়।

বিরক্ত হয়ে বললুম, তাহলে ভূতে ঘণ্টা বাজাচ্ছে বলতে চান?

কর্নেল যেন আপন মনে বললেন, ঝড়বৃষ্টি দুযোর্গের রাতেই ওরা জেগে ওঠে। যত অশরীরী অতৃপ্ত আত্মারা এই গুম্ফায় গিয়ে প্রার্থনা করে। ওরা মুক্তি চায়। নিছক মুক্তি নয়, বৌদ্ধধর্ম যাকে বলে মহাপরিনির্বাণ। তারপর তার জন্ম নেই, জরা ব্যাধি নেই, মৃত্যু নেই। আহা! সে কী খাসা অবস্থা।

তারপর আচমকা ওঁর নাকডাকা শুরু হল ফের। আমার আর ঘুম হল না। ঝড়ের দাপটে বাংলোটা কেঁপে উঠছিল। ভয় হচ্ছিল, উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে হাজার ফুট গভীর নদীতে ফেলে দেবে।

আর সেই অদ্ভুত ঘণ্টার শব্দ একটানা শোনা যাচ্ছিল। কখনও মৃদু কখনও তীব্র। এমন অস্বস্তিকর রাত জীবনে আসেনি।

মেজরের অন্তর্ধান রহস্য

সকালে ঘুম ভেঙে দিখে, গোয়েন্দাপ্রবর যথারীতি প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। বাইরে আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার। বিশ্বাস হয় না, রাতে অমন ঝড়জল হয়েছে।

তবে গাছপালা ঝোপঝাড়ের রং খুলে গেছে। একটু পরেই কর্নেল ফিরলেন। বললেন, দুঃসংবাদ ডার্লিং! লাচেন চু নদীতে রাতারাতি জল বেড়ে গেছে। জল না কমলে ওপারের গুম্ফা দেখতে পাওয়া যাবে না। তবে তার চেয়েও দুঃসংবাদ, আমাদের মেজরসায়েবের পাত্তা নেই। চৌকিদার যা বললেন, তা ভারি অদ্ভুত। বেড-টি দিতে গিয়ে দেখে, ওঁর ঘরের দরজা খোলা। বিছানা লণ্ডভণ্ড। মেঝেয় একপাটি আর দরজার কাছে একপাটি স্লিপার পড়ে আছে। কেউ বা কারা তাঁকে জবরদস্তি ধরে নিয়ে গেছে।

সে কী! বলে হন্তদন্ত পা বাড়ালুম।

কর্নেল আমার হতে ধরে বাধা দিয়ে বললেন, ঝুটঝামেলায় গিয়ে লাভ কী জয়ন্ত? চৌকিদার থানায় গেছে। পুলিশ এসে ও নিয়ে মাথা ঘামাক। বরং চলো, বাজারের দিকে গিয়ে কোথাও ব্রেকফাস্ট করা যাক। খিদে পেয়েছে।

পুলিশ তো আমাদেরও জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করবে!

যখন করবে, যা জানি বলব। এখন চলো, খালি পেটে কেবল ভাবনা বাড়ে।

পা বাড়িয়ে বললুম, কিন্তু আমারা তো কিছু জানি নে এ ব্যাপারে।

কর্নেল দরজায় তালা এঁটে বললেন, নদীর ধারে এক জায়গায় দেখলুম পাথরের গা বেয়ে অজস্র অর্কিড গজিয়েছে। এসব অর্কিডের এখন ফুল ফোটে। অবিশ্বাস্য সে দৃশ্য ডার্লিং! ফুলের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতি উড়ছে। নীল পাখনায় কালো ফুটকিওলা একজাতের প্রজাপতি দেখলুম। আমার সংগ্রহে এ প্রজাপতি নেই।

আঁতকে উঠে বললুম, সর্বনাশ! আমি আপনার পেছন পেছন ছুটোছুটি করে বেড়াতে পারব না বলে দিচ্ছি।

মেজরের ঘরটা বাংলোর পেছন দিকে। গেট থেকে দেখা যায় না। খুব কৌতূহল ছিল। কিন্তু কর্নেল যেন তা টের পেয়েই আমার কাঁধ ধরে একরকম ঠেলে নিয়ে চললেন। ঘোরালো পথ ধীরে ধীরে নেমেছে উপত্যকার সমতলে। পিচের রাস্তায় কিছুটা হেঁটে বাজারে পৌঁছলুম। ছোট বাজার ভিড়ভাট্টা নেই। একটা চায়ের দোকানে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে খেয়ে নিলুম আমরা। তারপর ডাইনে একটা সবুজ ঘাসে ঢাকা মাঠ পেরিয়ে যেখানে পৌঁছলুম, সেখানে অজস্র পাথর এলোমলো পড়ে আছে। যেন কোন ঐতিহাসিক প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

পাথরগুলোর ভেতর দিয়ে সঙ্কীর্ণ পায়েচলা পথ। নদীর ধারে পৌঁছে কর্নেল এদিক ওদিক দেখে নিয়ে হঠাৎ চাপাগলায় বললেন, বসে পড়ো, বসে পড়ো!

একটা পাথরের আড়ালে আমাকে টেনে বসিয়ে দিয়ে উনি গলায় ঝুলন্ত বাইনোকুলারটা চোখে রেখে নদীর ওপারে কিছু দেখতে থাকসেন। জিজ্ঞেস করলুম, ব্যাপারটা কী?

কর্নেল মুচকি হেসে বাইনোকুলারটা আমাকে দিলেন। চোখে রেখে যা দেখলুম, তাতে আমি হতভম্ব। নদীর ওপারে পাহাড়ের গায়ে একটা চওড়া চাতালে দাঁড়িয়ে আছে দুটো লোক। তাদের একজন স্বয়ং মেজর হরগোবিন্দ। মুখের চেহারা অস্পষ্ট বলে দ্বিতীয় লোকটিকে চিনতে পারলুম না। দুজনে কী যেন পরামর্শ চলেছে।

কর্নেল বললেন, মেজরসায়েব কার সঙ্গে কথা বলছেন, চিনতে পারছ তো জয়ন্ত?

বললুম, না তো। কে ও? ওকে কি কোথাও দেখেছি?

দেখেছ ডার্লিং! আশাকরি, গ্যাংটকের সেই ম্যাজিসিয়ানটিকে তোমার মনে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল। আসার পথে গ্যাংটকে রাস্তার ধারে খোলামেলায় আশ্চর্য কিছু ম্যাজিক দেখেছিলুম। চারধারে লোকের চোখের পাহারা। তার মধ্যে সেই জাদুকর তাক লাগানো খেলা দেখাচ্ছিল। খেলা ভাঙলে কর্নেল তার সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। বুড়ো মাঝে মাঝে যেন কেমন শিশু হয়ে ওঠেন। ম্যাজিক দেখে সে কী খুশি! ম্যাজিসিয়ানকে দশ টাকা বখশিস পর্যন্ত দিয়ে বসলেন।

লোকটা এখন মেজর হরগোবিন্দ সিংয়ের সঙ্গে কথা বলছে নদীর ওপারে এক দুর্গম জায়গায়। আর মেজর ভদ্রলোক নাকি নিখোঁজ হয়েছেন। ঘরের বিছানা লণ্ডভণ্ড। পায়ের চটি ছিটকে পড়েছে। কারা জবরদস্তি ধরে নিয়ে গেছে।

মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না। গুম হয়ে আছি দেখে কর্নেল বললেন, কিছু বুঝলে জয়ন্ত?

একটুও না। আপনি বুঝেছেন কি?

নাঃ, অতএব ব্যাপারটা বোঝা দরকার। চলো জয়ন্ত, ওপারে যাই।

যাবেন কীভাবে? নদীতে এখন বান যে।

কর্নেল বললেন, মাইলটাকে উজানে একটা দড়ির সাঁকো আছে। এস। কিন্তু সাবধান! পাথরের আড়ালে আড়ালে আমাদের যেতে হবে।

যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম, খালি চোখেও দেখা যাচ্ছে ওপাশের পাহাড়ের চাতালে দুটি ছোট্ট আবছা মূর্তি।

গুম্ফায় 'মারে'র আবির্ভাব

আমার বৃদ্ধ বন্ধুটির শারীরিক দক্ষতা দেখলে তাক লেগে যাবে। ভাগ্যিস ছাত্রজীবনে মাউন্টেনিয়ারিংয়ে ভাল ট্রেনিং নিয়েছিলুম এবং বার দুই পর্বত অভিযানে দৈনিক সত্যসেবকের পক্ষ থেকে সাংবাদিক হিসেবে যোগ দিয়েছিলুম। প্রাণান্তকর রজ্জু-সেতু পেরিয়ে বিস্তর পাহাড়ী গোলক-ধাঁধায় ঘুরে ঘুরে যখন চাতালের কাছে পৌঁছলুম, তখন আমার অবস্থা শোচনীয়।

মেজর এবং ম্যাজিসিয়ান আমাদের অপেক্ষায় বসে থাকার পাত্র নন। বেমালুম নিপাত্তা হয়ে গেছেন ততক্ষণে। হবেন, এ তো জানা কথা। কর্নেলও কম গোঁয়ার নন দেখা যাচ্ছে।

আমার মনের কথা আঁচ করে গোয়েন্দাপ্রবর বললেন, ডার্লিং। এ বৃদ্ধের প্রতি রুষ্ট হয়ো না। আমরা খুব পবিত্র জায়গায় এসে পৌঁছেছি। হের বৎস, ওই সেই রহস্যময় গুম্ফা—যেখানে ঝড়ের রাতে ঘণ্টা বাজে।

ঘুরে দেখি, আরে তাই তো! ডাইনে একফালি রাস্তার মাথায় গুম্ফা দেখা যাচ্ছে। আমরা উত্তর ঘুরে পূর্বে এসেছি। ওপারে পশ্চিমে আমাদের বাংলোটাও দেখা যাচ্ছে।

কর্নেল চাতাল মত জায়গাটায় চোখ বুলিয়ে বললেন, চলো। আমরা গুম্ফার দিকে যাই। এবেলা আমরা গুম্ফার লামা মহোদয়ের আতিথ্য নেব। ভেবো না, ওঁর

খুব অতিথিবৎসল।

এদিকটায় গাছপালা নেই বললেই হয়। কিছু ঝোপঝাড় আছে। গুম্ফার সামনে প্রকাণ্ড একটা রঙীন প্রার্থনাচক্র। মন্ত্র খোদাই করা আছে। দেখে মনে হল, হাজার বছরের পুরনো। কাঠের বায়ান্দায় উটতেই এক প্রৌঢ় লামা হাসিমুখে হিন্দীতে বললেন, আইয়ে! আইয়ে! কাঁহাসে আতে হ্যায় আপলোক?

আলাপ-পরিচয়ের পর ভেতরে নিয়ে গেলেন। চৌকো প্রশস্ত ঘর। সামনে বেদির ওপর বিশাল বুদ্ধিমূর্তি। কিন্তু দুধারে দেয়াল-ঘেঁষে দাঁড় করানো মূর্তিগুলো দেখে চমকে উঠলুম। মেজরসায়েব ঠিক এমনি বর্ণনা দিয়েছিলেন মনে পড়ল। বিকট সব মূর্তি সারবেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। ছাদের ওপর দিক থেকে সূর্যের আলো এসে পড়েছে ঘরে। নইলে অন্ধকার জমে থাকত।

পাশের একটা ঘরে নিয়ে গেলেন লামা। আমরা মেঝেয় বসলুম। উনি কাঠের আসনে বসে বললেন, আমি সকালে আসি। সন্ধ্যার আগে চলে যাই। ওপর দিকে নতুন গুম্ফোয় আমরা অনেকে মিলে থাকি। এই গুম্ফাটা দেখাশোনার দায়িত্ব আমার ওপর। তাই রোজ আসতে হয়।

কর্নেল বললেন, শুনেছি, এ গুম্ফায় রাত থাকলে বিপদ ঘটে। তা কি সত্যি?

লামা একটু হেসে, বললেন, হ্যাঁ। এ গুম্ফায় 'মার' ঢুকেছে। 'মার' হল গিয়ে অমঙ্গলের শক্তি। আমরা অনেক প্রার্থনা করেও তাকে তাড়াতে পারিনি। গত বছরেও একজন লামা জোর করে এখানে রাত কাটাতে এসে মারা পড়েন।

বলেন কী? বলে কর্নেল আমার দিকে তাকালেন একবার। যেন বললেন, শুনছ তো?

লামা গম্ভীর হয়ে বললেন, এমন কি দিনেও 'মার' কখনও কখনও দেখা দেয় এ গুম্ফায়। খুব সাহসী না হলে এখানে দিনেও থাকা কঠিন। এই তো, আজ সকালে যখন দরজা খুলে ঢুকলুম, স্পষ্ট দেখলুম 'মার' দাঁড়িয়ে আছে। বিকট তার মূর্তি। জোরে মন্ত্র পড়তে শুরু করলুম, তখন অদৃশ্য হয়ে গেল। আসলে গুম্ফার ছাদের মাথায় ওই যে দেখলাম সূর্যের আলো ঢোকার ব্যবস্থা, ওটাই 'মার'কে দিনে দুর্বল করে রাখে। মার অন্ধকারের শক্তি কিনা! যাক্‌গে, আপনারা ক্ষুধার্ত। আপনাদের সেবার অনুমতি দিন।

লামা একটা বেতের ঝড়ি থেকে চাপাটি, দুধ আর ফল বের করলেন। ক্ষিদে পেয়েছিল প্রচণ্ড। গোগ্রাসে খেলুম। কোনার দিকে ফায়ারপ্লেসও রয়েছে। সেখানে আগুনের কুণ্ড জ্বেলে চা তৈরি করলেন লামা। চা খেয়ে ক্লান্তিটা চলে গেল। কর্নেল বললেন, আমরা প্রার্থনাঘরটা এবার দেখতে চাই।

লামা বললেন, নিশ্চয়। চলুন। আমি এখন ওঘরে প্রার্থনায় বসব।

প্রার্থনাঘরে ঢুকেই লামা হঠাৎ চমকে উঠলেন। তারপর কাঁপা কাঁপা গলায় মন্ত্র পড়তে থাকলেন। কর্নেল আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন, দেখতে পাচ্ছ জয়ন্ত?

সূর্য নিশ্চয় পশ্চিমে একটু ঢলেছে। ছাদের সেই জায়গাটা দিয়ে রোদ সোজাসুজি ঢুকছে না। তার ফলে ঘরের ভেতরটা এখন অস্পষ্ট। আবছায়ার মত কী একটা

দাঁড়িয়ে আছে বেদির তলার দিকে। অবিকল মানুষের মত একটা কালো মূর্তি। দেখামাত্র আমার হৃদপিণ্ডে রক্ত চলকে উঠল। যা দেখছি তা কি সত্যি? কারণ মূর্তিটা আসলে মেঝে থেকে দু'ফুট উঁচুতে শূন্যে ভাসছে এবং দুলছে।

তারপরই বাইরে একটা শনশন শব্দ উঠল। প্রার্থনাঘরের দরজাগুলো মচমচ করে উঠল এবং বাইরে থেকে ঝড়ো হাওয়া এসে ঢুকল ঘরে। ছাদের ঘুলঘুলিতে যেটুকু আলো আসছিল, হঠাৎ তাও বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকার ঘরটা ভরে গেল। তারপর কড় কড় কড়াৎ করে বাজ বড়ল কোথায়। মেঘ ডাকতে থাকল। দরজা দিয়ে বিদ্যুতের ঝিলিক ঢুকল ঘরে মুহুর্মুহু। তাই দেখলুম, শূন্যে দাঁড়ানো মূর্তিটা ভীষণ দুলছে। তারপর শুরু হয়ে গেল বুক হিম করা সেই ঘণ্টাধ্বনি—কাল রাতের মত। ঢং ঢং ঢং ঢং.......কখনও তীব্র, কখনও মৃদু। তার তালে তালে রহস্যময় ছায়ামূর্তি দুলতে থাকল।

লামার চিৎকার শুনলুম, পালিয়ে আসুন! পালিয়ে আসুন!

কর্নেল আমার কাঁধ আঁকড়ে বলে উঠলেন, নড়ো না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকো।

লামাকে ছিটকে বড় দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেখলুম। সেই সঙ্গে চোখে পড়ল, বাইরে তুমুল ঝড়বৃষ্টি চলেছে। কাঠের তৈরি প্রাচীন গুম্ফা মচমচ করে কাঁপছে।

বেদির ওখানে 'মার'কে আর দেখতে পেলুম না। সে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। এদিকে ঘনঘন বাজ হাঁকড়াচ্ছে। কানে তালা ধরে যাচ্ছে মেঘের গর্জনে। বিদ্যুতের তীব্র ছটা এসে ঢুকছে ঘরের ভেতরে। ভয়ে চোখ বুজে ফেলছি। বিকট মূর্তিগুলো যেন এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

কতক্ষণ মারের সেই উপদ্রব চলল বলা কঠিন। যখন সব শান্ত হল, তখন কর্নেল ফিসফিস করে বললেন, এস জয়ন্ত! লামার ঘরে একটা হ্যারিকেন দেখেছি। সেটা জ্বেলে নিয়ে আসি।

হ্যারিকেনটা জ্বেলে দুজনে প্রার্থনাঘরে ফিরে এলুম। বিকট মূর্তিগুলোকে সেই আলোয় বড় ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। কর্নেল কী করতে চান, বুঝতে পারছিলুম না। বুদ্ধমূর্তির কাছে গিয়ে উনি হঠাৎ অস্ফুটস্বরে বলে উঠলেন, সর্বনাশ! মার বেচারা এখানে পড়ে আছে দেখছি!

বেদির নিচে বাঁদিকে একটা মূর্তির পায়ের কাছে উপুড় হয়ে কেউ পড়ে আছে। কর্নেল বললেন, আলোটা ধরো তো জয়ন্ত। দেখি লোকটা কে!

মুখটা ঘুরিয়ে দিতেই চমকে উঠে বললুম, মেজর হরগোবিন্দ যে!

কর্নেল গুম হয়ে বললেন, বেচারা মারা পড়েছেন জয়ন্ত।

তাহলে যাকে দেখে মার ভেবে লামা ভয়ে পেয়ে পালিয়ে গেলেন এবং আমারও হৃৎকম্প হচ্ছিল, সে আসলে মেজরসাহেব! কিন্তু আশ্চর্য, ওঁকে শূন্যে দাঁড়ানো দেখছিলুম কেন?

কর্নেল হ্যারিকেন তুলে ছাদের দিকটা দেখছিলেন। বললেন, হুঁম। এই দেখ জয়ন্ত। কড়িকাঠের আংটা থেকে একটা ছেঁড়া দড়ি ঝুলছে। আমরা যখন ওপাশের ঘরে লামার কাছে ছিলুম, তখনই ওঁকে কেউ বা কারা খুন করে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছিল এখানে। দড়িটা ছিঁড়ে মেজরসায়েবের মড়া পড়ে গেছে। আমরা যাতে

ভয় পেয়ে গুম্ফা থেকে পালিয়ে যাই, তার জন্যে এই কাণ্ড করা হয়েছিল।

কর্নেল বিশাল বেদির ওপর উঠে গেলেন। তারপর উত্তেজিতভাবে ডাকলেন, দেখে যাও জয়ন্ত।

গিয়ে দেখি, বুদ্ধমূর্তির পিঠের দিকটা ভাঙা এবং মূর্তির খোলের মধ্যে কতকালের পুরোনো একগাদা পুঁথি তছনছ অবস্থায় রয়েছে। কেউ বা কারা মরিয়া হয়ে কিছু হাতড়েছে। গুপ্তধন ছিল নাকি?

বললুম, কর্নেল, মেজরকে খুন করে সেই ম্যাজিসিয়ান ব্যাটা গুপ্তধন হাতিয়ে পালিয়েছে। তাছাড়া আর কোন ব্যাখ্যা হয় না। আমার মনে হচ্ছে......

বুটের শব্দ তুলে একদঙ্গল পুলিশ ঢুকছিল গুম্ফায়। কর্নেল ভারী গলায় বললেন, আমাদের দুর্ভাগ্য মিস্টার শর্মা! যা ঘটবার ঘটে গেছে।

শেষ চমক

পরদিন সকালে বাংলোর বারন্দায় বসে কর্নেলের কাছে রহস্যকথা শুনছি, পুলিশ অফিসার মিঃ প্রভুদয়াল শর্মা এলেন। বললেন, এইমাত্র মর্গ থেকে আসছি। আশ্চর্য ব্যাপার কর্নেল, ডেডবডির মুখে......

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, নকল দাড়ি। অর্থাৎ মড়াটা মেজরের নয়। ম্যাজিসিয়ান তোতিরামের।

মিঃ শর্মা অবাক হয়ে বললেন, জানতেন নাকি? তখন তো বলেন নি!

বললে পুলিশমহলে রটতো। হরগোবিন্দ সাবধান হয়ে যেত। তাকে ধরতে পারতেন না সহজে। বলে কর্নেল চুরুট ধরাতে মন দিলেন।

শর্মা বললেন, হরগোবিন্দ ধরা পড়েছে গ্যাংটকে। সে মোটেই মিলিটারির লোক নয়। খুব পুরনো দাগী। তোতিরামের কাছে তিব্বতী গুপ্তবিদ্যার পুঁথি ছিল একটা। তাতে এই গুম্ফার বুদ্ধমূর্তির ভেতরে একটি পদ্মরাগ মণির হদিস ছিল। তোতিরামের একা সাহস হয় নি। তাই হরগোবিন্দের সাহায্য নিয়েছিল। তবে হরগোবিন্দ চালটা চেলেছিল ভাল। তাকে কেউ ধরে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে, এই ব্যাপারটা তাকে আত্মগোপনের সময় দিত অনেকখানি। ভাগ্যিস, আপনি টের পেয়েছিলেন!

কর্নেল বললেন, পরশু রাতে ঝড়ের আগে বাইরে পায়ের শব্দ শুনে উঁকি মেরে দেখি, 'মেজরসায়েব' এবং তোতিরাম বাংলো থেকে নেমে যাচ্ছে। বারান্দার আলো পড়েছিল লনে। তা না হলে কিছু টের পেতুম না।

বললুম, কিন্তু ঝড়ের সময় ঘণ্টা কোথায় বাজে?

কর্নেল বললেন, গুম্ফার ভেতর ছাদে ঝুলন্ত ঘণ্টাটা ঝড়ের ধাক্কায় দোলে।...

প্রতিবিম্ব

এই বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সানফ্রান্সিস্কোতে। সেখানে যে মার্কিন সাহিত্যিকের বাড়ি অতিথি ছিলুম, তিনি এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই পরিচয় থেকে আলাপ এবং আলাপ থেকে বন্ধুত্বে পৌছতে কয়েক মিনিট লেগেছিল।

বন্ধুত্ব বলছি, অথচ ইনি আমার বাবার বয়সী মানুষ। নাম ডঃ পিটার এরিখসন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আণবিক জীববিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। ঢ্যাঙা, রোগাটে গড়নের মানুষ। প্রায় সওয়া ছ'ফুট উঁচু; একটু কুঁজো হয়ে হাঁটেন। আস্তে আস্তে কথা বলেন। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। কিন্তু কথা বলতে বলতে হঠাৎ আনমনা হয়ে যান। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকেন। হয়তো বিজ্ঞানীদের এই স্বভাব। আলাপে জানা গেছে উনি একসময় কয়েকবছর ভারতে ছিলেন গবেষণার কাজে। দক্ষিণ ভারতে বাঁদর নিয়ে কী সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। এর ফলে আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। বলেছিলেন, 'চলুন না আমার সঙ্গে একটা চমৎকার জায়গায়। আপনার খুব ভাল লাগারই কথা। একটু দূরে অবশ্য। তাতে কী? আপনি তো আমেরিকা ঘুরতেই বেরিয়েছেন।'

তক্ষুনি রাজি। দুপুরে খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়েছিলুম ওঁর সঙ্গে। সাহিত্যিক ভদ্রলোক তাঁর গাড়িতে সানফ্রান্সিসকো উপসাগরের লম্বা সাঁকো পেরিয়ে ওকল্যান্ড স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেলেন। এই রেলপথের নাম অ্যামট্রাক। উপসাগরের কিনারা ধরে এগিয়ে একটা নদীর পাড় ঘেঁষে চলেছে। রিভারিয়া নামে একটা স্টেশনে পৌঁছতে ঘণ্টাখানেক লাগল। নেমে ডঃ এরিখসন বললেন, 'এখান থেকে শুরু হল মার্শাল্যান্ড এলাকা। মাইলের পর মাইল জলাভূমি। রিডঘাস, ক্যাপিয়াস, নলখাগড়া জাতীয় জঙ্গল গজিয়ে রয়েছে সবখানে—তার ফাঁকে ফাঁকে জল। কোথাও কোথাও জলের বিস্তার দেখে সমুদ্র বলে মনে হবে। পাখির রাজত্ব বলতে পারেন।'

অবাক হয়ে বললুম. 'জলাভূমিতে মানুষের বসবাস আছে নাকি?'

এরিখসন হাসলেন। 'অনেক জায়গায় জলটুঙ্গির মতো উঁচু মাটির ছোট্ট দ্বীপ আছে। দ্বীপগুলোতে একটা করে বাড়ি। পয়সাওয়ালা লোকেরা দ্বীপ কিনে বাড়ি বানিয়েছে।'

'আপনিও বানিয়েছেন তাহলে?'

'হ্যাঁ। তবে ওটা বাড়ির চেয়ে গবেষণাগার বলাই ভাল। ছুটিছাটায় ওখানে গিয়ে থাকি। মাথায় যেসব উদ্ভট-উদ্ভট চিন্তা গজায়, তাই নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি।'

উদ্ভট বলছেন কেন? আমার ধারণা, বিজ্ঞানীদের কোনো চিন্তাই উদ্ভট নয়।

হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিলুম আমরা। ওভারব্রিজ পেরিয়ে নদীর ধারে জেটিতে পৌঁছে দেখি, অসংখ্য মোটরবোট, লঞ্চ, স্টিমার, থিকথিক করছে। কিন্তু লোকজন তত নেই কোথাও। এরিখসন একটা মোটরবোট দেখিয়ে বললেন, 'এইটে আমার। আসুন।'

একটু পরে মোটরবোটটা চলতে থাকল। চাপা গড় গড় আওয়াজ হচ্ছিল। এরিখসন সামনে বসে ড্রাইভ করছেন। আমি ওঁর পেছনে বোটের খোঁদলে আরামদায়ক চেয়ারে বসে রইলুম। নদীপথে মাইলটাক চলার পর বাঁ-দিকে জলাভূমিতে ঢুকল বোট। জলে হাজার হাজার হাঁস ভেসে বেড়াচ্ছে। জলজ জঙ্গলে ওড়াউড়ি করছে ঝাঁকে ঝাঁকে ধূসর রঙের পাখি—চড়ুইয়ের মতো দেখতে। অনেক মাছরাঙা দেখলুম। একটা গাছে সারস দেখলুম অনেকগুলো। পাখিদের রাজত্বই বটে। মোটরবোট দেখে বা তার শব্দে কেউ একটুও ভড়কাল না।

কখনও সমুদ্রের মতো বিশাল জলের বিস্তার, কখনও ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর সংকীর্ণ জলপথের গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতে বিকেল চারটে নাগাদ আমাদের বোট একটা দ্বীপে পৌঁছুল। দ্বীপ বা আইল্যান্ড বলার চাইতে এগুলোকে জলটুঙ্গি বলা ভাল। টুঙ্গির মাথার জঙ্গলের ভেতরে একটা দোতলা ধূসররঙের বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। বাড়ির চাল সবুজ রঙের টালির। একফালি সুন্দর পথ জলের ধারে কাঠের পাটাতন থেকে এগিয়ে গেছে বাড়িটার দিকে। পাটাতনের মাথায় লেখা আছে : এমিলি কটেজ।' তার তলায়, 'আইল্যান্ড নাম্বার ৩৭।'

পাটাতনে উঠে চারদিকে চোখ বুলোচ্ছি, এমন সময় এরিখসন চড়া গলায় অদ্ভুত সুর ধরে ডাকলেন, 'এ-মি-লি! এ-মি-লি।'

তারপর দেখলুম, বাড়ির দিক থেকে সংকীর্ণ রাস্তায় ছুটে আসছে বছর সাত-আট বয়সের একটি সুন্দর মেয়ে। ফুটফুটে সাদা গায়ের রঙ। একমাথা সোনালী চুল। সাদা ও ধূসর ডোরাকাটা ফ্রক পরনে। পায়ের জুতোটা কালো রঙের—কিন্তু কেমন অস্বাভাবিক গড়ন—চৌকো মতো। হাঁটার সময় পায়ে কেমন একটা ধাতব শব্দ হচ্ছিল বলেই জুতোর দিকে চোখ গিয়েছে আমার।

ওর চুলের ওপর মাথার ঠিক মাঝখানে একটা ছোট কাচের টুপি দেখেও অবাক হলুম। এ আবার কি? এমন বিদঘুটে জুতো আর টুপি তো এদেশে কোথাও কাকেও পরতে দেখিনি!

সে ছুটে এসে এরিখসনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এরিখসন বললেন, 'এমিলি। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।' বলে আমার নামধাম জানালেন এমিলিকে। এমিলি নীল দুটো চোখে আমাকে দেখছিল। 'ও আমার মেয়ে এমিলি।' ডঃ এরিখসন একটু হাসলেন আমার দিকে তাকিয়ে।

এমিলি হাত বাড়ল। আমিও বাড়ালুম। হ্যান্ডশেকের সময় হঠাৎ মনে হল ছোট্ট এমিলির হাতে যেন দৈত্যের জোর। আমার হাত গুড়িয়ে যাবে মনে হচ্ছিল। হাত ছাড়াতে গিয়ে দেখলুম, সে ছাড়ছে না এবং খিলখিল করে হাসছে। আমার দফারফা হয়ে আসছে। এরিখসন ব্যাপারটা দেখামাত্র ধমক দিলেন, 'এমিলি! এমিলি! কী হচ্ছে দুষ্টু মেয়ে? খুব হয়েছে। চলো, বাড়ি চলো তো।'

সঙ্গে সঙ্গে এমিলি হাত ছেড়ে হনহন করে হাঁটতে শুরু করল। এরিখসন বললেন, 'আপনি নিশ্চয় অবাক হয়ে গেছেন এই নির্জন দ্বীপে বাড়িতে এমিলিকে দেখে।'

'হয়েছি ডঃ এরিখসন। ও কি এখানে একা থাকে?'

'হ্যাঁ।'

'সে কী!'

এরিখসন একটু হাসলেন। 'এমিলি একটু অসাধারণ মেয়ে বলতে পারেন। ওর গায়ের জোর, বুদ্ধিসুদ্ধি, সবকিছুই ওর বয়সের মেয়েদের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। আপনি কি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আণবিক জীববিজ্ঞানী জাঁকমোদের নাম শুনেছেন?'

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর বি-বি-সি—ব্রিটিশ বেতার সংস্থায় ওঁর ইন্টারভিউয়ে উনি কি বলেছিলেন জানেন? মানুষ যন্ত্র। গবেষণাগারে তৈরি করা যায়।'

আঁতকে উঠে বললুম, 'কী সর্বনাশ। এমিলিকে কি আপনি গবেষণাগারে.....'

আবার থামিয়ে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন এরিখসন! 'না, না! এমিলি আপনার আমার মতো রক্তমাংসে গড়া মানুষ। আমার স্ত্রী ওর জন্মের সময় মারা যান। অনেক যত্নে লালন-পালন করেছি। তবে একটু অসাধারণ প্রকৃতির মেয়ে এই যা।'

'আপনি জাঁকমোদের কথা বললেন যে?'

'একসময় আমি প্যারিসে মোদের সহকারী ছিলুম। মোদের একটা থিওরি হল, মানুষ মূলত যন্ত্র বলেই যন্ত্রের কার্যকারিতা বা শক্তি বাড়ানোর মতো মানুষেরও বাড়ানো যায়। বুদ্ধিসুদ্ধি, গায়ের জোর—সবকিছুই। আপনি নিশ্চয় ক্লোনিং কথাটার মানে জানেন? প্রাণীমাত্রেরই দেহের কোষে ক্রোমোজোম নামে এরকম জিনিস আছে। এ জিনিস জোড়ায় জোড়ায় থাকে। মানুষের আছে তেহশ জোড়া। তো ক্রোমোজোমের ভেতর আছে জিন। জিনগুলো থোকবাঁধা মালার মতো। তার মধ্যে লুকিয়ে আছে প্রাণীটির স্বভাব। যাকে বলা হয় বংশাণু। তার ভেতরে রয়ে গেছে সেগুলো। আপনি ডি এন এর কথা শুনে থাকবেন। তো এই ডি এন এ এবং সামগ্রিকভাবে জিনের হেরফের ঘটানো সম্ভব। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে এই পদ্ধতিকে। এই পদ্ধতির সাহায্যে জিনে ওইরকম হেরফের ঘটিয়ে পছন্দ মতো আকৃতি-প্রকৃতির মানুষ সৃষ্টি করার নাম ক্লোনিং। ধরুন, এভাবে অসংখ্য রবীন্দ্রনাথ কিংবা অসংখ্য হিটলার সৃষ্টি করা যায়।'

বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ডঃ এরিখসন বললেন, 'আপনার কান ঝালাপালা করে ফেললুম। ভেতরে আসুন।'

সত্যি কান ঝালাপালা হয়ে গেছে আমার। মাথা ভোঁ ভোঁ করছে এসব কথা শুনে। দরজা খুলে এরিখসন ভেতরে ঢুকলেন। আমি ওঁর পেছনে। ঢুকে মনে হল যেন একটা পোড়ো বাড়ি। আসবাবপত্র কতকালের পুরনো। ঝুলকালি জমে আছে। কেমন একটা ভ্যাপসা গন্ধও পাচ্ছি। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে গিয়ে যে ঘরে ঢুকলুম, সেটা পরিচ্ছন্ন দেখে আশ্বস্ত হলুম। এরিখসন বললেন, আরাম করে বসুন। আমি কফির ব্যবস্থা করি।'

উনি চলে গেলে পেছনের দরজা খুলে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালুম। উঁচুতে আছি বলে চারদিকে বিস্তীর্ণ জলা-জঙ্গল দেখা যাচ্ছিল। সূর্য গড়িয়ে পড়েছে পশ্চিমে। হাল্কা গোলাপী রোদ্দুর পড়েছে। ভারি সুন্দর জায়গা বটে। চোখ জুড়িয়ে গেল দেখে।

তারপর চোখ গেল জলার ধারে। একটা পাথরে দাঁড়িয়ে আছে এমিলি। একা ওখানে কি করছে মেয়েটা? এ বাড়িতে একা থাকেই বা কেমন করে? এতটুকু মেয়ে? খাওয়া-দাওয়ার অবশ্য অসুবিধে থাকার কথা নয়। প্যাকেট ফুড, দুধ, ফলের রস সারা বছরের জন্যে ঘরে রাখা যায়। রান্নাকরা খাবারের ধার ধারে না এদেশের লোক।

হঠাৎ এমিলি এদিকে ঘুরে দাঁড়াল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হেসে হাত নাড়ল। আমিও নাড়লুম। তারপর সে কয়েক পা এগিয়ে এসে বলল, এই লোকটা! এস না এখানে! তোমায় একটা জিনিস দেখাব।'

ব্যালকনির শেষপ্রান্তে কাঠের সিঁড়ি ঘোরালো হয়ে নেমে গেছে। বাড়ির পেছনদিক এটা। নেমে গেলুম, ওকে খুঁটিয়ে দেখে ওর অসাধারণত্ব টের পেতেই।

এমিলি জঙ্গলের ভেতর দৌড়ে একটা জায়গায় দাঁড়াল! কাছে গিয়ে দেখি, একটা পাথরের কবর। কবরটা দেখিয়ে সে বোবার মতো তাকিয়ে রইল আমার দিকে। কবরের ফলকে চোখ পড়তেই আমি হতভম্ব হয়ে গেলুম। লেখা আছে : 'এমিলি এরিখসন। জন্ম : ৭ জুন ১৯৪০, মৃত্যু : ১০ অক্টোবর, ১৯৪৮।'

কাঁপা কাঁপা গলায় বললুম, 'ওটা কার কবর এমিলি?'

এমিলি চাপা গলায় শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিল, 'আমার'।

মাথা ঘুরে উঠেছিল। কিন্তু তখনই ডঃ এরিখসনের পায়ের শব্দ শোনা গেল। দৌড়ে এসে বললেন, 'এমিলি? দুষ্টু মেয়ে। ঘরে যাও এক্ষুনি। যাও বলছি।' তারপর আমার হাত ধরে টানলেন। 'আসুন! কফি এনেছি।'

'ও কবর কার ডঃ এরিখসন?'

এরিখসন জবাব দিতে গিয়ে এমিলির দিকে তাকালেন। স্থির, পাথরের মূর্তির মতো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। এরিখসন ধমক দিয়ে বলেন, 'কী হল? চলে এস!'

এমিলির চোখ বুজে এল। তারপর তাকে পড়ে যেতে দেখলুম। ডঃ এরিখসন দুহাতে ধরে ফেললেন মেয়েকে। তারপর ওর মাথায় সেই অদ্ভুত কাচের টুপিটা নাড়াচাড়া করতে থাকলেন। বললুম, 'ফিট হয়ে গেছে। ওকে ঘরে নিয়ে চলুন ডঃ এরিখসন।'

ডঃ এরিখসন গম্ভীর মুখে বললেন, 'আপনি চলুন। আমি যাচ্ছি।'

সেই ঘোরালো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে উঠতে দেখলুম, উনি মেয়েকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিজের দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকলেন। ব্যালিকনিতে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকলুম। ব্যাপারটা ভারি রহস্যময় মনে হচ্ছে। দূরে মার্শল্যান্ডের দিগন্তে সূর্য ডুবে গেছে ততক্ষণে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। ডঃ এরিখসনের সাড়া পেলুম ঘরে। 'এ কী! কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যে! আসুন।'

ভেতরে ঢুকে বললুম, 'এমিলির জ্ঞান ফিরেছে?'

এরিখসন ম্লান হাসলেন। 'কেন জানি না, এসে অব্দি লক্ষ্য করছি এমিলি কেন যেন অবাধ্য হয়ে উঠেছে। সূর্যাস্তের সময় আর বাইরে থাকার কথা নয় ওর। অথচ আজ সূর্যাস্তের সময় ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। আপনি কফি খাচ্ছেন না কিন্তু।'

'খাচ্ছি।' বলে চুমুক দিলুম কফির পেয়ালায়। কিন্তু সূর্যাস্ত কথাটা আমাকে নাড়া দিতে থাকল। কেন সূর্যাস্তের পর এমিলির বাইরে থাকার কথা নয়? ওর মাথায় ওই কাচের টুপিই বা কেন? তাছাড়া ওটা কোন্ এমিলির কবর দেখলুম?

'আপনি তখন কবরটার কথা জিগ্যেস করছিলেন।' এরিখসন ঘরে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন। নিশ্চয় জেনেরেটারের ব্যবস্থা আছে বাড়িতে। ফের বললেন, 'ঠিকই দেখেছেন। ওটা আমার মেয়ে এমিলির কবর। জলে ডুবে মারা গিয়েছিল।'

'তাহলে........তাহলে এ কোন এমিলি?'

'তখন আপনাকে ক্লোনিংয়ের কথা বলছিলুম...'

'ডঃ এরিখসন। কী বলছেন!'

'হ্যাঁ, এ এমিলি আমারই সৃষ্টি। মৃত এমিলির অবিকল প্রতিবিম্ব।' ডঃ এরিখসন কফিটুকু শেষ করে দিলেন। 'মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেহকোষ নষ্ট হয়ে যায় না। খানিকটা সময় লাগে নষ্ট হতে। এমিলির দেহকোষ থেকে একটু অংশ কেটে নিয়েছিলুম। তাতে জিনের ভেতর ডিন এন এতে জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং প্রক্রিয়ায় নতুন বংশাণুগুচ্ছ তৈরি করেছিলাম। আপনি দেখেছেন, অণুর মতো ক্ষুদে বীজ থেকে কী প্রকাণ্ড গাছ গজায়। আসল এমিলির সেই আণবিক বীজ—যা স্বাভাবিকভাবে বাড়তে প্রায় আট-ন'বছর লেগেছিল, আমার গবেষণাগারে তা এক বছরেই বিকশিত হয়ে এমিলির বর্তমান শরীরের রূপ পেয়েছে।'

আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম ওঁর মুখের দিকে। তারপর বললুম, 'এই যুগান্তকারী ঘটনা এখনও চেপে রেখেছেন?'

ডঃ এরিখসন বললেন, 'রেখেছি। কারণ এখনও কিছু কাজ বাকি। ওকে সম্পূর্ণ মানুষে পরিণত করার আগে বাইরে প্রচার করব না, এই আমার ইচ্ছা। এখনও ওর মাথায় আটকানো সৌর প্যানেলের সাহায্যে প্রাণশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছি—কারণ, ভুলে যাবেন না, মৃত এমিলির দেহকোষ থেকে আণবিক বীজ নিয়েছিলুম। ফলে সূর্যাস্তের পর ওর শরীর থেকে, প্রাণ থাকে না।'

হাসতে হাসতে বললুম, 'আমি স্বচক্ষে দেখলুম—বাইরে প্রচার করে দেব যে!'

এরিখসনও হাসলেন। 'আপনারা কেউ বিশ্বাস করবে না। সবাই বলবে উদ্ভট গল্প।'.....

সকালে ঘুম ভাঙল ডঃ এরিখসনের ডাকে। হাতে কফির পাত্র। মুখটা অস্বাভাবিক গম্ভীর। বললুম, 'কী হয়েছে ডঃ এরিখসন? আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?'

এরিখসন আস্তে জবাব দিলেন, 'রাতে এমিলি মারা গেছে। ওকে বাঁচাতে পারলাম না।'

'সে কী?'

'কফি খেয়ে চলুন, দেখবেন ওকে।'

কফি ঝটপট গিলে ওঁর সঙ্গে নিচে একটা ঘরে গেলুম। এটা ওঁর গবেষণাগার। একটা বাথটাবের বিছানায় লম্বা ধাতব কফিনে এমিলি—সুন্দর ফুটফুটে সাদা মেয়েটা চোখ বুজে শুয়ে আছে। আমার চোখে জল এসে গেল।

'ওকে কবর দেবেন না ডঃ এরিখসন?'

এরিখসন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'লক্ষ্য করে দেখুন আপনি যা দেখছেন, তা একটা মেয়ের চেহারার প্রতিবিম্ব। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চেহারাটা মুছে যাবে। তারপর যা থাকবে, তা একমুঠো ছাই মাত্র। ছাইগুলোও একসময় মিলিয়ে যাবে। বাতাসের মধ্যে কার্বন অণু হয়ে মিশে যাবে। আমারই ভুল হয়েছিল। বিজ্ঞানের সীমানা ডিঙিয়ে যখন আসল এমিলিকে মাথা ভাঙলেও ফিরে পাবে না তখন তার প্রতিবিম্ব নিয়ে কী হবে?'

ডঃ এরিখসন, প্রখ্যাত আণবিক জীববিজ্ঞানী এরিখসন, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। কী বলে ওঁকে সান্ত্বনা দেব, ভেবে পাচ্ছিলুম না।.....

হাসির বদলে আগুন

সে এক আদ্দিকালের মজার গল্প।

দুনিয়া জুড়ে যখন খালি জঙ্গল আর জঙ্গল। মানুষ থাকত জঙ্গলের ভেতরেই। জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে তখন কিন্তু একটুও ঝগড়াঝাটি ছিল না মানুষের। বরং গলায়-গলায় ভারি ভাব ছিল। বাঘের সামনে পড়লে হালুম করত বটে, তবে সে-হালুমের মানে, 'আয় ব্যাটা, তোকে খাই' নয়। তখন বাঘের হালুম মানে : 'কী বাবাজি, যাওয়া হচ্ছে কোথা?'

বাঘ ছিল কি না মানুষের মামা। তাকে ভয়টা কিসের? কিন্তু বাঘ যেমন মামা, গণ্ডার তেমনি খুড়ো।

গণ্ডার খুড়ো ছিল বড্ড বদমেজাজী। কথা বললে জবাবই দিত না। বেশি বকলে কড়া এক ধমক। গোঁ ধরে বেড়াত। শিঙ নেড়ে তেড়েও আসত রাগ হলে। তাকে কেউ কখনও হাসতে দেখেনি।

তো একদিন হয়েছে কী, এক কামারের ছেলে একলা বনের ভেতর খেলতে বেরিয়েছে। তার নাম মুজেমি! খেলতে-খেলতে সন্ধ্যা হয়েছে। সে বাড়ি ফেরার কথা ভাবছে। হঠাৎ দেখতে পেল, নিরিবিলি একটা পাথরের কাছে দাঁড়িয়ে গন্ডার খুড়ো কী যেন করছে।

খুড়োর মেজাজের কথা তার ভালই জানা। তাই কোনো কথা না বলে সে দাঁড়িয়ে রইল। খুড়ো এমন অবহেলায় এখানে কী করছে, দেখবে বলে।

মুজেমি অবাক হয়ে দেখল, খুড়ো সেই পাথরে ঘষর ঘষর করে শিঙ ঘষছে। ঘষতে-ঘষতে হঠাৎ হল কী, শিঙ, দুটো কেমন রাঙা হয়ে গেল। আর সেই রাঙা শিঙের আলোয় বন হল আলো। একেবারে দিনের মতো ফুটফুটে হয়ে গেল সন্ধ্যাবেলাটা।

তখন আর মুখ বুজে থাকতে পারলো না মুজেমি। সাহস করে জিজ্ঞেস করল—ও খুড়ো, তোমার শিঙে ও কী? এত আলো হচ্ছে কেন বলো তো?

গণ্ডার ঘোঁত ঘোঁত করে হেসে বলল—হুঁ, হুঁ, বাবা! এর নাম হচ্ছে আগুন।

মুজেমি বুঝল, রাঙা শিঙের গরবে খুড়োর মেজাজ বদলেছে। সে হাত বাড়িয়ে বলল, —আমায় একটু আগুন দাও না খুড়ো।

গণ্ডার বলল, —দিতে পারি। কিন্তু এক শর্তে। আমায় যদি তুমি একটু হাসি দাও, তাহলে আমিও তোমায় একটু আগুন দেব! গণ্ডার বেজার হয়ে বলল, —দেখ না, হাসি যে আমার কিছুতেই আসে না। কাঁহাতক মুখ গোমড়া করে থাকা যায়।

মুজেমি ভাবনায় পড়ে গেল। গণ্ডার খুড়োকে হাসি দেওয়ার মানে হাসানো। কিন্তু সে কি সহজ কথা? শোনা যায়, খুড়োকে হাসাবে বলে জঙ্গলের যত জানোয়ার আর মানুষ মিলে অনেক চেষ্টা করেছিল, খুড়োর মুখে এক চিলতে হাসি ফোটেনি। সেরা আমুদে ভোঁদড় বাবাজিও হার মেনেছে। তো মুজেমি নেহাত বাচ্চা ছেলে।

তবু মুজেমি বলল—ঠিক আছে। আমি তোমায় হাসি দেব।

সারাটি রাত মুজেটি ভেবে কাটাল। পরদিন মনে একটা ফন্দি আঁটল।

সে হাতির কাছে গিয়ে বলল—ও হাতি দাদু, শুনেছ হিপোদাদু কি বলেছে?

হিপো কিনা হাতির খুড়তুতো ভাই। সে থাকে জলে। তাকে সবাই বলে জলহস্তী। অর্থাৎ জলের হাতি।

ডাঙার হাতি আর জলের হাতির মধ্যে একটুও ভাব নেই। মুজোমির কথা শুনে ডাঙার হাতি বলল—কী বলেছে হিপোটা?

মুজেমি মুখ টিপে হেসে বলল—বলেছে, তোমার গায়ে নাকি পিঁপড়েরও জোর নেই।

হাতি চোখ পাকিয়ে বলল—কী! কী! এমন কথা বলেছে?

—বলেছে তো! আরও বলেছে, ওই যে নদীর জলে এত কাঠ ভেসে আসে। টেনে তুলুক না দেখি, কত মুরোদ।

শুনে হাতি শুঁড় তুলে বেজায় চ্যাঁচামেচি করে বলল—এখুনি দেখিয়ে দেব কতগুলো কাঠ জল থেকে টেনে তুলতে পারি। আমি কিনা স্বর্গের ঐরাবতের বংশ!

সঙ্গে সঙ্গে মুজেমি দৌড়ে চলে গেল নদীর ধারে। হিপোকে ডেকে বলল—ও হিপোদাদু, হিপোদাদু! শুনেছ—তোমায় হাতিদাদা বলেছে, হিপোর গায়ে একটুও জোর নেই? আর বলেছে,. ডাঙায় কত কাঠ পড়ে আছে—হিপো একখানা কাঠ টেনে জলে ফেলুক তো দেখি, তার কত মুরোদ!

হিপো বলল—আলবৎ দেখিয়ে দেব। ডাকো সবাইকে! সবার সামনে এই বাজি হোক। যে জিতবে, সেই হবে বনের রাজা।

মুজেমি সারা বন ঘুরে যত মানুষ আর জানোয়ারকে নদীর ধারে নিয়ে এল। গণ্ডার খুড়োকেও ডাকতে ভুলল না। বনে সাড়া পড়ে গেল। হাতি আর হিপোর গায়ে জোর নিয়ে বাজি। একি যা-তা কথা!

এবায় মুজেমি একটা শক্ত দড়ি হাতির লেজে বেঁধে দিয়ে বলল—এই দেখছ হাতিদাদু, নদীর মধ্যে কাঠ ভাসছে! ওই কাঠের সঙ্গে দড়িটা বেঁধে দিয়ে আসব। তোমার ওটা টেনে তুলতে হবে।

হাতি বলল—যাও বাপু। দেরি কোরো না। হিপোটাকে দেখিয়ে দিই আমার গায়ের জোর।

মুজেদি দড়ির অন্যদিকটা নিয়ে নদীতে নামল। হিপোর কাছে গিয়ে বলল,—হিপোদাদু! ডাঙায় ওই দেখেছ একটা মস্তো কাঠ। এই দড়িতে কাঠটা বেঁধে রেখে এসেছি। এবার তোমার লেজের সঙ্গে বেঁধে দিচ্ছি। ওটাকে জলে নামিয়ে আনতে পারলে বুঝব, তোমার গায়ের বেশি জোর।

মুজেমি দড়ির ডগা হিপোর লেজে বেঁধে দিল।

তারপর সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—মারো টান! দে টান! হেঁইয়ো! হেই যোয়ান হেঁইয়ো!

হাতি জানে না তার লেজের দড়ির সঙ্গে হিপোর লেজ বাঁধা। হিপোও জানে না, তার লেজের দড়ির সঙ্গে হাতির লেজ বাঁধা।

দুজনে দুদিকে টানতে শুরু করল। মানুষজন আর জন্তুজানোয়ার চেঁচাতে

থাকল—দাও টান! মারো টান! হেঁইয়া!

টান টান টান— সে কী টান! হাতি টানছে আসলে হিপোকে। আর হিপো টানছে হাতিকে। প্রচণ্ড টানের চোটে শেষ পর্যন্ত দুজনেরই লেজের অর্ধেকটা পট করে ছিঁড়ে গেল। অমনি লেজকাটা হাতি চেঁচিয়ে উঠল—এ কী! এ কী! ছ্যা ছ্যা!

লেজকাটা হিপো চেঁচিয়ে উঠলো—ছ্যা ছ্যা! এ কী হল! এ কী হল!

জঙ্গলে লেজ কাটাটা বড্ড লজ্জার ব্যাপার! মুখ দেখানো যায় না।

হিপো আর হাতি লজ্জায় পড়ে গেছে। এদিকে দুজনের লেজকাটা দশা দেখে নদীর দুধারে যত মানুষজন আর জানোয়ার ছিল, হেসে খুন। হোহো হা হা হি হি....হাসির বান ডেকেছে।

এত হাসির মধ্যে একে তো মুখ গোমড়া করে থাকা কঠিন, তার ওপর লেজকাটা হাতি আর হিপোকে দেখাচ্ছেও ভারি অদ্ভুত। গোমড়ামুখো গণ্ডার খুড়োও শেষে আর থাকতে পারলো না। আচমকা হো হো হা হা করে বেজায় হেসে ফেলল।

অমিন মুজেমি তাকে বলে উঠল—খুড়ো! আগুন দাও তাহলে!

গণ্ডার আর কী করে। শিঙ নাড়া দিয়ে বলল—কই, নিবি কিসে? পাতা আন।

মুজেমি পাতা আনল। পাতায় একটুকরো আগুন ঠিকরে পড়ল খুড়োর শিঙ থেকে। মুজেমি চেঁচিয়ে বলল—আগুন। আগুন পেয়ে গেছে?

ব্যস! আবার কী! এতকাল মানুষ আগুনের জন্যে গণ্ডারকে কত কত সেধেছে—পায় নি। ছোট্ট ছেলে মুজেমির দৌলতে তা পেয়ে গেল। মুজেমিকে সবাই মিলে রাজা করে দিল!

অদল-বদল

রোজ ভোরবেলা পার্কে কিছুক্ষণ বেড়ানো হরিপদবাবুর অনেককালের অভ্যাস। পার্কটা বেশ বড়। কিন্তু হাঁটাচলার পর একটুখানি যে বসবেন কোথাও, তার উপায় নেই। এখানে-ওখানে যত বেঞ্চ আছে, কখন সবগুলো ভর্তি হয়ে গেছে। ঘাসে বসারও বিপদ আছে। ছেলেপুলের যা পাঁয়তারা, কে কখন ঘাড়ে এসে পড়ে তার ঠিক নেই। তার চেয়ে বিপদ ওদের ফুটবল! যেন কামানের গোলা।

তিতিবিরক্ত হরিপদ অগত্যা নিরিবিলি দক্ষিণ পূর্ব-কোণে বকুলগাছটার দিকে যান। বকুলতলায় একটুকরো কালো পাথর পড়ে থাকতে দেখেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, কখন পাথরটাও দখল হয়ে গেছে। হোঁতকা-মোটা, মাথায় টাক আর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চ্যাপ্টা নাক, কুতকুতে চোখ দিয়ে একটা লোক আরামে বসে আছে।

যেদিনই যান, দেখেন তাঁর যাওয়ার আগে কখন লোকটা বকুলতলার আসনটা দখল করে ফেলেছে।

জায়গাটা যে এমন কিছু সুন্দর তাও নয়। একটু নিরিবিলি এই যা। ওদিকটায় বলের ঘা খাওয়ার রিস্কও নেই। তবে ওখানে বসে আর কিছু না হোক, রেলগাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। রেলগাড়ি দেখতে ভালই লাগে হরিপদবাবুর। মনে-মনে কাঁহা-

মুল্লুক চলে যাওয়া যায়। কু-ঝিক-ঝিক.......কু-ঝিক-ঝিক! কখনও রেলগাড়ির চাকা ছড়া বলে, টিকিটবাবুর কত টাকা! টিকিটবাবুর কত টাকা! ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যায়।

শেষে জেদ চড়ে গেল হরিপদবাবুর। আগেভাগে গিয়ে পার্কের বকুলতলার পাথুরে আসনটা তাঁর দখল করা চাই-ই। সেদিন ভোরের আগে বিছানা থেকে উঠে পড়লেন। ঘড়ির কাঁটায় যখন ঠিকঠিক চারটে। আবছা আঁধার লেগে আছে ঘরবাড়ির গায়ে। পার্কে কুয়াশা জড়িয়ে রয়েছে। রাস্তায় কদাচিৎ চাপা গরগর শব্দ চলে যাচ্ছে একটা করে মোটরগাড়ি—তখনও হেডলাইট জ্বলছে। হরিপদবাবু পার্কে ঢুকে হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে গেলেন দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। বকুলতলা ঝুপসি হয়ে আছে আঁধারে-কুয়াশায়। ঘাসে শিশির চকচক করছে। পাথরটা খালি পড়ে আছে। হরিপদবাবু সিংহাসন দখল করার আনন্দে বসে পড়লেন তার ওপর। পাথরটা ঠাণ্ডা বটে, তাতে কিছু আসে যায় না। হরিপদবাবু খুশিতে বসে দুই পা দোলাতে থাকলেন। এমন-কী গুনগুন করে গানও গাইতে লাগলেন।

আস্তে আস্তে কালচে রঙ ধূসর হতে থাকল। তারপর সাদা হল। একজন দুজন করে লোক এসে পার্কে ভিড় করল। কেউ ধুকুর-ধুকুর দৌড়ুচ্ছে। কেউ যোগব্যায়ামেও বসে গেছে। কেউ কুকুর নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেঞ্চগুলোতে বুড়োরাও এসে বসে পড়েছে। তারপর ছেলেপুলের পাঁয়তারা শুরু হয়েছে ফুটবল নিয়ে। হরিপদবাবু তেমনি নিরিবিলি বকুলতলায় গুনগুন করছেন আর ঠ্যাঙ দোলাচ্ছেন।

কতক্ষণ পরে আনমনে মাথায় হাত বুলোতে গিয়েই চমকে উঠলেন। এ কী! তাঁর মাথাভর্তি একরাশ পাকা চুল ছিল। চুল কোথায় গেল?

বারবার হাত ঘষেও চুলের পাত্তা পেলেন না। চামড়ায় হাত ঠেকছে। তার মানে, হঠাৎ তাঁর মাথায় টাক পড়ে গেল নাকি? অবাক হয়ে মাথায় আঙুল ঠুকলেন। আরও চমকে গেলেন। সর্বনাশ! তাঁর মাথাভর্তি টাক যে!

তারপর হাত গালে ঘষে ঘাবড়ে গেলেন। প্রতিদিন দাড়ি কাটা অভ্যাস। পার্ক থেকে ফিরেই দাড়ি কাটেন। কালও কেটেছেন। চব্বিশ ঘণ্টায় এত দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল গজানো অসম্ভব। অথচ গজিয়েছে।

প্রচণ্ড আঁতকে উঠে হরিপদবাবু টের পেলেন, তাঁর গায়ের ঢিলেঢালা পাঞ্জাবি আঁটো হয়ে গেছে। চটিজুতোয় পা দুটো আর ঢুকছে না। এ তো ভারি সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! আঙুল ফুলে কলাগাছ ব্যাপার কি একেই বলে?

হতবুদ্ধি হয়ে বসে আছেন হরিপদবাবু। এমন সময় লাটি ঠুকঠুক করে এক ভদ্রলোক পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে মুচকি হেসে বললেন, "ভোম্বলবাবু যে! আছেন কেমন? বহুদিন তো দেখাশোনাও নেই। বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন বুঝি?"

হরিপদবাবু খাপ্পা হয়ে বললেন, "ভোম্বলবাবু কে মশাই? আমি হরিপদ তালুকদার।"

ভদ্রলোক খিকখিক করে হাসলেন। "চিরকাল থিয়েটারে অ্যাকটিং করে অভ্যাসটা

এখনও ছাড়েননি দেখছি ভোম্বলবাবু! তা ইয়ে, আপনার জামাইবাবাজির খবর কী? শুনেছিলুম, পুলিশ নাকি......."

হরিপদ তেড়ে উঠে বললেন, "কী যাতা বলছেন মশাই? আমার মেয়েই নেই তো জামাই।"

"আহা, ওতে লজ্জার কী আছে ভোম্বলবাবু?" ভদ্রলোক বললেন। "পুলিশ কাউকে ধরলেই তো সে চোর হয়ে যায় না। আদালত আছে কী করতে?"

হরিপদবাবু, আর বরদাস্ত করতে পারলেন না। তাঁর জামাই নেই। যদি দৈবাৎ থাকতও, তাকে চুরির দায়ে পুলিশ ধরত—ভাবতেও মাথায় খুন চড়ে যায়। কথা না বাড়িয়ে তক্ষুনি হন্তদন্ত কেটে পড়লেন। ভদ্রলোক অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

পার্ক থেকে বেরুবার মুখে আরেক ভদ্রলোক তাঁকে দেখে বলে উঠলেন, "আরে! ভোম্বলদা যে!"

হরিপদবাবু কটমট করে তাকিয়ে জোরে হাঁটতে থাকলেন। পেছনে ভদ্রলোক তখন বলছেন, "হল কী ভোম্বলদা? আরে, শোনো শোনো!"

কোনোদিকে না তাকিয়ে হরিপদবাবু গলিরাস্তায় পৌঁছলেন। তারপর নিজের বাড়ির দরজায় কলিং বেলের বোতাম টিপলেন। ততক্ষণে আরও টের পেয়েছেন, তাঁর গায়ে প্রচণ্ড জোরও এসে গেছে। কিন্তু বুকটা ঢিপ-ঢিপ করে কাঁপছে। একটা দারুণ গণ্ডগোল নিশ্চয় ঘটে গেছে!

দরজা খুলে তাঁর প্রিয় চাকর-কাম-রাঁধুনি হরু গম্ভীরমুখে বলল, "কাকে চাই?"

হরিপদবাবু গর্জে উঠলেন এবার। "কাকে চাই কী রে ব্যাটাচ্ছেলে? ভাঙ খেয়েছ সাতসকালে?" তারপর হরুকে ঠেলে ঘরে ঢুকে গেলেন!

হরু হৈ-চৈ করে উঠল। "আচ্ছা ভদ্রলোক তো মশাই আপনি! গায়ের জোরে পরের বাড়ি ঢুকে পড়লেন যে বড়! আরে! ও কী! কোথায় যাচ্ছেন?"

হরিপদ সটান নিজের শোবার ঘরে ঢুকে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড আঁতকে দেখলেন, রোজ পার্কের বকুলতলায় পাথরটার ওপর যে লোকটাকে বসে থাকতে দেখেছেন সেই লোকটাই বটে। হরিপদবাবু তার শরীরটা নিয়ে বাড়ি ফিরেছেন! কিন্তু তাঁর নিজের শরীরটা কোথায় গেল, সেটাই সমস্যা। আর ছ্যা-ছ্যা, এমন বিচ্ছিরি নাক থাকতে আছে মানুষের?

হরু ততক্ষণে পাড়া মাথায় করে চেঁচাচ্ছে, "ডাকাত! ডাকাত পড়েছে!" এমন জোর করে শোবার ঘরে ঢোকে যে, সে নিশ্চয় ডাকাত। হরিপদবাবু আয়নার সামনে হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ভেবে কোনো কুলকিনারা পাচ্ছেন না। পার্কে বেড়াতে গেলেন হরিপদবাবু হয়ে, ফিরে এলেন কোন হতচ্ছাড়া ভোম্বলবাবুটি হয়ে—যিনি নাকি একসময় থিয়েটার অ্যাকটিং করতেন এবং যাঁর জামাই লোকটা চোর না হয়ে যায় না! এ কী সর্বনেশে কাণ্ড রে বাবা!

কিন্তু তার চেয়ে সর্বনেশে কাণ্ড যে ঘটতে চলেছে, ঠাহর হল পাড়ার লোকের হট্টগোলে। বাড়ির দরজায় ওরা চেঁচাচ্ছে, "কই ডাকাত? কোথায় ডাকাত? ধর ব্যাটাকে! মার মার!" কেউ বলছে, "যাসনে, যাসনে! ভোজালি আছে। পুলিশ ডাক!" তার মধ্যে হরু এমনতর চেঁচাচ্ছে, "সব লুঠ হয়ে গেল যে! ওরে বাবা! এতক্ষণে

সব লুঠ করে ফেললে রে!"

সাহসী ছেলেরা লাঠিসোঁটা নিয়ে বাড়ি ঢুকেছে টের পেয়েই হরিপদবাবুর বুদ্ধি খুলে গেল। দড়াম করে দরজায় খিল এঁটে দিলেন। দরজার বাইরে ছেলেগুলো হল্লা করছে। কেউ ধাক্কাও দিচ্ছে দরজায়। হরিপদবাবু ভেতর থেকে শাসিয়ে বললেন, "সাবধান আমার কাছে বোমা আছে। উড়িয়ে দেব!"

ছেলেগুলো ভয় পেয়ে গেল। বয়স্করা বললেন, "ওরে! সরে আয়! সরে আয়! পুলিশে খবর গেছে।"

পুলিশের কথা শুনে হরিপদবাবুর বুকের ভেতর কাঁপুনি বেড়ে গেল। তখন ঘরের ভেতর থেকে করুণ স্বরে ডাকলেন, "হরু। ওরে বাবা হারাধন! আমি তোর মনিব হরিপদ তালুকদার। সত্যি বলছি!"

হরু বলল, "চালাকি হচ্ছে? আমার মনিব আমি চিনিনে? ওইরকম চেহারা নাকি ওনার? ওইরকম হেঁড়ে গলা নাকি! ওইরকম থ্যাবড়া নাক? ছ্যা-ছ্যা, যেন নিমতলার আস্ত পিচেশ।"

গণ্ডগোল একটু থেমেছে। সবাই পুলিশের প্রতীক্ষা করছে। হরিপদবাবুর গলা আবার শোনা গেল ভেতর থেকে, "সত্যি বলছি আমি হরিপদ তালুকদার। দোহাই তোমাদের এখন পুলিশ-টুলিশ ডোকো না! ও বাবা হারাধন। ওদের বুঝিয়ে বল্ না একটু। আমি তোর কর্তাবাবু রে!"

হরু তেড়েমেড়ে বলল, "বলবটা কী মশাই! হরিপদবাবু বাড়ি সেই এতটুকুন বাচ্চা বয়েস থেকে কাজ করছি। আমি কর্তাবাবুকে চিনিনে? থামুন, দারোগাবাবুকে আসতে দিন!"

বলতে বলতে এসে গেলেন দারোগাবাবু। পেল্লায় গোঁফের ডগায় পাক খাইয়ে বললেন, "কই? কোথায় ডাকাত?"

সবাই একগলায় বলে উঠল, "ওই ঘরের ভেতর স্যার!"

দারোগাবাবু হাঁক মেরে বললেন, "গিরধর সিং! দরওয়াজা তোড়ো! জলদি তোড়ো!"

শুনেই হরিপদবাবু হামাগুড়ো দিয়ে খাটের তলায় ঢুকতে যাচ্ছেন, টাকে খাটের একটা ধার জোরে লাগল। উঃ করে ককিয়ে উঠলেন।

তারপর দেখলেন, প্রচণ্ড অবাক হয়েই দেখলেন, পড়ে গেছেন শিশিরভেজা ঘাসে এবং বকুলতলা সেই পাথরটাতে ঠোক্কার লেগেছে মাথায়। বেশ জোরেই লেগেছে।

এই সময় কেউ বলে উঠল, "আহা! লাগল নাকি।"

তাকিয়ে দেখে অবাক হরিপদ তালুকদার। সেই টাকওয়ালা লোকটা, মুখে দাঁড়িগোঁফের জঙ্গল—রোজ যে এই পাথরের আসনটা দখল করে বসে থাকে এবং যে কিছুক্ষণ আগে তাঁকে সর্বনাশের মুখে ফেলে দিয়েছিল।

লোকটা হাসতে হাসতে বলল, "ওখানে বসলেই কিন্তু ঘুম পায়। বুঝলেন?"

হরিপদবাবু মনে মনে বললেন, বুঝেছি। তার মানে পাথরটা দখল করার জন্য রাত চারটেয় শেষ ঘুম বরবাদ করার শাস্তিটা ভালই পেয়েছেন। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "মশায়ের নাম কি ভোম্বলবাবু?"

"আজ্ঞে না! আমার নাম হরিপদ চাকলাদার।"

শুনেই হরিপদবাবু হন-হন করে কেটে পড়লেন। আর কক্ষনো এ ভুতুড়ে পার্কে আর এত ভোরে বেড়াতে আসবেন না। বাড়ির কাছাকাছি হতে হঠাৎ মনে হল, নামটা কি হরিপদ চাকলাদার বলল, না তালুকদার বলল? চাকলাদার না তালুকদার? তালুকদার না চাকলাদার!

তালুকদার হলে বেটাচ্ছেলে আমার মতোই বিপদে পড়তে পারে। এই ভেবে হরিপদ শেষে খিক খিক করে হেসে উঠলেন।

লোহাগড়ার দুর্বাসা মুনি

এপ্রিলের এক রবিবারের সকালে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ফ্ল্যাটে গিয়ে দেখি আবহাওয়া বেজায় গুরুগম্ভীর। ওঁর ভৃত্য ষষ্ঠীচরণ কাঁচুমাচু মুখে মোঝে থেকে কাচের টুকরো কুড়োচ্ছে। কর্নেলের মুখে বিরক্তি ও চাপা রাগ থমথমে করছে। আমি ঢুকলেও দুমিনিট কথা বললেন না যখন, তখন আমার একটু রাগ হল। ঘুরে দরজার দিকে পা বাড়ালুম।

সেই সময় কর্নেল গলায় ভেতর গমগম করে বললেন, জয়ন্ত, আমার এ সর্বনাশ দেখেও তুমি চলে যাচ্ছ? আশ্চর্য, আশ্চর্য! আজ দেখছি পৃথিবী শুদ্ধ আমার শত্রু হয়ে উঠেছে!

অগত্যা ফিরে এসে সোফায় বসলুম। বললুম, সর্বনাশটা কী আর এমন করেছে? ষষ্ঠীচরণ একটা গেলাস-টেলাস ভেঙে ফেলেছে। এই তো? সব বাড়িতেই ঝি-চাকরেরা এমন ভাঙে। তার জন্যে—

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, গেলাস নয়, জয়ন্ত। সেদিন লোহাগড়া থেকে যে আশ্চর্য সুন্দর ঘাসঘড়িংটা এনেছিলাম, জার ভেঙে, সেটা উড়ে গেছে। আর জারটা ভেঙেছে কে জানো? ওই গবেট, বুদ্ধু, হাঁদারাম, হতচ্ছাড়া ষষ্ঠীচরণটা।

ষষ্ঠীচরণ কাচ কুড়িয়ে চুপচাপ ঘর থেকে চলে গেল। আমি বললুম, একটা ঘাসফড়িং নিয়ে এত উত্তেজনার কী আছে?

কর্নেল চটে গিয়ে বললেন, ওটা সেই সিস্টোসার্কা গ্রেগারিয়া! অর্থোপ্টেরা প্রজাতির ফাসফড়িং, যাকে বলা হয় পঙ্গপাল। এসব ঘাসফড়িং মরুভূমিতে বাস করে।

হাসতে হাসতে বললুম, লোহাগড়া নিশ্চয় মরুভূমি নয়। শুনেছি জায়গাটা জঙ্গল। সেখানেও মরুভূমির পঙ্গপাল পেয়ে গেলেন? আপনার বাহাদুরি আছে।

কর্নেল বিরক্ত হয়ে বললেন জয়ন্ত! সিস্টোসার্কা গ্রেগারিয়া হল মাইগ্রেটরি পতঙ্গ। অর্থাৎ সাইবেরিয়ার হাঁসের মতো এক দেশ থেকে আরেক দেশে ঝাঁক বেঁধে যাতায়াত করে। অনেক সময় হয় কী, দুচারটে পঙ্গপাল বা ঘাসফড়িং কেন কে জানে, ঝাঁকের সঙ্গে মরুভূমিতে ফিরে যায় না। দলছুট হয়ে থেকে যায়। হাঁসের বেলাতেও তাই। এখন কথা হল, এরকম দলছুট ঘাসফড়িং দস্তুরমতো গবেষণার

বিষয়। কেন তারা দলের সঙ্গে ফেরে না? তারা কি ইচ্ছে করেই আলাদা হয়ে থেকে যায় দলের চোখ এড়িয়ে? কেন থাকে? কী তাদের উদ্দেশ্য?

কর্নেল মাঝে মাঝে কান ঝালাপালা করে দেন। বললুম বুঝেছি, বুঝেছি। তাহলে ষষ্ঠিচরণ সত্যি বড্ড দোষ করে ফেলেছে। কিন্তু ঘাসঘড়িংটা যাবে কোথায়? দাঁড়ান—খুঁজে দেখি।

কর্নেল দুঃখিত মুখে বললেন, খুঁজলেও আর পাবে না জয়ন্ত! ষষ্ঠিচরণকে কি শুধু জার ভাঙার জন্যে বকাবকি করছিলুম ভাবছ? করছিলুম ওর বেড়াল পোষার জন্য।

বেড়াল? অবাক হয়ে বললুম। বেড়াল পুষলে দোষ কী? ইঁদুর হবে না ঘরে। ভালই তো।

কর্নেল চটে গিয়ে বললেন, আহা ওর বেড়ালটাই যে ঘাসফড়িংটাকে গপ করে গিলে ফেলল। তুমি আসল কথাটা শুনবে না, খালি স্তব্ধ করবে। জারটা ষষ্ঠিচরণের কনুইয়ের গুঁতো লেগে যেই পড়ে গিয়ে ভেঙেছে, ঘাসফড়িংটা উড়ছে। এদিকে ষষ্ঠীচরণের পায়ে পায়ে ঘোরে নচ্ছার কালোকুচ্ছিত বেড়ালটা। চোখের পলকে গপ করে গিলে ফেলল ফড়িংটা। উঃ! কী সাংঘাতিক দৃশ্য! বেড়ালটাকে আমি গুলি করে মারতে যাচ্ছিলুম। পালিয়ে গেল।

জানালা দিয়ে পাশেই একটা প্রকাণ্ড নিমগাছ দেখা যায়। সেই গাছে কাকের চেঁচামেচি শুনে উঁকি মেরে দেখলুম, কালো একটা বেড়াল নিমগাছের ডাকে কুঁকড়ে বসে আছে এবং কাকগুলো মহা খাপ্পা হয়ে তাকে তাড়ানোর চেষ্টা করছে। পঙ্গপাল ফড়িং খেয়ে কি বেড়ালটার বদহজম হয়েছে কে কাকদের সঙ্গে লড়াই করতে গেছে? বললুম, কর্নেল! কর্নেল! ওই দেখুন নচ্ছার খুনী ওখানে বসে আছে।

কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে উঠে এসে দেখতে দেখতে বললেন, রিভলভারের রেঞ্জের বাইরে। ঠিক আছে। দেখি, কতক্ষণ পালিয়ে বেড়ায়।

আমার ইদানিং বড্ড অবাক লাগে এই কর্নেলবুড়োর আচরণ। একসময় মানুষ খুন বা রহস্যময় চুরি ডাকাতি নিযে মাথা ঘামাতেন! পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর অফিসাররা গণ্ডগোলে পড়লেই তাঁর সাহায্যে চাইতে ছুটে আসতেন। এখনও আদর করে কর্নেলকে ওরা বলেন, বুড়ো ঘুঘু। ওঁর এই ফ্ল্যাটটার নাম দেওয়া হয়েছিল 'বুড়োঘুঘুর বাসা।' সেই ঘুঘু অর্থাৎ গোয়েন্দাপ্রবর এখন প্রকৃতিবিদ হয়ে উঠেছেন দিনে দিনে। দেশবিদেশের প্রকৃতিবিষয়ক পত্রিকায় পাখি প্রজাপতি-ফড়িং কিংবা অর্কিড-ক্যাকটাস ইত্যাদি নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেছেন। মানুষের দিক থেকে মুখ ফিকিয়ে প্রকৃতি-টকৃতি নিয়ে মাথাঘামানোর কারণ কী? এ কি বার্ধক্যজনিত বৈরাগ্যেরই রকমফের? অথচ জানি, এখনও গায়ে অসুরের শক্তি। পাহাড় বন-জঙ্গল চষে বেড়ানোর সময় আমার মতো যুবকও ওঁর সঙ্গে হাঁটতে হাঁপিয়ে উঠি।

কিছুক্ষণ পরে কফি খেতে খেতে বললুম, হতভাগ্য বিড়ালকে ক্ষমা করে দিয়ে বরং ফের লোহাগড়া গিয়ে ওই পতঙ্গটিকে খুঁজে আনুন।

কর্নেল হতাশ ভঙ্গিতে বললেন, আর কি পাওয়া যাবে?

বললুম, আহা! খুঁজে দেখতে দোষ কী? আমিও না হয় যাব আপনার

সঙ্গে।

এবার কর্নেল একটু হাসলেন। তুমি বুঝি ছুটিতে আছ?

আছি। এই বসন্তকালে কলকাতায় পচে মরার মানে হয় না তাই ভাবছিলুম, কোথাও বেড়াতে যায় কি না। আসল কথাটা এতক্ষণে খুলে বললুম। এবং সেই উদ্দেশ্যই সাতসকালে আপনার কাছে হাজির হয়েছি।

কর্নেল ফোনের কাছে গেলেন। একমিনিট জয়ন্ত, রেলদফতরে আমার বন্ধু মিঃ রামস্বামীকে ফোন করে দেখি দুটো বার্থ আজ রাত পাওয়া যায় নাকি।...

লোহাগড়া মধ্যপ্রদেশের পাহাড়ী এলাকার একটি সংরক্ষিত জঙ্গল। জঙ্গলের ভেতর একটা সুপ্রাচীন ঐতিহাসিক দুর্গ আছে। এখন ভাঙাচোরা অবস্থা। খয়েরী রঙের পাথরে তৈরি এই দুর্গকে লোহার পুরী বলে মনে হত বলেই এর নাম ছিল লৌহগড়। তাই থেকে লোহাগড়া হয়েছে।

ফরেস্ট বাংলো জঙ্গল ঢোকার মুখে। সেই বাংলোর চৌকিদার বলল, সাবধানে থাকবেন স্যার। ইদানিং এখানে একটা মানুষখেকো বাঘের উপদ্রব হয়েছে। সরকার থেকে দুজন শিকারী পাঠানো হয়েছিল। তাদেরও বাঘটা খেয়ে ফেলেছে, তাই কোনো শিকারী আর আসতে সাহস পাচ্ছে না। গ্রামে দিনের বেলাতেও বাইরে বেরুচ্ছে না লোকে। ঢোকা তো দূরের কথা।

কর্নেল ওর কথা গ্রাহ্য করেছেন বলে মনে হল না। আমার শিকারের সখ আছে এবং বনে-জঙ্গলে এলে তাই রাইফেলটা আনতে ভুলি না। তাই কথা শুনেও তত দমে গেলুম না।

কর্নেল একটা ছোট্ট জাল, বাইনোকুলার আর ক্যামেরা নিয়ে বেরুলেন। আমি রাইফেলটায় গুলি ভরে সঙ্গে নিলুম। তারপর পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়লুম লোহাগড়া দুর্গের দিকে।

পাহাড়ি ঢালের নিচে একটা নদী আছে। নদী পেরিয়ে যেতেই অবাক হয়ে দেখি, এক সাধু, হনহন করে এগিয়ে আসছে। আমাদের সামনে এসে সে চোখ কটমটিয়ে হিন্দিতে বলল, কোথায় যাচ্ছ তোমরা? মরার সাধ যদি না থাকে, আর এক পাও এগিও না। আমার বাহনকে ছেড়ে দিয়েছি। তোমাদের মুণ্ডু কড়মড়িয়ে খাবে, ওই শোনো!

সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের ভেতর কোথাও বাঘের গর্জন শোনা গেল পরপর দুবার। কর্নেল সাধুকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখছিলেন। আমি রাইফেলটা শক্ত করে ধরলুম। কর্নেল একটু হেসে বললেন, সাধুজী! আপনার বাহনকে দয়া করে একটু সামলে রাখুন। আমরা লোহাগড়ায় গিয়ে মাত্র দুটো ঘাসফড়িং ধরব। দয়া করে তার অনুমতি দিন। আর যদি অনুমতি না দেন, আমরা বিনা অনুমতিতেই দুর্গে যাব।

কর্নেল তামাসা করছেন কি না বুঝতে পারলুম না। সাধু তাঁর কথায় প্রচণ্ড ক্ষেপে গেল কেন কে জানে। তিড়িংবিড়িং করে কতকটা নাচের ভঙ্গিতে লাফালাফি করে বলল, অভিশাপ দেব বলে দিচ্ছি, সাবধান। আমি কে জানো? ঋষি দুর্বাসা!

কর্নেল বললেন, দুর্বাসার বাহন মানুষখেকো বাঘ—এমন কথা তো শুনিনি সাধুজী।

সাধু লম্ফঝম্ফ করে বলল, আবার তামাসা হচ্ছে আমার সঙ্গে? রোসো, দেখাচ্ছি মজা!

বলে সে তিনবার হাততালি দিল। অমনি বাঘের ডাক শোনা গেল আবার! এবার মনে হল ডাকটা আরও কাছে। তারপর আন্দাজ পঞ্চাশ গজ তফাতে একটা ঝোপের ভেতর আবছা ডোরাকাটা প্রাণীটাকে নড়াচড়া করতে দেখতে পেলুম। আমি গুলি করতে যাচ্ছি, কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন, আহা! করো কী জয়ন্ত! ঋষি দুর্বাসার বাহনকে মেরে কাজ নেই। চলো আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখানে যাই।

সাধু দাঁত কড়মড় করে বলল, মরবে। প্রাণে মারা পড়বে বলে দিচ্ছি।

কর্নেল গ্রাহ্য করলেন না। হাসতে হাসতে পা বাড়ালেন। আমি তো হতভম্ব হয়ে গেছি। ঝোপের আড়ালে বাঘটাকে আর দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে তো! বার বার সে গর্জন করছে।

সাধু চোখ কটমট করে আমাদের যাওয়া দেখছিল। যতদূর গেলুম পিছু ফিরে দেখলুম, সে একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। বললুম, বাঘটা যদি হামলা করে?

কর্নেল বললেন, জয়ন্ত! বাঘটা হামলা করবে না তুমি নিশ্চিন্তে চলো।

অবাক হয়ে বললুম, কী বলছেন! মানুষখেকো, বাঘ বড় ভয়ংকর প্রাণী!

কর্নেল বললেন, আমার ধারণা, তার চেয়ে সাংঘাতিক প্রাণী ওই সাধু।

বলেই আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে পাশের ঝোপে ঢুকে পড়লেন। তারপর গুঁড়ি মেরে হাঁটতে শুরু করলেন। দেখাদেখি আমিও সেই ভঙ্গিতে ওঁকে অনুসরণ করলুম। কর্নেলের এমন বিদঘুটে আচরণ আমার অজানা নয়। এসব সময় কোনো প্রশ্ন করে জবাবও পাব না, তাও জানি।

কিছুদূর এগিয়ে যাওয়ার পর কর্নেল ফিস ফিস করে বললেন, ওই দেখ জয়ন্ত। বাঘটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে, সেইখানেই।

আমি রাইফেল বাগিয়ে ধরতেই ফের বাধা দিলেন। তারপর গুঁড়ি মেরে দৌড়ে গেলেন। বাঘটাকে দেখতে পাচ্ছিলুম। ঝোপের ভেতর দাঁড়িয়ে উল্টোদিকে তাকিয়ে আছে। অথচ আশ্চর্য, বাঘের কান খুব প্রখর। মৃদুতম শব্দ বা নড়াচড়া টের পাওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা আছে বাঘের। বিশেষ করে এটা যদি সত্যি মানুষখেকো বাঘ হয়, তাহলে এখনও ঘুরে দেখে আমাদের আক্রমণ করতে আসছে না কেন?

এরপর কর্নেল যা বললেন, দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। কাছে গিয়ে বাঘটার কান ধরে মাথায় দুই চাঁটি মারলেন। বাঘটা একটুও নড়ল না।

কাছে গিয়ে সব বুঝতে পারলুম। এটা আদতে বাঘের চামড়া পরানো একটা খড়ের বাঘ। কিন্তু তারপর আরেক কাণ্ড করলেন কর্নেল। ঝোপের ওপরে একটা ঝাঁকড়া গাছ রয়েছে। গাছের দিকে মুখ তুলে চাপা গলায় কাকে বললেন, ওহে। এবার সুড়সুড় করে নেমে এস তো! উঁহু উঁহু! পালানোর চেষ্টা কোরো না। গুলি খেয়ে প্রাণটি যাবে।

গাছের ডাল থেকে কৌপিনপরা কমবেয়সী আরেক কমবয়েসী আরেক সাধু ঝুপ করে লাফিয়ে পড়ল। কর্নেল তার জটা ধরে ফেললেন। জটা উপড়ে এল। ন্যাড়া মাথা নিয়ে নকল সাধু গুলতির বেগে পালিয়ে গেল ঝোপঝাড় ভেঙে। কর্নেল হো

হো করে হেসে ফেললেন।

বললুম, ব্যাপারটা কী?

কর্নেল বললেন, নকলবাঘের পিঠে এই যে দড়িটা বাঁধা রয়েছে দেখছ, এইটা হাতে নিয়ে লোকটা চড়ে বসে ছিল। এ একরকমের পুতুলনাচ বলতে পারো। তুমি গুলি করলেও এ বাঘকে আর খুঁজে পেতে না।

কিন্তু কেন?

আমাদের জঙ্গল ঢুকতে দেওয়ার ইচ্ছে নয় দুর্বাসা মুনির।

কেন তাই বলুন না?

সেটা বোঝে যাচ্ছে না। কর্নেল টুপি খুলে টাকে হাত বুলিয়ে যেন মগজকে চাঙ্গা করতে থাকলেন। তারপর সাদা দাড়ি থেকে একটা পোকা বের করে পোকাটা পরখ করে দেখে ফেলে দিলেন।

বললুম, কিন্তু বাঘের গর্জন?

কর্নেল বললেন, গর্জনটাও নকল। অভ্যাস করলে মানুষ বাঘের ডাক অবিকল নকল করতে পারে। তুমি কি জিম করবেটের শিকার কাহিনী পড়োনি? করবেট বাঘের ডাক ডেকে বাঘকে কাছে এনে গুলি করতেন। আরও অনেক শিকারীর বইতেও এ ঘটনা পাওয়া যায়। শিকারী কেনেথ অ্যানডারসনও এভাবে অনেক বাঘ মেরে ছিলেন। কিন্তু আমার অবাক লাগছে জয়ন্ত, তুমি গর্জন শুনে বুঝতে পারলে না যে ওটা নকল বাঘের গর্জন? তুমি শিকার-টিকার তো অনেক করেছ!

একটু হেসে বললুম, তাই বলে কি কখনও বাঘ শিকার করেছি? বড় জোর পাখি কিংবা দু-একটা খরগোশ! অবশ্য একবার একটা শম্বর মেরেছিলাম ওড়িশার জঙ্গলে।

কর্নেল বললেন, যাক্‌গে। চলো, আমরা দুর্গের ওখানে যাই.....

দুর্গের ভেতরকার চত্বরে ঘন ঘাসের জঙ্গল। কর্নেল বললেন, এখানেই সেই ঘাসফড়িং দেখতে পেয়েছিলাম। জয়ন্ত, তুমিও খুঁজে দেখ। ফড়িংয়ের ডাক শুনতে পাচ্ছি যখন, তখন দু-একটা নিশ্চয় খুঁজে পাব।

যে ফড়িং ধরি, দেখে কর্নেল বলেন, নয়। সিস্টোসার্কা গ্রেগারিয়া এত সবুজ নয়! ধূসর রঙ। আরও মোটা। এদিকে মাথার ভেতর চৌকিদারের কাছে শোনা মানুষখেকো বাঘের কথাটা আছে। তাই বারবার চঞ্চল চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি। বলা যায় না, দুর্গের এইসব ভাঙাচোরা ঘরে সত্যিকারের বাঘটা হয়তো এখন ঘুমোচ্ছিল। সাড়া পেয়ে জিভ চাটছে ওত পেতে। হালুম করে এখুনি ঝাঁপ দেবে।

কর্নেল টের পেয়ে বললেন, মানুষখেকো বাঘের ভয় কোরো না জয়ন্ত। বরং তার চেয়ে সাংঘাতিক প্রাণী সম্ভবত সেই সাধু—দুর্বাসা মুনি!

বলেই একলাফে সরে গেলেন। আঁতকে উঠে দেখলুম, সাঁই করে একটা তীর এসে কর্নেল যেখানে হাঁটু দুমুড়ে ঘাসে বসে ছিলেন, সেখানে বিঁধে গেল। কর্নেল একটা পাথরের আড়ালে সরে গেছেন। আমিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আরেকটা পাথরের আড়ালে লুকিয়েছি।

শোঁ শোঁ করে কয়েকটা তীর এসে বিঁধে গেল-এপাশ-ওপাশে। তারপর দৃষ্টি

গেল বাঁদিকে একটা ভাঙা ঘরের দেওয়ালে ওপর। একটা লোক তীর-ধনুক নিয়ে দেওয়ালের ওপর গুঁড়ি মেরে বসে আছে। আরে! এ তো দেখছি, ফরেস্টবাংলোর সেই চৌকিদার! আমি হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম কয়েক মিনিট। তারপর মরিয়া হয়ে উঠলুম। দুর্গের প্রাঙ্গণে ধ্বংসস্তূপের আড়ালে প্রায় বুকে হেঁটে সেই ভাঙা ঘরের বারান্দায় গিয়ে উঠলুম। কর্নেলকে কোথাও পেলুম না। পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকে দেখি ছাদ ভেঙে পড়েছে। দেয়ালের মাথায় চৌকিদার ধনুকে তীর জুড়ে উঁকি মেরে আমাদের খুঁজছে। তার পশ্চাদ্দেশে রাইফেলের নল ঠেকাতেই চমকে উঠে ঘুরল। চাপা গর্জন করে বললুম, তীর-ধনুক ফেলে দাও। নৈলে এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাবে গুলিতে!

চৌকিদার তীরধনুক ফেলে দিল। তারপর কাকুতি-মিনতি করে বলল, দোহাই হুজুর। গুলি করবেন না। নামছি।

সে নেমে এল! তার পিঠে রাইফেলের নল ঠেকিয়ে ডাকলুম, কর্নেল! কর্নেল! বদমাসটাকে ধরেছি। ওদিকের ঘর থেকে কর্নেলের সাড়া এল।

....এখানে নিয়ে এস ওকে!

চত্বর পেরিয়ে গিয়ে দেখি, বারন্দায় সেই সাধুর সামনে রিভলবার হাতে কর্নেল দাঁড়িয়ে আছেন। সাধু কাকুতি মিনতি করছে। ....হুজুর! গরিব মানুষ পেটের দায়ে এ কাজ করছি। ছেড়ে দিন পুলিশে দিলে জেল হয়ে যাবে।

কর্নেল তার জটা আর দাড়ি উপড়ে নিলেন। তারপর হাসতে হাসতে বললেন, দেখেছ জয়ন্ত, এ দুর্বাসা বাবাজীও তার চেলার মতো নকল সাধু।

বললুম, কিন্তু ব্যাপারটা কী?

কর্নেল বললেন, ব্যাপার খুব সামান্য। ওই ঘরে চোলাই মদের পিপে বোঝাই করে রেখেছে। এরা মনে হচ্ছে, এ কারবারের মালিক নয় নিতান্ত পাহারাদার। এখানে রাখা পিপেগুলো সম্ভবত আজকালের মধ্যে চালান যাবে। আমরা এসে পড়ায় এবং লোহাগড়া দুর্গে যাব বলায় এরা বেগতিক দেখেছিল। তাই মানুষখেকো বাঘের ভয় দেখিয়েছিল। শেষে যখন দেখল, তাতেও ভয় পেলুম না এবং ওদের চালাকি ধরে ফেললুম, তখন তীর ছুঁড়ে প্রাণে মারতে চেয়েছিল। তবে জয়ন্ত, মাঝখান থেকে লাভটা তোমারই হল! তোমার কাগজ দৈনিক সত্যসেবকে বড় করে খবর ছাপা হবে।

'মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে চোলাই মদের গুদাম আবিষ্কার!'

বললুম, সম্প্রতি প্রায়ই বিষাক্ত চোলাই খেয়ে অসংখ্য মানুষ মারা যাচ্ছে এই এলাকায়। কর্নেল, আমার ধারণা, এসব সেই বিষাক্ত চোলাই মদ!

কর্নেল বললেন, পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে। তবে চলো, আসামীদের পুলিশের জিম্মায় দিয়ে আসি। ওবেলা বরং এসে সিস্টোসার্কা গ্রেগারিয়া খুঁজে বের করব। আমার বিশ্বাস, ওই ঘাসফড়িংগুলো এখনও দুচারটে ঘাসে লুকিয়ে আছে।

চৌকিদার ও দুর্বাসা মুনিকে নিয়ে আমরা ফিরে চললুম জঙ্গলের পথে। যেতে যেতে কর্নেল ফের বললেন, চোলাই মদের তিন নম্বর পাহারাদারটাকেও ধরতে পারলে ভাল হত। লোকটা কিন্তু চমৎকার বাঘের ডাক ডাকতে পারে।

কর্নেলের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দূরে আবার বাঘের ডাক শোনা গেল —আউংঘ্। আউংঘ্। বললুম, ওই শুনুন তিন নম্বর আসামী এখন ভয় দেখাবার চেষ্টা করছে।

কর্নেল আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে বললেন, না জয়ন্ত! এ ডাক সত্যিকার বাঘের। এখন বাঘের সঙ্গী খোঁজার ঋতু। লোহাগড়ার জঙ্গলে এতক্ষণে একটা সত্যিকারের বাঘ সঙ্গী খুঁজতে বেরিয়েছে। এসময় ওদের মেজাজ বড্ড চড়া থাকে। ওবেলা সাবধানে জঙ্গলে ঢুকতে হবে।......

হরিপদর বিপদ

হরিপদ খুব বিপদে পড়েছে। সবসময় মুখ ভার। খেতে-শুতে চলাফেরা করতে সুখ নেই। ঘুমিয়ে স্বস্তি নেই। তার নাকি লেজ গজাচ্ছে।

হ্যাঁ, লেজ। পিঠের দিকে শিরদাঁড়ার নিচে তো তেকোনা হাড়টা আছে, সেখানেই ব্যাপারটা ঘটছে।

সবচেয়ে মুশকিলটা হল, কথাটা কাকেও বলা যাচ্ছে না। এইতে হরিপদ আরও মনমরা হয়ে পড়েছে। বিপদ-আপদ ঘটলে অন্যকে জানালেও খানিকটা সুখ পাওয়া যায়, সে সাহায্যে করুক বা না করুক। কিন্তু এমন গুরুতর কথা বলতেই যে লজ্জা করে। তাছাড়া বললেও কি কেউ তার লেজ গজানোটা ঠেকাতে পারবে?

প্রথমে ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল এভাবে।

এক সকালে হঠাৎ হরিপদ টের পেয়েছিল, শিরদাঁড়ার নীচের তেকোনা হাড়টায় কেমন একটা অস্বস্তি, আর চুলকোনি।

সেই যে শুরু হল, চুলকোনি চলতেই থাকল। হরিপদ সারাক্ষণ সেখানে হাত দেয়। শেষে তিতিবিরক্ত হয়ে পাড়ার ডাক্তারবাবুর কাছে গেল।

ডাক্তারবাবু একটা ওষুধ লাগাতে দিলেন বটে, কিন্তু কাজ হল না। তখন হরিপদ গেল তারক কবরেজের কাছে। হরিপদ বরাবর ডাক্তারের চেয়ে কবরেজদের বিশ্বাস করে।

কবরেজমশাই আতস কাচ দিয়ে জায়গাটা দেখে গম্ভীর মুখে বললেন—হুঁ!

হরিপদ বলল—কী হয়েছে কবরেজমশাই?

কবেরেজমশাই বললেন—আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ওই হাড়টাকে বলে পিকচঞ্চুঅস্থি। কেন বলে জানো? ওটা পিক অর্থাৎ কোকিলের চঞ্চুর মতো! চঞ্চু মানে কি জানো?

হরিপদ মাথা নাড়ল!

—চঞ্চু মানে ঠোঁট। কোকিলের ঠোঁট দেখেছ? দেখনি? তুমি মহামূর্খ।

হরিপদ মনে মনে রাগ করলেও চুপ করে থাকল। সে তত মূর্খ নয়। গরিব লোকের ছেলে পয়সার অভাবে বেশিদূর পড়াশোনা হয়নি। তবে যেটুকু হয়েছে, তাই বা মন্দ কী? সে এখন ফার্গুসন অপিসে ছোটোসায়েবের খাস বেয়ারা। ছোটসায়েব তাকে খুব স্নেহ করেন। কত বকশিস দেন।

তারক কবরেজ বলেছিলেন—দেখ বাপু, তোমার পিকচঞ্চু অস্থিতে যা দেখেছি,

লক্ষণ বড় ভাল নয়। তুমি কি কখনও হনুমান মেরেছিলে?

হরিপদ অবাক হয়ে বলেছিল—হনুমান? না তো!

—তাহলে নিশ্চয় পাটকেল ছুঁড়েছিলে।

হরিপদ ছেলেবেলায় গ্রামে থাকত। তাদের গ্রামে হনুমান ছিল অনেক। সে আর সব ছেলেদের সঙ্গে জুটে হনুমান তাড়াতে ঢিল ছুঁড়ত বটে।

হরিপদ মাথা চুলকে বলেছিল—হনুমানের কথা কেন কবরেজমশাই?

তারক কবরেজ গলার স্বর চাপা করে বলেছিলেন—বলছি কি সাধে? তোমার মতো একই রোগ হয়েছিল নরহরি উকিলের। সেও হনুমানকে ঢিল ছুঁড়ে এই বিপদ বাধিয়েছিল। শেষে আদালতে যাওয়া বন্ধ করতে হয়েছিল বেচারীকে।

হরিপদ ভয়ে ভয়ে বলেছিল—কেন, কেন? তারকবাবু বলেছিলেন—তুমি মূর্খ। লেজ নিয়ে কেউ আদালতে যেতে পারে?

—লেজ? হরিপদ ভ্যাবাচ্যাকা একেবারে।

—হ্যাঁ, লেজ। হনুমানের ল্যাজ। তারক কবরেজ বলেছিলেন। সাড়ে তিন ফুট লেজ কম কথা নয়। তাকে গুটিয়ে যত ছোটই করো, পেছনটা ফুলে থাকবে।

তা তো থাকবেই। কিন্তু নরহরি উকিলের লেজ গজিয়েছিল বলে হরিপদরও গজাবে নাকি? হরিপদ কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল—আমারও কি লেজ গজাবে নাকি কবরেজমশাই?

—হুঁ, গজাবে।

—ওরে বাবা! লেজ নিয়ে ছোটসায়েবের কাছে যাব কেমন করে? হরিপদ প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। আর রাস্তায় নামলেই তো ছেলেপুলেরা পেছনে লাগবে।

তারক কবরেজ ফ্যাঁচ করে হেসে বলেছিলেন—তা তো লাগবেই। নরহরি উকিল কি সাধে আদালস যাওয়া ছেড়েছিল? থাক্ গে, যা বলছি শোন! এই লেজ গজানো রোগের একটাই ওষুধ আছে। কিন্তু সে-ওষুধ যোগাড় করা বড় ঝকমারি। তেত্রিশটাকা তেত্রিশ পয়সা খরচ হবে।

হরিপদ তাতে পিছপা নয়। তিনশো তেত্রিশ বললেও রাজি হত। ওরে বাবা! মানুষের লেজ গজানোর মতো বিপদ আর কী থাকতে পারে?

তেত্রিশটাকা তেত্রিশ পয়সা দিয়ে এসেছিল হরিপদ। তারপর কথামতো দিনতিনেক পরে গেল কবরেজের কাছে।

তারক কবরেজ বলবেন—বাপ্‌স! তোমার লেজ গজানো ঠেকাবার ওষুধ আনতে আমার যা কষ্ট গেল, বলার নয়। হুতুমপুরের নাম শুনেছ? সেখানে বনজঙ্গল ঢুঁড়ে নিয়ে এলুম। তারপর বটিকা তৈরি করলুম। মলম বানালুম। রোজ রাত্তিরে শোবার সময় একটা করে বড়ি খাবে। আর এই মলমটা মাখাবে পিকচঞ্চু হাড়ে। একমাস পরে ফের ওষুধ দেবো।......

তারপর দিনসাতেক ওষুধ খেয়েছে এবং মলম লাগিয়েছে হরিপদ। তবু সেইরকম চুলকাচ্ছে। তার ওপর কী একটা ঠেলে বেরোচ্ছেও যেন। ফোঁড়ার মতো। ভয়ে ভয়ে সে হাত দিয়ে ছুঁয়ে টের পেতে চায়, লোমটোম আছে নাকি। ঠেলেওঠা জিনিসটা কেমন খসখস করছেও যেন। তাহলে কি ওষুধে কাজ হচ্ছে না।?

অপিসে তাকে দেখে ছোটসায়েব বলেন—কী হরিপদ? অসুখবিসুখ করেছে নাকি?

হরিপদ আসল কথাটা তো বলতে পারে না শুধু বলে—একটু জ্বরমতো হয়েছে স্যার!

—তাহলে অফিসে এসেছ কেন? ছুটি নাও।

শেষ পর্যন্ত ছুটিই নিতে হল হরিপদকে! ততদিনে তার সেই মারাত্মক জিনিসটা ইঞ্চিটাক উঁচু হয়ে ঠেলে বেরিয়েছে। কবরেজের কাছে যাওয়া দরকার! কিন্তু সেই সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তাদের গ্রামে একজন কবরেজ আছেন বটে! গ্রামের কবরেজ বলে তারকবাবুর মতো নামডাক নেই। কিন্তু হাজার হলেও হরিপদ গ্রামের মানুষ। যত্ন করে দেখবেন বইকি। হরিপদ সেদিনই গ্রামে চলে গেল।.....

হরিপদর এক পিসি ছাড়া গ্রামের বাড়িতে আর কেউ নেই। পিসিকে সে মাসে মাসে টাকা পাঠায়। পিসি তো হরিপদকে দেখে ভারি খুশি। কিন্তু ওর হাবভাব দেখে ভড়কে গেল! বলল—ও হরে, তোর কী হয়েছে? তোকে এমন দেখাচ্ছে কেন?

হরিপদ হাসবার চেষ্টা করে বলল—ট্রেনে-বাসে এসেছি তো, তাই বড্ড ক্লান্ত। আচ্ছা পিসিমা, গাঁয়ে আজকাল হনুমান আসে?

পিসি বলল—হনুমান? কোথায় হনুমান? আর কি সে রামরাজত্ব আছে রে? সব হনুমান কোথায় পালিয়েছে। আর শুধু হনুমান কেন, আজকাল শেয়াল-টেয়ালও আর নেই। এমন কী, আগের মতো পাখিও দেখতে পাইনে!

—কেন, কেন?

—পাপে। মানুষের পাপ। বুঝলি হরে? মানুষের এত পাপ যে পাখপাখালি জন্তু-জানোয়ার সব্বাই মানুষকে ঘেন্না করে পালিয়ে গেছে!

হরিপদ গম্ভীর হয়ে বলল—তা যাই বলো পিসিমা, হনুমান পালিয়েছে বলেই না তোমার মাচানে এত লাউ শশা-কুমড়ো ফলে রয়েছে! হনুমান থাকলে সব খেয়ে ফেলত না কি?

অমনি পিসি মুড়ো ঝাঁটা তুলে বলল—হুঁ, খেয়ে ফেললেই হল। ঝাঁটা ছুঁড়ে মারব না মুখে?

হরিপদ বলল—আচ্ছা, ধরো—কথার কথা বলছি, যদি আমি—মানে এই হরে হঠাৎ হনুমান হয়ে যাই......।

এটুকু শুনেই পিসি খিলখিল করে হেসে বলল—ওরে, থাম থাম। তুই হনুমান হবি কী করে হরে? বালাই যাট! তুই কেন মুখপোড়া হনুমান হবি, শুনি?

হরিপদ বলল—ধরো, যদি হই?

পিসি একটু ভেবে বলল—তুই হনুমান হলে একটার বেশি শশা খাস্‌নে কিন্তু! তার বেশি খেলে আমার রাগ হবে।

—তাই হবে? তা পিসি, আমি যদি মুখ ভেংচাই তোমাকে?

পিসি ফের খিলখিল করে হাসল। তারপর বলল—আমিও ভেংচাব। শুধু কি

ভেংচাব? সেই ছড়াটাও গাইব।

এই হনুমান কলা খাবি?
জয়-জগন্নাথ দেখতে যাবি?

হরিপদ বলল,—আমি যদি রাতারাতি হনুমান হয়ে যাই, তাহলে কিন্তু ভড়কে যেও না পিসি। গাঁয়ে তো আর হনুমান নেই। কাজেই যদি কোনও হনুমান হঠাৎ দেখতে পাও, জেনো সে তোমার ভাইপো এই হরে। বুঝলে তো?

পিসি এতক্ষণে একটু অবাক হয়ে বলল—তা ও হরে, এসব কথা কেন বলছিস বাবা? বালাই ষাট! তুই হনুমান হতে যাবি কোন দুঃখে?

হরিপদ আমতা হেসে বলল—কিছু বলা যায় না পিসিমা।

—থাম হতচ্ছাড়া ছেলে! আর খাবি আয়!

হরিপদ চুপচাপ বাড়ির উঠোনে বিশাল নিমগাছটার দিকে তাকিয়ে রইল। যদি লেজটা গজিয়ে যায়, সে তো হনুমান হয়ে যাবে। তখন ওই গাছে গিয়ে উঠবে। কিন্তু গাছটায় নাকি ভূত আছে। ছেলেবেলায় সে সেই ভূতটার ভয়ে সন্ধেবেলা গাছটার দিকে তাকাতেই পারত না। কপালের ফেরে যদি হনুমান হয়ে ওঠে, ভূতটার সঙ্গে ভাব করে নিতেই হবে।

পিসি রান্নাঘরে রান্না করছে। ঠিক দুপুরবেলা। হরিপদ পাশের পুকুরে গেছে স্নান করতে। পুকুরঘাটে ভিড় জমে আছে। হঠাৎ ভিড় থেকে একটা ছোট্ট ছেলে চেঁচিয়ে উঠল—ওরে! ওই দেখ, একটা হনুমান!

আর সব ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে উঠল :

এই হনুমান কলা খাবি?

জয়-জগন্নাথ দেখতে যাবি?

হইচই পড়ে গেল। গাঁয়ে কতকাল কেউ হনুমান দেখেনি। হঠাৎ পুকুরপাড়ে একটা হনুমান দেখে সবাই চেঁচিয়ে উঠল—হনুমান এসেছে! হনুমান এসেছে!

হরিপদ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তারপর টের পেল, সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। পিঠ টনটন করছে। সে সামনে দুহাত নামিয়ে ঝুঁকল। তারপর দেখল—সর্বনাশ! তার মানুষের শরীরটা তো আর নেই। সারা গা ধূসর লোমে ঢাকা। আর পিঠের দিকে সেই 'পিকচঞ্চু'তে বিঘৎখানেক লেজ গজিয়ে গেছে।

মরিয়া হয়ে হরিপদ চেঁচিয়ে উঠল—উঁপ।

আরও সর্বনাশ! মানুষের ভাষাটাই যে আর বেরুচ্ছে না। হরিপদ যত কথা বলার চেষ্টা করছে, উঁপ আঁপ খ্যাঁকোর খ্যাঁক ছাড়া কোনও আওয়াজ বেরুচ্চে না।

এবার ছেলের পাল ঢিল ছুঁড়তে শুরু করল। হরিপদ রাগে দুঃখে মুখ ভেংচাতে ভেংচাতে অশ্বত্থ গাছটায় গিয়ে উঠল।

তাতেও কি রেহাই আছে? কে চেঁচিয়ে বলল—ওরে! ভুঁইয়ের কুমড়োগুলো সব শেষ করে ফেলবে যে! বন্দুকটা নিয়ে আয় তো!

হরিপদ বিপদ টের পেল। আগের যুগ আর নেই। আজকাল মানুষ এত ধর্ম মানে না। হনুমান ফসল নষ্ট করে। কাজেই দরকার হলেই বন্দুক ছুঁড়ে বসবে হয়তো।

ভয় পেয়ে হরিপদ তাদের বাড়ির দিকে দৌড়ল।

কিন্তু যেই পাঁচিলে উঠে হনুমানের ভাষায় বলেছে—ও পিসিমা! অমনি পিসি ভেংচি কেটে এবং মুড়ো ঝাঁটা দেখিয়ে সেই ছড়া গাইতে শুরু করেছে!

রাগে-দুঃখে হরিপদ ভাবল, নিকুচি করেছে গাঁয়ের লোকের! তার চেয়ে বরং কোনরকমে যদি কলকাতা চলে যায় ফের, তাহলে অন্তত আলিপুর চিড়িয়াখানায় গিয়ে ঢুকতে পারলে আর ভয় নেই। অন্তত পেটের খাওয়াটা জুটবে।

হরিপদ তো আর মানুষ হয়ে নেই যে বাসে চাপবার চেষ্টা করবে। সাত মাইল নাক বরাবর মাঠ বনবাদাড় পেরিয়ে সে রেল স্টেশনে পৌঁছুল। প্ল্যাটফর্মে একটা ঝাঁকড়া গাছে পাতার আড়ালে বসে ট্রেনের অপেক্ষা করতে থাকল।

ট্রেনটা এলে সে উঁপ করে ছাদে চড়ে বসল। তারপর আর কী? আর হাওড়া স্টেশনে পৌঁছুনো ঠেকায় কে?

কিন্তু বিপদ হল ট্রেন থেকে নামার পর।

হাজার হাজার লোক সবসময় স্টেশনে থইথই করছে। তাদের মধ্যে একটা হনুমান গিয়ে ঢুকলে কী হুলস্থূল না হবে! তাড়া খেয়ে হরিপদ সোজা উঠে পড়ল হাওড়া ব্রিজের মাথায়।

কলকাতা শহরে এ একটা ঘটনার মতো ঘটনা। এতকাল হাওড়া ব্রিজের মাথায় পাগলরা চড়ে ভেংচি কাটে। আজ কিনা একটা হনুমান চড়ে ভেংচি কাটছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লক্ষ লক্ষ লোক দাঁত বের করে ভেংচি কাটছে আর কাটছে।

খবর পেয়ে খবরের কাগজের লোকেরা এল। ক্যামেরা এল। টি ভি-র লোকেরাও এল। হরিপদর ছবি উঠতে থাকল ক্যামেরায়। কাল প্রথম পাতায় ছাপা হবে কাগজে। সন্ধের পর টি ভি-তে দেখানো হবে। এখন খালি হরিপদর সান্ত্বনা, মানুষ হয়ে তো এমন নাম ছড়াত না, ছবিও ছাপা হত না! ভাগ্যিস, লেজ গজিয়ে হনুমান হতে পেরেছে!

কিন্তু তারপর বিপদ এল।

দমকল আর চিড়িয়াখানার লোকেরা এসে গেছে খবর পেয়ে। হরিপদ একেবারে ডগায় গিয়ে কুঁকড়ে বসে আছে।

দমকলের লোকদের কত ফিকির আছে। খপ করে তাকে একটা খাঁচাকলে ঢুকিয়ে ফেলল এবং লম্বা মইয়ের সাহয্যে নামিয়ে আনল। তারপর গাড়ি চালিয়ে সোজা চিড়িয়াখানায় তুলল।

যাক, বাঁচা গেল। নিরাপদে থাকা যাবে। খাওয়া-দাওয়াও মিলবে। লোকের খাঁচার কাছে এলে মনের সুখে ভেংচি কাটা যাবে। হরিপদ খুশি।

কিন্তু সুখ আর বরাতে নেই। যেই না তাকে হনুমানের ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে, অমনি হনুমানগুলো যেন চমকে উঠেছে।

হরিপদ কোনায় বসে পিটপিট করে তাকিয়ে রইল। ওদের চোখে কেমন একটা সন্দেহ ফুটে বেরুচ্ছে যেন। সবচেয়ে ধেড়েটা অর্থাৎ পালের গোদা গম্ভীর মুখে হঠাৎ খ্যাঁক করে একটা ধমক দিল।

হরিপদর এখন হনুমানের ভাষা বুঝতে অসুবিধে নেই। গোদাটা তাকে বলছে—এই! তুই কোন্ ব্যাটারে?

হরিপদ হনুমানের ভাষায় বলল—চিনতে পারছ না দাদা? আমি তোমাদেরই একজন।

—চালাকি হচ্ছে? পালের গোদা তেড়ে এল। তোর গায়ে যে মানুষ মানুষ গন্ধ! তুই নিশ্চয় মানুষের ঘরে বড় হয়েছিস! ওরে জাতনাশা! তোকে গোবর খেতে—

অন্য একটা হনুমান বলল—ওর লেজটাও কেমন যেন বিচ্ছিরি। ছ্যা ছ্যা! একি লেজ?

পালের গোদা হুকুম দিল—আয় তো সবাই মিলে টেনে ছিঁড়ি। ওর একটা ভাল লেজ দরকার।

হুকুম পেয়েই সব হনুমান লেজটা ধরে জয় রাম বলে যেমনি হাঁক মেরে দিয়েছে হ্যাঁচকা টান, অমনি লেজটাও গেছে খুলে।

আর হরিপদও সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হয়ে উঠেছে।

একদল হনুমানের ভেতর একটা মানুষ ঢুকে পড়লে অবস্থা ভারি শোচনীয় হয়। হরিপদকে সবাই মিলে খামচাতে শুরু করল। দু-চারটে ক্ষুদে হনুমান সুড়সুড়িও দিতে থাকল। হনুমানের ভাষায় চেঁচাতে লাগল তারা —রাম! রাম! এটা যে মানুষ!

হরিপদ লাফালাফি জুড়ে দিল এবং চেঁচাতে থাকল—ওরে বাবা! ওরে বাবা! বাঁচাও! বাঁচাও! বাঁচাও.......

হরিপদ তাকাল। পিসি দাঁড়িয়ে আছে বিছানার পাশে। বলল......ও হরে স্বপ্ন দেখছিলি ? ওঠ, ওঠ কত বেলা হয়েছে।

হরিপদ একলাফে উঠে বসল। স্বপ্ন দেখছিল? তাই বটে। কিন্তু পিঠের দিকে শিরদাঁড়ার নীচের ব্যাপারটা যদি সত্যি হয়। ওই স্বপ্নটাই বা সত্যি হতে বাকি থাকে কেন?

ওই তো তার ভবিষ্যত। সব স্পষ্ট দেখতে পেল।

হরিপদ কাঁদো কাঁদো মুখে বলল—ও পিসি, হারু কবরেজকে একবার খবর দাও না গো। আমার...........আমার নাকি লে-লে-লে........

হরিপদ মাঝে মাঝে তোৎলামি করে। পিসি বলল—কেন রে? হারুদাকে কেন?

উঠোন থেকে সেই সময় কে ডাকল—ও হরে! কলকাতা থেকে এসেছিস শুনলুম—দেখা করতে যাস নি যে বড়?

মেঘ না চাইতেই জল। হারু কবরেজ এসে গেছেন। ঘরে ঢুকতেই হরিপদ লুটিয়ে প্রণাম করল। তারপর বলল—ও পিসি, তুমি হারুজ্যাঠার জন্যে চা আনো। ততক্ষণে আমি অসুখটা দেখিয়ে নিই।

পিসি বেরুলে হরিপদ দরজা বন্ধ করে চাপা গলায় বলল—জ্যাঠামশাই, দেখুন তো এটা কি গজাচ্ছে শিরদাঁড়ার নীচে!

হারু কবরেজ দেখেই ফিক করে হেসে বললেন----ব্যাঘ্রস্ফোট!

ওরে বাবা! হরিপদ আঁতকে উঠল। তারক কবরেজ বলেছেন যা, তাতে হনুমান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। হারু কবরেজ যা বলছেন, তাতে যে বাঘ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হরিপদ ভয় পেয়ে বলল—বাঘের লেজ? ওরে বাবা! তাহলে কি সোঁদরবনেই গিয়ে ঢুকতে হবে?

হারু কবরেজ বললেন—তোমার মাথা! ব্যাঘ্রস্ফোট মানে পাড়াগাঁয়ে যাকে বলে বাঘা ফোঁড়া। বুঝলে? তোমার ওটা ফোঁড়া হয়েছে। ভোগাবে। ঠিক আছে। ওষুধ দিচ্ছি। কালই ফেটে যাবে! ভেবো না! আসলে এবছর যা গরম পড়েছিল, ঘরে ঘরে সব্বারই শুধু ফোঁড়া হচ্ছে।

হরিপদ এবার বাঘের মত লাফ দিয়ে ফের কবরেজের পায়ের ধুলো নিল।

মুরারীবাবুর আলমারী

মুরারীবাবুর একটা আলমারি কেনার দরকার ছিল। কাঠের আলমারি আজকাল কেউ পছন্দ করে না। স্টিলের আলমারির রেওয়াজ বেড়েছে। ওঁর বন্ধুরা পরামর্শ দিয়েছিলেন—ভাল কোম্পানির নতুন স্টিলের আলমারির যা দাম, তার চেয়ে বরং—টেরেটিবাজার কিংবা চীনাবাজার গিয়ে নীলামী জিনিস খুঁজে কেনো। দাম কম পড়বে। জিনিসও পাবে খাঁটি। আজকাল ভেজাল জিনিসে বাজার ছেয়ে গেছে।

মুরারীবাবুর কানে ধরেছিল কথাটা। খোঁজ নিয়ে জানলেন, ওই এলাকায় চ্যাং চুং ফুঃ কোম্পানির নীলামি কারবার আছে। ফি রোববার সেকেলে নায়েবী আমলের আসবাবপত্র নীলাম হয়।

অতএব এক রোববার সকাল নটায় গিয়ে হাজির হলেন চ্যাং চুং ফুঃ কোম্পানির দোকানে। বিশাল দোকান। হরেকরকম বনেদী আসবাবে ভর্তি। তার মধ্যে খুঁজে খুঁজে কোনার দিকে একটা ছাইরঙা স্টিলের আলমারি পছন্দ হল। বেশ বড়ো আলমারি। একটা আয়নাও লাগানো রয়েছে। দোকানের চীনা কর্মচারী মুরারীবাবুর আগ্রহ দেখে বলল—পছন্দ যখন হয়েছে, এক কাম করুন বাবু। বড়সাবকে গিয়ে বলেন, দুদশ রুপেয়া জাস্তি দিলেই আপনার হয়ে যাবে।

মুরারীবাবু অবাক হয়ে বললেন—কেন? এটা বুঝি নীলামে বেচা হবে না?

—না বাবু। কর্মচারীটি জানাল। এটা বাড়তি মাল আছে। দেখছেন না, সেজন্যেই এটা একেবারে তফাত করে রাখা হয়েছে?

মুরারীবাবু ভাবলেন, তাই বটে। আলমারিটা সেজন্যেই আলাদা রাখা আছে এবং এটার কাছে কেউ আসছে না। কিন্তু নীলামী জিনিস না হলে যে দাম বেশি পড়ে যাবে। তাহলে নতুন কেনাই তো ভাল। বললেন—তাহলে এটার দরকার নেই। নীলামী জিনিস কোথায় আছে দেখা যাক।

চীনা কর্মচারী এবার ওঁর কানে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল—আমার কথা শুনুন বাবু। এ বহুৎ ভাল মাল আছে। আজকাল এমন আলমারি পাবেন না কোথাও। বড়াসাবকে গিয়ে ধরুন, কম দামে মিলে যাবে।

মুরারীবাবু অবাক হলেন। ব্যাপারটা বেশ সন্দেহজনক। বললেন—কই, খুলে দেখাও তো, দেখি ভেতরটা কেমন?

কর্মচারীটি পকেট থেকে চাবি বের করে আলমারিটা খুলতেই ঘ্যা-আ-চ্ করে মারাত্মক আওয়াজ হল। এমন বিতিকিচ্ছিরি আওয়াজ যে ঘরসুদ্ধ লোক চমকে

উঠল। মুরারীবাবুরও পিলে চমকে ওঠার দাখিল। কর্মচারাটি একগাল হেসে বলল—মাৎ ঘাবড়াইয়ে বাবু। ভাল আলমারির এটাই তো গুণ। চোরডাকাত খুললেই আপনি জানতে পারবেন। ধরা পড়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে। হাঃ-হাঃ, হাঃ।

আলমারিটা ওয়ার্ড্রোবও বটে। কাপড়জামা টাঙানোর ব্যবস্থা আছে। টাকাপয়সা, সোনাদানা রাখার লকার আছে। দলিলপত্র ফাইল রাখার তাক আছে। ভেতরে কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ। মাথা ঝিমঝিম করে উঠে। যেন নেশা ধরে যায়। দেখেশুনে মুরারীবাবু যেন বড্ড মায়ায় পড়ে গেলেন আলমারিটার। ঝোঁক চেপে গেল, এটা কিনতেই হবে।

চীনা কর্মচারীটি বলল পসন্দ হল তো? হবেই তো জানা কথা। এখন চলেন, বড়সাবের কাছে নিয়ে যাই আপনাকে।

আলমারির পাল্লা বন্ধ করতে কিন্তু একটুও শব্দ হল না! এ তো ভারি অবাক আলমারি! মুরারীবাবু খুশি হলেন। খুললে বিকট আওয়াজ হচ্ছে! হোক্ না। ক্ষতি কী? যখনই অন্য কেউ তাঁর অজান্তে খুলতে যাবে, তিনি টের পাবেন। তার উপর আসল কথা, তিনি একা মানুষ। বাড়িতে থাকবার মধ্যে এক ওই গুণধর ভাগ্নে বীরু, আর ঠাকুর কাম-ভৃত্য জটিল ওরফে জটা। দুটিতেই মহা ধড়িবাজ চোর। সেজন্যেই তো এই আলমারি কেনার কথা মাথায় এসেছিল। কিন্তু এবার? এবার তোরা কীভাবে চুরিচামারি করবি দেখা যাবে। মুরারীবাবু যত একথা ভাবলেন, তত জেদ চড়ে গেল মাথায়। যত টাকা লাগুক কিনতেই হবে আলমারিটা।

পার্টিশনের আড়ালে একটা চেম্বারে তাঁকে নিয়ে গেল কর্মচারীটি। মুরারীবাবু দেখলেন, ইয়া হোঁৎকা মোটা গোলগাল প্রকাণ্ড আর একজন চীনা ভদ্রলোক বসে আছেন। একটু হেসে খুব খাতির দেখিয়ে ইংরাজীতে বললেন —বসুন স্যার। বলুন, কী করতে পারি?

মুরারীবাবু বললেন—ওই আলমারিটা........

কথা কেড়ে ভদ্রলোক বললেন—বুঝেছি, বুঝেছি। বেশ তো নিয়ে যান।

বলে কী! বিনিদামে দেবে নাকি—এমনভাবে বলছে কথাটা? মুরারীবাবু বললেন—কিন্তু দাম-টাম কিরকম লাগবে, যদি বলেন!

চীনা ভদ্রলোক কুমড়োর মতো রাঙা ও বৃহৎ মুখে বিরাট হাসি ফুটিয়ে বললেন—আপনার যা খুশি দেবেন! ব্যস! আমি কিছু বলব না!

—সে কী! ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন মুরারীবাবু। ঠাট্টা করছে নাকি?

—হ্যাঁ স্যার। পছন্দ যখন হয়েছে, নিয়ে যান।

—তার মানেটা কী বুঝিয়ে বলবেন? মুরারীবাবু জিগ্যেস করলেন।

এবার চীনা ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বললেন—ওই আলমারির মালিক ছিলেন হো হো হুয়া নামে আমার এক বন্ধু। এখন তিনি হংকংবাসী। যাবার আগে ওটা আমাকে দিয়ে বলে গেছেন, যেন জিনিসটার দাম নিয়ে কারও সঙ্গে দরাদরি না করি। কেউ যদি খুব পছন্দ করে কিনতে চায়, সে হাতে তুলে যা দেবে, আমাকে নিতে হবে।

মুরারীবাবু অবাক হয়ে বললেন—তা আমি ছাড়া আর কারুর পছন্দ হয়নি বুঝি?

ঘাড় নাড়লেন ভদ্রলোক। —হয়নি।

—কেন পছন্দ হয়নি? জিনিসটা তো ভালই মনে হল। মুরারীবাবু বললেন।

চীনা ভদ্রলোক বললেন—ওই বিশ্রী আওয়াজটার জন্যে। বুঝলেন কিনা? আজকাল লোকের যেন ভারি অদ্ভুত মনোভাব। আলমারি হোক, আর মোটরগাড়ি হোক—আওয়াজ বরদাস্ত করতে পারে না। সাইলেন্সার লাগায় গাড়ির ইঞ্জিনে। বুঝলেন কিনা?

মুরারীবাবু বুঝলেন। আবার বুঝতেও পারলেন না। আওয়াজের কথা বলছে, কিন্তু পাড়ায় যে অষ্টপ্রহর মাইকে হিন্দী গান বাজে, তার বেলা? তখন তো দিব্যি সয় সবার। বললেন—একটু তেল-টেল দিলেই তো আওয়াজটা বন্ধ হয়ে যাবে। এটা কারুর মাথায় আসে নি?

ভদ্রলোক আবার হাসলেন।—না স্যার। ও আওয়াজ দু-চার কুইন্ট্যাল তেলে ঢেলেও বন্ধ হবার নয়! ওটাই তো ওর মজা। কিন্তু কে কাকে বোঝায়? তাছাড়া আলমারির এরকম আওয়াজ থাকা তো ভালই। চোর ডাকাত যদি.....

বাধা দিয়ে মুরারীবাবু বললেন—দেখুন। আমার যখন পছন্দ হয়েছে, জিনিসটা আমি নেব। ন্যায্য দাম দিয়েই নেব।

বলে পাঞ্জাবির ভেতর পকেট থেকে যা হাতে এল, চোখ বুজে টেবিলে রেখে দিলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। বললে—আশাকরি, আলমারিটা এখন আমি নিয়ে যেতে পারি।

—স্বচ্ছন্দে। বলে চীনাভদ্রলোক ঘন্টার বোতাম টিপলেন। একজন কর্মচারী এসে ঢুকল, তখন বললেন—ইনি আলমারিটা কিনেছেন। যাও কুলির ব্যবস্থা করো।

আলমারি তো পৌঁছে গেল। মুরারীবাবুর শোবার ঘরে জায়গা মতো দাঁড় করিয়ে চ্যাং চুং ফুঃ কোম্পানির কুলিরা চলে গেল। ভাড়া দিতে গেলেন, ওরা নিলে না। ক্যারিং চার্জ কোম্পানির। বাড়তি পয়সা দিলে ওদের ছাঁটাই করে দেবে কোম্পানি। এমন কড়া নিয়ম।

জটিল আর বীরু আলমারিটা দেখে খুব প্রশংসাই করল। মুরারীবাবু তাদের ব্যাপারটা টের পাইয়ে দিতে চাবি বের করলেন। তারপর পাল্লার হাতল ধরে টান দিলেন। অমনি মনে হল, কানের ভেতর গরম সীসে ঢুকে যাচ্ছে। বাড়িসুদ্ধ একেবারে কেঁপে উঠেছে। জটিল দুকানে হাত ঢেকে ওরে বাপ রে বলে লাফিয়ে উঠেছে। বীরু প্রায় ভিরমি খাবার দশা। সে চেঁচিয়ে উঠল—ও মামা! এ যে সাংঘতিক ব্যাপার!

মুরারীবাবু চমকে গিয়েছিলেন। এ-বাড়ি এসে যেন আওয়াজটা তিনগুণ বেড়ে গেল! দোকানে তো এত বেশি আওয়াজ হয় নি। কিন্তু কথাটা আর বললেন, না। মুচকি হাসলেন শুধু।

বীরু বলল—মামা, অয়লিং করা দরকার। নয় তো আর সব ফ্ল্যাটের লোক থানাপুলিশ করে বসবে। ডিসটার্ব হবে যে!

মুরারীবাবু তাচ্ছিল্য করে বললেন—হাতি করবে। ঘোড়া করবে। আমি কারুর ডিসটার্ব হবে বলে আলমারি খুলতে পারব না? আব্দার আর কী।

বীরু আবার বলল—অয়েলিং করলেই তো হয়।

মুরারীবাবু ফ্যাঁচ করে হেসে বললেন—বেশ তো অয়লিং করে দ্যাখ না তুই।

যদি আওয়াজ বন্ধ হয়, তো হোক!

বীরু দৌড়ে কিচেন থেকে নারকেল তেলের শিশি নিয়ে এল। তারপর পাল্লার কব্জাগুলোতে ঢেলে দিল। পাল্লা বন্ধ করে বলল—দেখছ? আর কোন শব্দ নেই?

মুরারীবাবু মিটিমিটি হেসে বললেন—হুঁ। এবার খোল তো দেখি।

বীরু যেই হাতল ধরে টেনেছে, অমনি যেন আবার কানে গরম সীসে ঢুকে পড়েছে। এবার আওয়াজটা আরও বেশি। আরও বাড়ি-কাঁপানো যেন প্লেন ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে। ওদিকে সারা বাড়ি হুলস্থূল। অন্য ফ্ল্যাটের লোকেরা বেরিয়ে পড়েছে। তাদের ধারণা ওপরতলার ছাদ বুঝি ধসে পড়েছে। সে এক হইহই কাণ্ড। চ্যাঁচামেচিতে রাস্তায় ভিড় জমে গেল দেখতে দেখতে। কারা চেঁচিয়ে বলতে থাকল—দমকল! পুলিস!

মুরারীবাবু থ। একেবারে কাঠপুতুল। মুখে কথা নেই। হ্যাঁ, এজন্যেই চ্যাং চুং ফুঃ কোম্পানি আলামারিটা তাঁকে গছিয়ে দিয়েছে। সব রহস্য বোঝা গেল বটে।

ওদিকে লোকেরাও অবাক। কোথাও তো কিছু ভেঙে পড়েনি। অথচ আওয়াজটা ঠিকই শোনা গেছে। এক ফ্ল্যাটের লোকেরা অন্য ফ্ল্যাটের লোককে জিগ্যেস করে বেড়াচ্ছে, কিসের শব্দ হল বলুন তো? মুরারীবাবুর ফ্ল্যাটেও এল কেউ কেউ। বুদ্ধিমান জটিল দরজা থেকে বিদায় করে বলল—প্লেন যাচ্ছিল। আবার কী?...

এই অদ্ভুত আলমারি কিনে মুরারীবাবু সমস্যায় পড়ে গেলেন। কোন কাজেই লাগনো যাবে না যে! জিনিসপত্র রাখতে হলেই খুলতে হবে। এবং যা বোঝা যাচ্ছে, খুললেই প্রতিবার আওয়াজ ক্রমশ বাড়তে থাকবে। প্রথমবারের চেয়ে দ্বিতীয়বার তিনগুণ বেড়েছে। তৃতীয়বার বেড়েছে তারও তিনগুণ যেন। চতুর্থবার খুললে না জানি কী প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড হবে। তাই বন্ধ করে রেখে দিয়েছেন। একটা কাজ অবশ্য হচ্ছে। চুল আঁচড়ানো আর দাড়ি কামানো। আয়নাটা খুব ভাল। পরিষ্কার প্রতিমূর্তি ফোটে। বরং চেহারা যেন সুন্দরতম দেখায়। মুরারীবাবু নিজের চেহারা সম্পর্কে এতকাল খুঁতখুঁতে ছিলেন। তাঁর নাকটা বেজায় লম্বা এবং ডগাটা থ্যাবড়া। স্বাস্থ্যও লিকলিকে কিন্তু এখন এই আয়নার সামনে দাঁড়ালে কী চমৎকার না দেখায়।

আলমারিটা ফেরত দেবার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু শুধু আয়নাটার খাতিরেই রেখে দিলেন।

এক রাত্রে মুরারীবাবু শুতে যাবার আগে অভ্যাসমতো চুল আঁচড়াচ্ছেন। হঠাৎ চমকে উঠে দেখলেন, আয়নার মধ্যে তাঁর পিঠের কাছে একটা বেঁটে চীনা লোক দাঁড়িয়ে আছে।

মুরারীবাবু সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলেন। কিন্তু আশ্চর্য! চীনা কেন, কোন লোকই তার পিঠের কাছে দাঁড়িয়ে নেই। তাহলে কি চোখের ভুল? আয়নার দিকে আবার ঘুরলেন! আর ঘুরেই চমকে উঠলেন। হ্যাঁ, দিব্যি পিঠের কাছে চীনা লোকটা দাঁড়িয়ে আছে এবং মিটিমিটি হাসছে।

ভয়ে বুক টিপ টিপ করে উঠল। এ যে মারাত্মক ভুতুড়ে কাণ্ড! মুরারীবাবু বরাবর সাহসী এবং জেদী মানুষ। কিন্তু ব্যাপারটা দেখে তাঁর গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। তক্ষুণি দুহাতে চোখমুখ ঢেকে কাঁপতে কাঁপতে খাটে গিয়ে বসে পড়লেন।

একটু পরে ধাতস্থ হয়ে ভাবলেন, নাঃ চোখের ভুল ছাড়া কিছু নয়।

হ্যালুসিনেসান নামে একটা ব্যাপার আছে। মানুষ অনেক সময় ভুল দেখে। কারুর কারুর ঐ একটা স্থায়ী মানসিক ব্যাধি। তাঁর সেই ব্যাধি-ট্যাধি হয় নি তো?

তা কেন হবে? দিব্যি সুস্থ মানুষ। কোন রোগ বালাই নেই। মাথাও ধরে না। ঘুমও ভাল হয়। ক্ষিদে হয়।

মুরারীবাবু আবার সাহস করে আয়নার সামনে গেলেন। তারপর তাকালেন। ওরে বাবা! এবার যে সাংঘাতিক ব্যাপার! সেই বেঁটে চীনা লোকটির গলার কাছটা কাটা এবং গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে। অথচ সে কেমন মিটিমিটি হেসে তাকিয়ে আছে। আর সহ্য করতে পারলেন না মুরারীবাবু! পরিত্রাহি আর্তনাদ করে উঠলেন খুন! খুন! খুন!

সে রাতেও খুব হইহই কাণ্ড হয়েছিল। বীরু ও জটিল ভেবেছিল, মুরারীবাবুকে ডাকাতে বুঝি খুন করেছে। পাড়াসুদ্ধু লোক জড়ো হয়েছিল। পুলিসও এসেছিল। কিন্তু কোথায় খুন—ডাকাতই বা কোথায়? মুরারীবাবু অবশ্য অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন আলমারিটার সামনে। ডাক্তারবাবু এসে ওষুধ দিলে জ্ঞান ফিরল। চোখ খুলেই বললেন—আলমারি হটাও।

পরের দিন টেম্পো ভাড়া করে আলমারিটা নিয়ে গেলেন চ্যাং চুং ফুঃ কোম্পানির দোকানে। সেই চীনা-কর্মচারীটি একগাল হেসে বলল—আসুন বাবু! এত দেরি হল যে?

মুরারীবাবু তেতো হয়ে বললেন—কিসের দেরি?

—এর আগে যাঁরা নিয়ে গেছেন পরদিনই ফেরত এনেছেন। আপনি বাবুজী পাঁচদিন পরে আনলেন যে?

—আমার খুশি! বলে মুরারীবাবু আলমারিটা আগের জায়গায় রাখবার ব্যবস্থা করে চলে আসছেন—চীনা কর্মচারী তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দরজা অবধি এল, ফিসফিস করে জানাল—জিনিস ভাল। তবে বড্ড গোলমাল করে। হো হো হুয়া সাহেবের আলমারি। ডাকাতেরা ওঁকে খুন করে ওর মধ্যে ভরে রেখে গিয়েছিল। এক বছর পরে তালা ভেঙে তবে ব্যাপারটা জানা যায়। মরচে ধরে গিয়ে খুব আওয়াজ হয়েছিল খোলার সময়। পালিশ করে সব ঠিকঠাক হয়েছে। শুধু আওয়াজটা বন্ধ করা যায় নি। আচ্ছা বাবু, আবার আসবেন। নমস্কার।...

তুরুপের তাস

এক
কাগজের খবর

অক্টোবর মাসের এক অত্যুজ্জ্বল রবিবারের সকালে কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ফ্ল্যাটে আড্ডা দিতে গিয়ে দেখি, বৃদ্ধ প্রকৃতিবিদ একপ্রকার কিম্ভূত আকৃতির ক্যাকটাসের সামনে চোখ বুজে ধ্যানস্থ রয়েছেন এবং তাঁর কানে হেডফোন চাপানো। হেডফোনের তার গিয়ে ক্যাকটাসটার গায়ে বেঁধানো একটা আলপিনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকেছিলুম, বুড়োকে একটু চমকে দেবার আশায়। কিন্তু উল্টে আমাকেই ভীষণ চমকে উঠতে হল, যখন উনি হঠাৎ ঠকঠক করে কেমন অদ্ভুত ভংগিতে কাঁপতে শুরু করলেন।

আমি ভাবলুম, ইলেকট্রিক শক খেয়েছেন কর্নেল। তাই শশব্যস্তে কাছে গিয়ে প্রথমে দেয়ালের সুইচবোর্ডের সঙ্গে হেডফোনের সংযোগ খুঁজলুম। না দেখতে পেয়ে ধারণা হল, হয়তো ওই উদ্ভুট্টে উদ্ভিদটা থেকেই কোনো মারাত্মক বিদ্যুৎশক্তি নির্গত হয়ে ওঁকে মুহুর্মুহু শকে জর্জরিত করছে।

অতএব তক্ষুণি ক্যাকটাসের গা থেকে পিনটা উপড়ে ফেললুম।

অমনি কর্নেল 'আহা হা' করে বাজখাই গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন এবং আমাকে দেখতে পেয়ে করুণ স্বরে বললেন, করলে কী জয়ন্ত! আমার বাইশ ঘণ্টার রক্ত জল করা পরিশ্রম বরবাদ করে ফেললে?

আমি তো অপ্রস্তুত। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললুম, আমি ভেবেছি আপনার ইলেকট্রিক শক লেগেছে।

কর্নেল হতাশ ভংগিতে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হেডফোনের মতো যন্ত্রটা মাথা থেকে খুলে বললেন, তুমি কী ক্ষতি যে করলে জয়ন্ত, তোমায় বোঝাতে পারব না। এই যে যন্ত্রটা দেখছ, এটা উদ্ভিদবিজ্ঞানী স্যার জগদীশ বসুর গবেষণার ওপর ভিত্তি করে এক রুশবিজ্ঞানী সম্প্রতি তৈরি করেছেন। উদ্ভিদের যে ভাষা আছে, তা এই যন্ত্রের মাধ্যমে বোঝা যায় এবং সে যা বলছে, তার জবাবও তার ভাষায় দেওয়া যায়।

অবাক হয়ে বললুম, আপনি ম্যালেরিয়ায় পাওয়া লোকের মতো ঠকঠক করে কাঁপছিলেন—তা কি ওই হতচ্ছাড়া ক্যাকটাস্টার সঙ্গে বাতচিত?

ঠিকই ধরেছ। বলে ঘুঘুমশাই কোণের দিকে আরামকেদারায় গিয়ে বসলেন। তারপর চুরুট ধরালেন।

পাশের ডিভানে বসে বললুম, না জেনে দোষ করার জন্য ক্ষমা চাইছি।

কর্নেল সস্নেহে হাসলেন। জয়ন্ত! তোমায় একটা বই দেব। 'দি সিক্রেটস অফ প্ল্যান্ট লাইফ।' পড়লে বুঝতে পারবে, উদ্ভিদ কীভাবে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়। যাক্ গে, বসো। কফি-টফি খাও। ষষ্ঠীকে বলি।

বলে তিনি ষষ্ঠীচরণকে হাঁক দেবার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করার সঙ্গে সঙ্গে ষষ্ঠীচরণ

ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল। একগাল হেসে বলল, কাগজের দাদাবাবু! প্রতাপগড়ের পেত্নীর খবরটা কি সত্যি গো?

ষষ্ঠী ইদানিং আমায় কাগজের দাদাবাবু বলে সম্ভাষণ করে। তবে দুঃখের বিষয় কাগজের লোক বলেই কাগজের খবরে আমার রুচি নেই। ময়রা কি সন্দেশ খেতে ভালবাসে? তাই বললুম, ষষ্ঠী! পেত্নীর খবরের চেয়ে তোমার কর্তামশাইয়ের যে কীর্তি এইমাত্র দেখলুম, সেটাই আজকের বড় খবর।

ষষ্ঠীচরণ বেজার মুখে চলে গেল। কর্নেল কফির পেয়ালা তুলে চুমুক দিয়ে বললেন, হুম! ষষ্ঠীকে অবহেলা করো না ডার্লিং। আজকাল আমি বিবিধ বিষয়ে ওর পরামর্শ নিই। জয়ন্ত, ইনটুইশান বলে একটা ব্যাপার আছে—যা প্রকৃতি অনেক মানুষকে দিয়েছেন এবং এতে শিক্ষিত অশিক্ষিত ভেদাভেদ রাখেন নি। তাছাড়া তুমি তো জানো, প্রখ্যাত নাট্যকার ইবসেন নাটক লিখে আগে তাঁর পরিচারিকাকে শোনাতেন।

বললুম, আপনার ভাষণের লক্ষ্য কী কর্নেল? প্রতাপগড়ের পেত্নী?

কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, ষষ্ঠীর মধ্যে প্রকৃতিদত্ত সেই সূক্ষ্ম বোধ আছে জয়ন্ত। আজ ওই খবরটার দিকে সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে বারবার। আমি ক্যাকটাস নিয়ে ব্যস্ত থাকায় মন দিতে পারি নি। তবে আমার ধারণা, খবরটা নিশ্চয় সামান্য খবর নয়।

পাশে টেবিলে সেদিনের কয়েকটা কাগজ ছিল। আমাদের কাগজ দৈনিক সত্যসেবককে আমি তত গুরুত্ব দিই না। তাই অন্য একটি বাংলা দৈনিক তুলে নিলুম। প্রথম পাতায় নিচের দিকে খবরটা দেখতে পেলুম।

ডাকুরাণী লছমীর প্রেতাত্মা?

প্রতাপগড়, ১২ অক্টোবর—সম্প্রতি এ অঞ্চলে অদ্ভুত ধরনের কয়েকটি ডাকাতির খবর পাওয়া গেছে। শেষ ডাকাতি ঘটেছে একটি পেট্রল পাম্পে। গতকাল এই পাহাড়ী শহরের প্রান্তে জাতীয় সড়কের ধারে একটি পেট্রল পাম্পে রাত নটার সময় ডাকুরাণী লছমী আচমকা হাজির হয়। তাকে দেখামাত্র পাম্পের কর্মচারীরা হতবাক হয়ে যায়। কারণ লছমী গতমাসে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হয়েছে এবং অসংখ্য মানুষ তার মৃতদেহ দেখেছে। অবিকল সেই রক্তাক্ত মৃতদেহ জীবিত মানুষের মতো পেট্রল পাম্পে উপস্থিত হয়েছে এবং তার হাতে যথারীতি রিভলবারও রয়েছে দেখে কর্মচারীরা আতঙ্কে কেউ মূর্ছিত হয়ে পড়ে, কেউ দিশেহারা হয়ে পালিয়ে যায়। পাম্পের মালিক পুলিশকে জানিয়েছেন, তাঁর ক্যাশে তখন সতের হাজার টাকা ছিল। সে-টাকা আর পাওয়া যায় নি। পুলিশের ধারণা, কেউ লছমী সেজে একাজ করে বেড়াচ্ছে। ইতিপূর্বে ঠিক এমনি ঘটনা আরও কয়েকটি ঘটেছে।

উল্লেখ করা যায়, এই পেট্রল পাম্পের মালিকের বাড়িতেও কদিন আগে মৃতা

লছমী একইভাবে হানা দেয়। তখন তিনি তাঁর রাইফেল থেকে গুলি চালান। আশ্চর্য, লছমীর গায়ে একটা গুলিও লাগে নি। পুলিশ অবশ্য এ ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে যে গুলি লক্ষভ্রষ্ট হয়েছিল।

কাগজটা মুড়ে রেখে দিলুম। কর্নেল বললেন, তোমার ইনটুইশান কি জয়ন্ত?

পুলিশ যা বলেছে।

অর্থাৎ কেউ লছমী সেজে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে?

হ্যাঁ, আবার কী?

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, ষষ্ঠীর ইনটুইশান অন্য কথা বলেছে।

লছমীর পেত্নী ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে?

না। ওই খবরের কিছু গোলমেলে ব্যাপার সে ধরিয়ে দিয়েছে।

কর্নেল মুখে সেই হাসি রেখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। মুখে রহস্যের ভঙ্গি—যা দেখে আমি বরাবর উত্তেজনা অনুভব করি। বললুম সংস্কৃত শ্লোকে আছে—সংসর্গজা দোষগুণাঃ ভবন্তি। তা ষষ্ঠীচরণ আপনার মতো ধুরন্ধর গোয়েন্দার সংসর্গে থেকে বুঝি পাতিগোয়েন্দা হয়ে উঠেছে? দেখুন কর্নেল, খবরের কাগজের প্রত্যেকটা খবরে গোলমাল থাকবেই থাকবে। সেটাই নিয়ম। কারণ খবর যিনি পাঠান এবং যিনি তা অনুবাদ করেন...

বাধা দিয়ে কর্নেল বললেন, জয়ন্ত, জয়ন্ত! আমার কথাটা আগে শোনো।

বলুন।

বরং এক কাজ করা যাক, ষষ্ঠীচরণের মুখেই তার ধারণার কথা শোনা ভালো। বলে কর্নেল ডাকলেন, ষষ্ঠী! ও ষষ্ঠী! এদিকে একবার আসবে কি?

ষষ্ঠীচরণ যেন ওৎ পেতেই ছিল। পর্দা তুলে গম্ভীর মুখে বলল, বলুন স্যার!

কর্নেল বললেন, পেত্নীর খবরের কী যে খটকা আছে বলছিলে তখন?

অভিমান দেখিয়ে ষষ্ঠী বলল, আছে। শুনলেন না তো!

এবার বলো, শুনব। তোমার কাগজের দাদাবাবুও শুনবেন।

ষষ্ঠী ফিক করে হাসল সঙ্গে সঙ্গে। বলল, মজাটা দেখুন। প্রতাপগড় তো স্যারের সঙ্গে কতবার আমি গেছি। কাগজের দাদাবাবুও গেছেন। টাউনের শেষে বড় রাস্তার ধারে পেট্রল পাম্প। কেমন তো? রাত নটায় সেই পাম্পে সতেরো হাজার নগদ টাকা মজুত রেখেছে মালিক! বিশ্বাস হয় বলুন?

বললুম, চুরি-ডাকাতির পর লোকে পুলিশকে বাড়িয়েই বলে।

বলুক না! কিন্তু একই লোকের ওপর পেত্নী দুবার হামলা করল? সতেরো হাজার টাকা এবং গুলি গায়ে লাগে নি—দুটোতে খটকা বাধছে কাগজের দাদাবাবু!

কিসের খটকা বুঝলুম না ষষ্ঠী?

ষষ্ঠী ক্ষুব্ধভাবে বলল, বেশি লেখাপড়া জানিনে কাগজের দাদাবাবু! কিন্তু আমার মনে খটকা বেধেছে। মনে হচ্ছে, বড় কিছু ঘটবে, এগুলো তারই গোড়াপত্তন। তাছাড়া ডাকাতি শুধু একজনই করল? দলবল সঙ্গে নেই, একা? আর তার চেয়ে বড় কথা, পেত্নী-ডাকাত? দেখবেন, নির্ঘাৎ বড় কিছু ঘটবেই।

ষষ্ঠীর হাবভাবে হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু বেচারাকে দুঃখ দেওয়া ঠিক নয় ভেবে

মুখে চিন্তার ভাব ফুটিয়ে বললুম, তুমি যা আঁচ করছ, সত্যি হতে পারে বৈকি।

আমার কথা শুনে সে কর্নেলের দিকে খুব আশা নিয়ে তাকাল। কর্নেল সেটা টের পেয়ে বললেন, ক্যাকটাসটা নিয়ে ব্যস্ত না থাকলে ব্যাপারটা দেখে আসা যেত। তাছাড়া এ শরতকালে প্রতাপগড়ের তুলনা হয় না। প্রকৃতি তাকে এ সময়টা দারুণ সাজিয়ে তোলে, না? হুম্‌ জয়ন্ত, রথদেখা কলা-বেচার সম্পূর্ণ সুযোগ ছিল! ষষ্ঠী হতাশভাবে ঘর থেকে কফির পেয়ালা দুটো নিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমি ষষ্ঠীর কথাটা তখনও ভাবছিলুম। লোকটার কপালে দুর্ভোগ আছে বোঝা যাচ্ছে। ওকে গোয়েন্দারোগে ধরেছে এবং সব তাতেই ওর খটকা লাগতে শুরু করেছে। প্রতাপগড়ের এক ভদ্রলোকের পেট্রল পাম্পে ও বাড়িতে দুবার ভূত সেজে কেউ ডাকাতি করেছে, তাই নিয়ে ও রীতিমতো একটা গোয়েন্দা-থিসিস খাড়া করে ফেলেছে।

বললুম, কর্নেল! আপনার এই অনুচরটিকে সামলান! এর ভবিষ্যৎ ভেবে শিউরে উঠছি।

কিন্তু কর্নেল আমার কথার জবাব দিলেন না। চেয়ারে তখনকার মতো বসে হেডফোন জাতীয় যন্ত্রটা পরতে ব্যস্ত রয়েছেন।

গতিক দেখে আমি উঠে দাঁড়ালুম। বললুম, আসি কর্নেল।

তবু কর্নেলের কোনো সাড়া না পেয়ে বেরিয়ে গেলুম। ওঁর এমন অদ্ভুত আচরণ এতদিনে গা সওয়া হয়ে গেছে। আজকাল আর একটুও গায়ে মাখিনে।

সেদিন কাগজের অফিসে আমার বিরতির দিন। দুপুরে ঘুমিয়ে গেছি খেয়েদেয়ে, একসময় ফোন বাজল। কানে তুলতেই চেনা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। —ডার্লিং জয়ন্ত! তুমি কি ঘুমোচ্ছিলে? দিনদুপুরে ঘুমই বাঙালির পতনের কারণ। তো শোন কাল ভোরে সাড়ে পাঁচটায় আমরা প্রতাপগড় রওনা হচ্ছি। তৈরি থেকো!

চমকে উঠেছিলুম। ডাক এসেছে নাকি সেখান থেকে?

হুম্‌। ঠিকই ধরেছ।

পুলিশের ডাক বুঝি?

কখনো না, কখনো না। মোহনপ্রসাদ সিং—মানে যাঁর পাম্পে লছমীরাণীর ভূত হামলা করেছিল, তিনিই আমাকে ডেকেছেন।

বলেন কী! যে কেউ ডাকলেই আজকাল বুঝি আপনি চাকরের মতো...

না, না। মোহনজী আমার সুপরিচিত জয়ন্ত। একবার ওঁর আতিথ্যে কাটিয়ে এসেছিলুম। অমায়িক সজ্জন মানুষ। সকালে তুমি চলে যাওয়ার পর উনি ট্রাঙ্ককল করেছিলেন।

তাহলে ষষ্ঠীচরণের গোয়েন্দাগিরি আর ঠেকানো গেল না।

না। হাসতে হাসতে কর্নেল বললেন, ঠিক আছে। তৈরি থেকো...

দুই
রক্তাক্ত মৃতদেহ

মোহনপ্রসাদ সিং প্রতাপগড়ে একসময়ে নাকি দামী মানুষ ছিলেন। কারণ তখন উনি রাজনীতি করতেন। পরে রাজনীতি ছেড়ে বাণিজ্যে মন দেন। খুব একটা বড় ব্যবসায়ী হতে পারেন নি। একটা পেট্রল পাম্প, একটা ট্রাক এবং একটা জিপগাড়ি, আর একটা কাঠগোলার মালিক হয়েছেন। মাইল পাঁচেক দূরে প্রতাপগড় রিজার্ভ ফরেস্ট। মরশুমে সেখানে সরকার বন এলাকায় গাছ বিক্রি করেন। টেন্ডার ডাকা হয়। মোহনজী তদ্বির করে টেন্ডার যোগাড় করেন। তবে চোরাই কাঠ চালানকারীরাও কম নেই তল্লাটে। যারা কাঠগোলার ব্যবসা করে, তারা তাদের মা-বাবা।

মোহনজীর বাড়িতে থাকাটা ঠিক মনে করেন নি কর্নেল। আমরা উঠেছি সেচ-দফতরের বাংলোয়। মোহনজী তাঁর জীপটা আমাদের সেবায় দিয়েছেন। ড্রাইভারের নাম মহাবীর। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা। লছমী ডাকুরানীর অসংখ্য গল্প সে জানে। কীভাবে লছমী নদীর ধারে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মারা পড়েছিল, তা সে স্বচক্ষে দেখেছে। লছমীর রক্তাক্ত লাসের একটা ভয়ংকর বিবরণ তার কাছে শুনেছি আমরা। তাছাড়া মোহনজীর পাম্পে ডাকাতির সময় সে ওখানে উপস্থিত ছিল। সেই রক্তাক্ত লাশকে জীবিত মানুষের মতো হানা দিতে দেখে আতংকে সে পালিয়ে গিয়েছিল!

শুধু তাই নয়, যে রাতে মোহনজীর বাড়িতে লছমীর ভূত হামলা করে, সে রাতেও সে খাটিয়া পেতে বারান্দায় শুয়েছিল। ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির মধ্যে লছমীর আবির্ভাব হয়। মহাবীর কিরে কেটে বলেছে, সেই রক্তাক্ত মড়া হয়ে লছমী বাড়ি ঢুকেছিল। মোহনজীর রাইফেল আছে। মাঝে মাঝে কাঠ আনতে জঙ্গলে যান বলে রাইফেল কিনেছেন। তো লছমীর দিকে পরপর চারটে গুলি ছোঁড়েন তবু লছমীর গায়ে আঁচড় লাগেনি। কিন্তু বাড়িসুদ্ধু লোক জেগে গেছে। হইহল্লা করেছে। তাই শেষপর্যন্ত অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায়।

পরদিন সকালে আমরা ব্রেকফাস্ট করতে বসেছি, কর্নেল সবে প্রাতঃভ্রমণ সেরে এসেছেন, এমন সময় আমাদের পরিচিত পুলিশ অফিসার শর্মাজী এসে হাজির হলেন।

শর্মাজী হাসতে হাসতে বললেন, মোহনপ্রসাদ আমাদের ওপর আস্থা রাখতে পারেন নি। তাই আপনাকে টেনে এনেছেন। তাতে অবশ্য আমি খুশিই।

কর্নেল যেন অপ্রস্তুত হবার ভান করে বললেন, না, না মিঃ শর্মা! আপনি তো বিলক্ষণ জানেন, প্রতাপগড় আমার কত প্রিয় জায়গা!

শর্মা চোখ নামিয়ে বললেন, লুকিয়ে লাভ নেই কর্নেল। স্বয়ং মোহনজী কথাটা আমাকে জানিয়ে এসেছেন। ওঁকে তো জানেন বড্ড খামখেয়ালী মানুষ। তবে একথা ঠিক, ইদানিং পরপর পাঁচটা এ ধরনের ডাকাতি হয়েছে প্রতাপগড়ে। পাঁচটাই লছমীর ভূতের কীর্তি বলে ভিকটিমরা স্টেটমেন্ট দিয়েছে। সময় রাত নটা থেকে দশটা, শুধু—একটি কেসে সন্ধেবেলা। আমার ধারণা, কেউ লছমী সেজে এসব করছে। কিন্তু কোন সূত্র আমরা খুঁজে পাচ্ছিনে।

কর্নেল বললেন, দুটো কেস তো মোহনজীর। বাকি তিনটে কোথায়—কোথায়, কীভাবে ঘটল। বলবেন কি মিঃ শর্মা?

শর্মাজী বললেন, তিনটেই নেহাত পেটি কেস। একটি স্লাম এরিয়ায়। এক বুড়ির ওপর হামলা করে তার অল্পস্বল্প টাকাকড়ি ছিনিয়ে নেয়। বুড়ি বাড়ি-বাড়ি ঝিয়ের কাজ করে পয়সা জমিয়েছিল। আর একটা এই রাস্তার ধারে চায়ের দোকানে! লোকজন বিশেষ ছিল না তখন। রাত প্রায় দশটা চা-ওলা ঝাঁপ ফেলতে যাচ্ছে, লছমীর ভূত হাজির। ...বাকি কেসটা রাহাজানির মতো। এক দেহাতী ছোট ব্যবসায়ী সাইকেলে চেপে সন্ধেবেলা ফিরে যাচ্ছিল। হাইওয়েতে হঠাৎ তার সামনে লছমীর ভূত এসে দাঁড়ায়। মজার কথা, দেহাতী লোকটির যে গ্রামে বাড়ি, লছমী সে-গাঁয়েরই মেয়ে। লোকটি ভয়ে ভির্মি খায়। জ্ঞান হলে দেখে টাকাকড়ি সব খোয়া গেছে।

আরও কিছুক্ষণ একথা সেকথা নিয়ে আলোচনার পর শর্মাজী চলে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, আপনাকে মোহনজী এনেছেন বলে অবশ্যই আমি এতটুকু ক্ষুব্ধ হইনি কর্নেল। বরং আপনার সাহায্য আমিও চাই। প্রতাপগড়ে কয়েকটা কেসে আপনার সাহয্যের জন্য পুলিশ এখনও কৃতজ্ঞ। নতুন অফিসাররা আপনার কথা জানেন না। আমি জানিয়ে দেব বরং।

শর্মাজী চলে গেলে কর্নেল বললেন, মোহনপ্রসাদ পুলিশের কানে আমার আসার খবর তুলতে গেলেন কেন? অদ্ভুত লোক তো!

বললুম, আপনার প্রতি মোহনজীর প্রবল আস্থা। তাই আপনাকে নিয়ে পুলিশের কাছে বাজি ধরেছেন।

অর্থাৎ আমি ওঁর তুরুপের তাস। বলে কর্নেল কী যেন ভাবতে থাকলেন।

বারান্দায় গিয়ে বসলুম। নিচে নদী। তার ওপারে একটা টিলার মাথায় লাল রঙের একটা বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। বাড়িটা আগে এসেও দেখেছি এবং কেন কে জানে, কেমন রহস্যের গন্ধ টের পেয়েছি। বাড়ির একতলাটা দেখতে কতকটা দুর্গের মতো। বহুকালের পুরনো দেওয়ালের ফাটলে আগাছা গজিয়ে রয়েছে। বাড়িটা নিশ্চয় হানাবাড়ি।

মহাবীর লনের ওপাশে মালীর সঙ্গে কথা বলছিল। তাকে ডেকে জিগ্যেস করলুম, ওই বাড়িটায় কে থাকে? কার বাড়ি বলতে পারো?

মহাবীর বলল, বাড়িটা স্যার প্রতাপগড়ের এম. এল. এ রঘুনন্দনজীর। ওঁর বাবা এক সায়েবের কাছে কিনেছিলেন শুনেছি। আজকাল ওখানে কেউ থাকে না। তাছাড়া ওখানে শঙ্খচূড় সাপ থাকে শুনেছি। তাই কেউ কাছে যেতেও ভয় পায়।

মহাবীরের সঙ্গে প্রতাপগড়ের হালচাল নিয়ে কথা বলছি, কর্নেল বেরিয়ে এসে বললেন, জয়ন্ত! আমি একটু বেরুচ্ছি। তুমি বরং মহাবীরকে নিয়ে জিপে করে ঘুরে এস কোথাও।

মহাবীর বলল, আপনাকে পৌঁছে দিই স্যার, যেখানে যাবেন। তারপর ছোট সায়েবকে নিয়ে বেরুব।

কর্নেল বললেন, না না। দরকার হবে না। আমি বেশিদূর যাব না।

কর্নেল আমাকে ফেলে যাওয়ায় মনে অভিমান জেগেছিল। কিন্তু ওঁর সঙ্গে

বেরুনোর ঝক্কি কী, মনে পড়ায় শেষ পর্যন্ত খুশিই হলুম। কোথায় কোথায় টো টো ঘুরবেন কে জানে! তার চেয়ে চুপচাপ প্রকৃতি দেখা আনন্দজনক।

মহাবীর বলল, যাবেন নাকি স্যার কোথাও ঘুরতে?

বললুম, বরং এক কাজ করা যাক। চলো, এই পোড়াবাড়িটা দেখে আসি।

আঁতকে উঠল মহাবীর। না স্যার। ভুলেও ওখানে পা বাড়াবেন না। তাছাড়া জিপ যাওয়ার রাস্তা নেই ওদিকে। বরং চলুন, ওয়াটার ড্যাম দেখিয়ে আনি।

দেখেছি তোমাদের ওয়াটার ড্যাম। তুমি যাও মহাবীর, গল্প করো গে মালীর সঙ্গে। আমি পায়দল ঘুরে আসি।

আমার কথা শুনে মহাবীর টের পেল আমি রাগ করেছি। সে কাঁচুমাচু মুখে বলল, আমার কথা বিশ্বাস করুন স্যার। ওখানে শঙ্খচূড় সাপের আড্ডা। মালীকে জিগ্যেস করুন!

মালী শুনছিল। সায় দিয়ে বলল, হ্যাঁ স্যার। বড্ড সাপ ওখানে।

এরপর আর ওই হানাবাড়িতে যাবার সাহস হল না। অগত্যা ঘরে গিয়ে জানলার ধারে একটা বই নিয়ে বসলুম।

একটু পরে খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, হানাবাড়িটা নদীর ওপারে দেখা যাচ্ছে। আর তার ছাদে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির ছাদের ওপর একটা প্রকাণ্ড গাছ ঝুঁকে পড়ায় তার ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটা ভাল করে ঠাহর হচ্ছিল না। কর্নেলের বাইনোকুলারটা খুঁজলুম। সঙ্গে নিয়ে গেছেন যথারীতি। অগত্যা বারান্দায় গিয়ে ভাল করে দেখার চেষ্টা করলুম।

এবার অবাক হয়ে গেলুম। মূর্তিটা স্ত্রীলোকের।

ওই পোড়ো বাড়িতে সাপের ভয় তুচ্ছ করে কোনো স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, এটা বেশ অস্বাভাবিক ব্যাপার। মহাবীরকে ডাকলুম। মহাবীর আমার কথা শুনে ওদিকে তাকাল। তারপর দুহাতে চোখ ঢেকে ভয় পাওয়া গলায় বলে উঠল, স্যার, স্যার! ওই সেই লছমী ডাকুনী!

শোনামাত্র আমার মাথায় জেদ চাপলো। দ্রুত ঘরে ঢুকে ব্যাগ থেকে আমার পয়েন্ট ৩৮ ক্ষুদে রিভালবারটায় গুলি ভরে বেরিয়ে এলুম। কিন্তু তখন আর মূর্তিটা নেই।

মহাবীর বলল, কোথায় যাচ্ছেন স্যার?

আসছি। বলে গেট পেরিয়ে রাস্তা থেকে বাঁদিকে নেমে বড় বড় পাথর আর ঝোপঝাড় পেরিয়ে সেই টেলার কাছে পৌঁছলুম। এবার ভয় জাগল। সাপের ভয়। সাবধানে নজর রেখে টিলায় উঠতে শুরু করলুম।

বাড়িটা কোনক্রমে টিকে আছে। আগাছার জঙ্গলে ঘিরে ফেলেছে তাকে। ফাঁকা জায়গা দিয়ে এগিয়ে প্রাঙ্গণে ঢুকলুম। তারপর মনে হল, বাড়িতে যেন মানুষ থাকার গন্ধ পাচ্ছি। এটা বুঝিয়ে বলা কঠিন, ষষ্ঠীর মতো একটা ইনটুইশান হতে পারে—কোন স্পষ্ট চিহ্ন না থাকলেও মনে হচ্ছিল, এখানে মানুষ বাস করে।

ঘরগুলোর কপাটে মরচেধরা তালা আটকানো রয়েছে। বারান্দার শেষপ্রান্তে সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে চলে গেলুম। কেউ কোথাও নেই।

হঠাৎ চোখে পড়ল একটা কালো ক্লিপ। চুল আঁটার মেয়েলি ক্লিপ। ক্লিপে চুল লেগে রয়েছে। শুঁকে সস্তা গন্ধতেলও টের পেলুম।

বাড়িটার আনাচে কানাচে তন্নতন্ন খুঁজেও সেই স্ত্রীলোকটিকে দেখতে পেলুম না। উঠানে দাঁড়িয়ে ভাবছি, দরজার তালা ভেঙে দেখব নাকি ভেতরে কী আছে, হঠাৎ আমার বাঁ-দিকে কয়েক গজ তফাতে আগাছার মধ্যে কী পড়ে আছে দেখতে পেলুম।

ঘাসে পা ফেলতে ভয় করছিল। শঙ্খচূড় থাকলে অবশ্য পায়ের শব্দে অনেক আগে ফণা তুলবে। লড়াই করার সময় পাব, অন্য বিষাক্ত সাপ থাকলে মুশকিল। গায়ে পা না পড়া পর্যন্ত অনেক বিষাক্ত সাপও ফোঁস করে না।

যা দেখলুম, আমার শরীরে রক্ত চলাচল থেমে গেল যেন।

একটি দেহাতী যুবতী চিত হয়ে পড়ে রয়েছে। তার গলা, কপাল ও বুকের ক্ষতচিহ্নে টাটকা রক্ত দলা বেঁধে রয়েছে। কাপড় রক্তে মাখামাখি। নিস্পন্দ মৃতদেহ ছাড়া কিছু নয়। মুখটা অবশ্য তত বিকৃত নয়।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড দেখে আর তাকাতে পারছিলুম না। এমন খুন-খারাপি দেখিনি, এমন নয়। কিন্তু একটু আগে এ বাড়ির ছাদে যাকে দাঁড়ায়ে থাকতে দেখেছি, সেই যে এইমাত্র খুন হয়েছে—আমি হয়তো যখন নদীর ব্রিজে ছিলুম তখনই—একথা ভেবেই আমার কষ্ট হচ্ছিল। তার আর্তনাদ কেন শুনতে পাইনি, সেটাই আশ্চর্য!

এখন দরকার খবর দেওয়া। সাপের কথা ভুলে হনহন করে এগিয়ে গেলুম। ভাঙা ফটক পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাচ্ছি, কর্নেলের টুপি দেখলুম ঝোপের আড়ালে। বুড়ো হাসিমুখে চাপা গলায় বললেন, জয়ন্ত যে!

রুদ্ধশ্বাসে বললাম, শিগগির আসুন! ওখানে একটা খুন হয়েছে।

বুড়ো একটুও চমকালেন না। বললেন, তাই নাকি? চলো তো দেখি।

ভেতরে যেতে যেতে ব্যাপারটা বললুম। কর্নেল কোনো মন্তব্য করলেন না। কিন্তু প্রাঙ্গণে সেই ঝোপের মধ্যে গিয়েই আমি আবার থ। লাশটা নেই।

বললুম, সর্বনাশ! এখানেই তো ছিল! গেল কোথায়?

কর্নেল হাঁটু দুমড়ে ঘাসের ভেতর থেকে কী একটা তুলে নিলেন। চমকে উঠে দেখি, রক্তের দলা ঘাঁটছেন আঙুলে। ছ্যা ছ্যা। ঘেন্না হচ্ছে না একটুও?

তিন
সম্ভাব্য ছয় নম্বর

না বলে পারলুম না আর। কর্নেল! করছেন কী! ওই নোংরা রক্ত ঘাঁটছেন কেন?

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে আঙুল দুটো আগাছার পাতায় মুছতে মুছতে বললেন, জিনিসটা ততকিছু নোংরা নয়, ডার্লিং!

তারপর এগিয়ে গেলেন বারান্দার কোনায় সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেলেন। পেছন পেছন গেলুম। কর্নেল বাইনোকুলার চোখে রেখে এদিকে-ওদিকে কী খুঁজছিলেন। একটু পরে একদিকে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। ডাকলেন, জয়ন্ত! ওই

দেখ তোমার শ্রীমতী মৃতদেহ স্নান করছেন। অর্থাৎ তেল-সিঁদুর ধুয়ে ফেলছেন।

বাইনোকুলারটা নিয়ে চোখে রেখে দেখি, হ্যাঁ—সেই দেহাতী যুবতীই বটে! নদীর বাঁকে মস্তো পাথরের আড়ালে ডোবামতো জায়গায় রগড়ে রগড়ে রঙ ধুচ্ছে।

বললুম, ব্যাপারটা কী বলুন তো?

কর্নেল একটু হেসে বললেন, ব্যাপারটা যৎকিঞ্চিৎ। ওখানে একজন পুরুষ মানুষও রয়েছে, যদি তুমি খুঁজে তাকে বের করতে পারো। সে আছে গাছের তলায় বসে।

দেখতে পেয়েছি কর্নেল! উত্তেজিতভাবে বললুম!

চিনতে পারছ তাকে?

আশ্চর্য! ওকে মহাবীর ড্রাইভার বলে মনে হচ্ছে।

দ্যাটস রাইট, ডার্লিং! এবারে চলে এস। কেটে পড়া যাক। সাবধান, আমরা এবার উল্টো দিকে বড় ব্রিজ পেরিয়ে বাংলোয় ফিরব।

কিছুক্ষণ পরে দুর্গম জায়গায় অশেষ কষ্ট করে হেঁটে হাইওয়ের বড় ব্রিজে পৌঁছলুম দুজনে। তারপর বললুম, আপনি ওখানে জুটলেন কী ভাবে?

কর্নেল চুরুট জ্বেলে ধোঁয়া ছেড়ে হাসতে হাসতে বললেন, আজ সকাল থেকে টোপ খেলানো হচ্ছে। অর্থাৎ বাংলোর উল্টোদিকে নদীর পারে রঘুনন্দনজীর ওই পোড়ো বাড়ির ছাদে আমাদের লছমীর প্রেতাত্মা দর্শনের ব্যবস্থা করে দিচ্ছিল কেউ। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েই আমার নজরে পড়েছিল! কিন্তু আমল দিই নি। তখন সঙ্গে দূরদর্শন যন্ত্রটা ছিল না। ফিরে এসে, তখনও তুমি ঘুমিয়ে আছ, বস্তুটা চোখে রেখে দেখলুম—হ্যাঁ, যা ভেবেছি তাই। তখন ঘুরপথে বেরিয়ে পড়লুম। এগোতে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি, তুমি আসছ। বুঝতে পারলুম কেন আসছ অমন হন্তদন্ত হয়ে। তবে তুমি আমার সঙ্গী এবং কলকাতার লোক। ভূত বিশ্বাস করবে না এবং অনর্থ ঘটাবে জেনে মহাবীরের বউ...

অবাক হয়ে বল্লুম, মহাবীরের বউ? বলেন কী!

হ্যাঁ জয়ন্ত।

কাল মোহনজীর বাড়িতে মেয়েটাকে দেখেছি আমরা।

তাই বলুন! কিন্তু হঠাৎ অমন লাশ হয়ে পড়েছিল কেন?

তোমাকে ধোঁকা দিতে। মুখোমুখি হতে যাচ্ছিলে প্রায়। হঠাৎ বুদ্ধি খাটিয়ে ও লাশ হয়ে পড়ে রইল। তুমি ধাঁধায় পড়ে গেলে। পুলিশকে খবর দিতে ছুটবে, এ তো জানা কথা! সেই ফাঁকে নিরাপদে পালাবার সুযোগ করে নিল।

তাহলে মহাবীরের বউ লছমীর ভূত সেজে ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে?

হুম্। বলে কর্নেল একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন! তারপর ফের বললেন, তখন বললুম না? আমায় মোহনজী তুরুপের তাস করতে ডেকে এনেছেন!

ঠিক বুঝলুম না।

বুঝবে সময় মতো। এস আপাতত আমরা কিছুক্ষণ প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করি।...

দুপুরে আজ মোহনজীর বাড়ি খাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। বাংলো থেকে নিয়ে যেতে এলেন মোহনজী নিজে। মহাবীরকে আর দেখতে পাইনি ত্রিসীমানায়! মোহনজীকে

সকলের ঘটনা জানাতে নিষেধ করেছিলেন কর্নেল। বলেছিলেন, যা বলার আমি বলব। তাই চুপ করে থাকলুম।

মোহনজী বললেন, দেরি হয়ে গেল কর্নেল সাব! অনুগ্রহ করে এবার আসুন!

কিন্তু কর্নেল গোমাড়ামুখে বললেন, ক্ষমা চাচ্ছি মোহনজি! রাত থেকে প্রচণ্ড পেটের অসুখে ভুগছি। ওষুধ খাচ্ছি। কিছু মুখে দেবার উপায় নেই! জয়ন্তকে নিয়ে যান!

মোহনজী অবাক হয়ে বললেন, সে কী! এতসব আয়োজন করেছি!

কর্নেল আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, উপায় নেই মোহনজী! আমি মহাবীরকে বলে পাঠাব ভেবেছিলাম, খুঁজে পেলাম না।

মোহনজী ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, এটা কেমন কথা! আমি কত আশা করে...

বাধা দিয়ে কর্নেল একটু হেসে বললেন, আপনার আশা না মেটাতে পারায় আমি দুঃখিত। আর মোহনজী, আমার এই এক বেয়াড়া স্বভাব—আমায় কেউ প্রতারণা করছে জানতে পারলে তার ছায়া আমি মাড়াইনে।

মোহনপ্রসাদ চমকে উঠলেন। আমি আপনাকে প্রতারণা করেছি! কী বলছেন?

হ্যাঁ। কর্নেল দৃঢ় স্বরে বললেন। আপনার ড্রাইভার মহাবীরের বউকে আপনি লছমীর ভূত সাজিয়ে এত কাণ্ড করেছেন। আবার সেই রহস্য ফাঁস করতে আমাকে ডেকে এনেছেন। উদ্দেশ্যটা কী?

মোহনপ্রসাদ চেঁচিয়ে উঠলেন, ঝুট। বিলকুল ঝুট! এ আপনি কী বলছেন?

কর্নেল অন্যদিকে ঘুরে বললেন, যা বলার আমি বলেছি। এখন আপনি আসতে পারেন।

মোহনপ্রসাদ রাঙা মুখে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন। বাইরে ওঁর জিপের আওয়াজ শোনা গেল। তারপর আমি বললুম, ওঁকে খামোকা রাগিয়ে দিলেন কেন কর্নেল?

কর্নেল বললেন, সাবধান করার জন্য। জানিয়ে দিলুম, ওঁর চালাকি ধরে ফেলেছি। আশাকরি তুমি আগাথা ক্রিস্টির এ বি সি মার্ডার পড়েছ। খুনীর উদ্দেশ্য সি-কে খুন করা। পুলিশকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার জন্য সে এ এবং বি-কে খুন করেছিল।

কিন্তু এক্ষেত্রে পাঁচটি কেস তো ডাকাতি। খুন নয়!

কর্নেল হাসলেন। ...প্রথম দুটো কেস মোহনপ্রসাদের পাম্প এবং বাড়িতে হামলার। ওটা ওঁর সাজানো গল্প। বাকি তিনটে ঠিক। কিন্তু প্রথম দুটোর উদ্দেশ্য লছমীর ভূতের কথা প্রচার করা। বাকি তিনটে সেই প্রচারের ভিত্তি মজবুত করতে। আমার ধারণা এবার ছনম্বর কেস আমার উপস্থিতিতে করার প্ল্যান ছিল মোহনজীর। যেহেতু উনি আমাকে এনেছেন এই রহস্যের পর্দা তুলতে এবং সে কথা পুলিশকে জানিয়েও দিয়েছেন, সেইহেতু এই পরিকল্পিত এবং সম্ভাব্য ছনম্বর কেসেও তাঁর প্রতি এতটুকু নজর পড়ার কথা নয় পুলিশের।

সেজন্য আপনি তুরুপের তাস কথাটা বারবার বলছিলেন?

ঠিক ধরেছ ডার্লিং।

ছনম্বর কেসে কী ঘটতে পারে ভেবেছিলেন?

একটা বড় কিছু। কর্নেল চিন্তিতমুখে বললেন। ষষ্ঠীর ইনটুইশান খুব খাঁটি। কিন্তু সেই বড়টা কী মাথায় আসছে না। তবে সেটা থেকে মোহনপ্রসাদ যাতে নিবৃত্ত হন, তাই মুখের ওপর জানিয়ে দিলুম সব কথা। আশাকরি আর উনি এগোবেন না।

বলে কর্নেল পায়চারি শুরু করলেন। বিড়বিড় করে বলতে শুনলুম, কী হতে পারত ছনম্বর ঘটনাটা? কী সেটা?

তারপর ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, জয়ন্ত! মনে হচ্ছে, এ বি সি মার্ডারের অন্তিম লক্ষ্যের মতো ওঁর যে নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওঁর জীবনে। পূর্বপ্রতিহিংসা চরিতার্থ করা—নাকি কোনো আর্থিক লাভালাভের ব্যাপার?

হাসতে হাসতে বললুম, যা ঘটেনি এবং আশাকরে আর ঘটবে না—আপনি যেহেতু ওঁর কীর্তিকলাপ জেনে গেছেন, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কী? এদিকে আমাদের খিদেও পেয়ে গিয়েছে। চলুন, কোনো হোটেলের দিকে পা বাড়াই।

কর্নেল বললেন, হুঁ, ছনম্বর ঘটনা আমি আটকে দিয়েছি। কিন্তু জানতে ইচ্ছে করছে, কী ঘটতে যাচ্ছিল! সম্ভবত সেটা শুধু ডাকাতি নয়, খুন-খারাপি। হ্যাঁ, লছমীর ভূতের হাতে একটি মৃত্যু।

করুণ মুখে বললুম, কর্নেল! আপনার সত্যি খিদে পেয়েছে।

বৃদ্ধ গোয়েন্দপ্রবর বিচলিত হয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে। হ্যাঁ, চলো, চলো।...

প্রতাপগড় থেকে ফেরার দিন পনের পরে কর্নেল একদিন ফোন করলেন। জয়ন্ত, প্রতাপগড়ের এম এল এ রঘুনন্দন সিংয়ের ডেডবডি পাওয়া গেছে নদীর ধারে। লছমীর ভূতের হাতেই খুন হবার কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি, স্রেফ খুন। শর্মাজী ট্রাংককলে জানালেন এইমাত্র। রঘুনন্দনের কাছে টিট হয়ে মোহনজী রাজনীতি ছেড়ে ছিলেন। অবশ্য আমি শর্মাজীকে লছমীর ভূত রহস্য ফাঁস করে না এলে মোহনজীকে সন্দেহ করতেন না ওঁরা। যাই হোক, মোহনজীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। লছমী আর মহাবীর তো আমরা চলে আসার পরই গা-ঢাকা দিয়েছিল। এখনও পুলিশ তাদের খুঁজছে। তাহলে দেখলে তো? ছনম্বর শিকার কে ছিল? ষষ্ঠীচরণের মাইনে বাড়িয়ে দিলুম, জয়ন্ত। সময় করে চলে এসো।...

বুজরুক

বাড়িতে ছোটোখাটো চুরি হয়েছে কিংবা কিছু হারিয়ে গেছে, তখন যার ডাক পড়ত, তার নাম ছিল মোনা। এসব ব্যাপারে তার অদ্ভুত ক্ষমতা দেখে সবাই তার নাম দিয়েছিল মোনা বুজরুক।

বুজরুকি সে জানত বটে। ছিঁচকে চোরেরা মোনার বুজরুকিতে ধরা পড়ে যেত আর বেদম পেটুনি খেত। তারপর তারা এলাকা ছেড়েই গা-ঢাকা দিয়েছিল। কিন্তু ধাড়ি চোরেরা বড় সেয়ানা। তারা মোনাকে খুশি রাখার চেষ্টা করত। শোনা যায়, এক অমাবস্যার রাতে তারা দল বেঁধে মোনার পুজো পর্যন্ত দিতে গিয়েছিল। সঙ্গে ফুল, বেলপাতা, ধূপধুনো আতপচাল, এক বয়োম-ঘি, এককাঁদি পাকা কলা ইত্যাদি

হরেক উপচার নিয়ে। কিন্তু মোনা বুজরুকের বুজরুকিতে ঠিক তখনই দুঁদে দারোগা তোরাপ খাঁ আঁধার ফুঁড়ে বেরিয়ে আসেন এবং চোর-বেচারারা পিঠটান দেয়। ফুল, বেলপাতা আর ধূপধুনোটা দারোগা মোনার জন্য রেখে বাকি জিনিস থানায় নিয়ে যান। পরে জানা গিয়েছিল ওগুলো সবই চুরির মাল।

মোনার সব বুজরুকিবিদ্যা নাকি তার চুলে। কারণ চুরির খবর পেয়ে এসেই সে পট করে একটা চুল ছিঁড়ে মন্তর পড়ে উড়িয়ে দিত এবং উড়ন্ত চুলের পেছন পেছন হাঁটতে থাকত। চুল গিয়ে চোরের বাড়ির ভেতর ঢুকে তার গায়ের ওপর পড়বেই। তখন বেগতিক দেখে চোর আঁতকে উঠে পালানো চেষ্টা করবে এবং লোকেরা তাকে তাড়া করে ধরে ফেলবে।

এর ফলে চোরেরা তার চুলগুলো কেটে নেওয়ার চক্রান্ত করেছিল। সেবার দারুণ গরম পড়েছে। মোনা খোলা জায়গায় খাটিয়া পেতে ঘুমোচ্ছে। চোরদের সর্দার যেই তার চুলে কাঁচি চালাতে গেছে, মোনা খপ করে তার হাতটা ধরে ফেলেছে। কাঁচি ফেলে তারা পালিয়ে বাঁচে।

তবে সেই কাঁচিটাও ছিল চুরির মাল। মকবুল দরজির ঘর থেকে চুরি করে এনেছিল। মকবুল কাঁচিটা ফেরত পেয়ে মোনা বুজরুককে বিনি মজুরিতে একটা ফতুয়া বানিয়ে দিয়েছিল।

মোনার বুজরুকি আমি প্রথম দেখি পিসেমশাইয়ের চটিজুতো হারানোর ঘটনায়।

পিসেমশাই ছিলেন প্রচণ্ড স্বদেশীওয়ালা মানুষ। তখন দেশে ইংরেজের আমল। বিলিতি জিনিস ছিল ওঁর চক্ষুশূল। খদ্দর পরতেন। চরকা কাটতেন। পায়ের জুতো বানিয়ে নিতেন ভরত মুচির কাছে। একবার ভরত ওঁকে একজোড়া চটি বানিয়ে দিয়েছিল। রাতারাতি তার একটা পাটি উধাও। তন্নতন্ন খুঁজে কোথাও পাওয়া গেল না। পিসেমশাই মনমরা হয়ে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে প্রায় অনশনব্রত পালনের দাখিল। তখন অনশনের খুব হিড়িকও ছিল।

গতিক দেখে ডাকা হল মোনাকে।

মোনা বেঁটে, রোগা গড়নের লোক। পরনে খেঁটে ধুতি, সম্ভবত মকবুল দরজির সেই লাল ফতুয়া। তার মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে তামার রিং, হাতে তামার বালা, পেল্লায় গোঁফ। চোখদুটো একেবারে টকটকে লাল। দেখলেই ভয় করে।

সে এসে পট করে নিজের একগাছা চুল ছিঁড়ে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিল। চুল উড়ে চলেছে আর পেছনে-পেছনে চলেছি আমরা বাড়িসুদ্ধ লোক। পিসেমশাই ভেতো মুখে অবিশ্বাসে ভুরু কুঁচকে বসে রইলেন।

সত্যি বলতে কী, চুলটা আমি দেখতে পাচ্ছিলুম না। বড়দিকে যতবার জিজ্ঞেস করি, খেঁকিয়ে ওঠে, "ওই তো! দেখতে পাচ্ছিস নে, হাঁদা কোথাকার?" ভয়ে-ভয়ে আবার বলি, "কই চুল?" শেষে বড়দি আমার মাথায় চাঁটি মেরে মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলল, "ওই দ্যাখ! পাচ্ছিস এবার দেখতে?" তখন অগত্যা বলতেই হল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওই তো! ওই তো উড়ে চলেছে।"

খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে মোনা যাচ্ছে আগে, তার পেছনে আমরা। ডোবার পাড়ে কলাবন। কলাবন থেকে আমবাগান। সেখান থেকে ভাঙা শিবমন্দিরের

বটতলা। তারপর আগাছার জঙ্গলে ঢুকে মোনা চেঁচাল, "খেয়েছে!"

বড়দি আর পিসিমা একগলায় বলল, "কী, কী?"

মোনা খ্যা-খ্যা করে হেসে বলল, "আদ্ধেক খেয়েছে। বাকি আদ্ধেক আছে দেখছি।" এই বলে সে হেঁট হয়ে একপাটি চটিজুতোর শুকতলা তুলে আনল। সবাই তার সঙ্গে বাড়ি ফিরলুম হইচই করে। বড়দি চেরা গলায় চেঁচাতে চেঁচাতে এল "ইউরেকা! ইউরেকা" বলে।

পিসেমশাইয়ের সামনে মোনা চটিটা রেখে বলল, "দেখলে পায়ে ভরে, পায়ের সঙ্গে মিলছে নাকি।"

পিসেমশাই গোমড়ামুখে পা বাড়িয়ে মিলিয়ে নিলেন। বললেন, "মিললে কী হবে হে, এ তো আর পরা যাবে না।"

পিসিমা বললেন, "কিন্তু ওপরকার চামড়টা কী হল?"

মোনা বুজরুক একগাল হেসে বলল, "তখন বললুম না, খেয়েছে।"

কিসে খেল তা তো বলছ না বাপু?"

মোনা বসে পড়ল। পকেট থেকে একটুকরো পোড়া কাঠকয়লা বের করে বলল, "তবে আঁক কষে দেখি।"

সে মাটির ওপর কালো আঁকজোক কেটে অনেক হিসেবনিকেশ করে এবং বিড়বিড় করে মন্তর আওড়ে ফুঁ দিতে থাকল। আমরা ঝুঁকে তাকিয়ে রইলুম আঁকজোকের দিকে! একটু পরে মোনা ফিক করে হেসে বলল, "কুকুরটার দোষ নেই মা! ব্যাটাচ্ছেলের বড্ড খিদে পেয়েছিল।"

বড়দি চেঁচিয়ে উঠল, "ভুলো! ভুলো!"

পিসেমশাই বললেন, "ভুলো মানে?"

"তপুর কুকুর ভুলোকে চেনেন না?"

তপু আমার বড়। সে হাত নেড়ে বলল, "নো, নো, নেভার! ভুলো চামড়া খেতে পারে? ওর হজমই হবে না।"

পিসিমা বললেন, "যত দোষ ভরতের। কাঁচা চামড়ার জুতো দিয়ে ঠকিয়ে গেছে।"

ঠাকুমা ভুলোকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। কারণ প্রায়ই ভুলো ওঁর খাটের তলায় ঢুকে ওত পেতে থাকত। ঠাকুমা বেরিয়ে এলেই তখন ওঁর ছাতুর বয়োম ধরে টানাটানি করত। দাঁত অভাবে ঠাকুমার খাদ্য ছিল ছাতু।

এতক্ষণে ঠাকুমা লাঠি ধরে নড়বড় করতে করতে বেরিয়ে মোনার উদ্দেশে বললেন, "অ্যাই মোনা! তুই কেমন বুজরুক হয়েছিস, ভুলোকে ধরে এনে আমার সামনে দে তো দেখি। আজ ওকে লাঠিপেটা করে ছাড়ব।"

মোনা বলল, "হুকুম যখন দিয়েছেন কর্তামা, তখন আর কথা কী?"

বসে সে পট করে ফের একগাছা চুল ছিঁড়ে আগের মতো মন্তর পড়ে ফুঁ দিয়ে ছেড়ে দিল। তপুর মুখ চুন সঙ্গে সঙ্গে। উড়ন্ত চুলের পেছনে আবার আমরা ছুটে চললুম। পেছনে তপুর ভ্যাঁ কানে এল; আবার খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে শিবমন্দিরের বটতলা। বড়দি এবার আমাকে খালি খোঁচাতে খোঁচাতে চলেছে, "কী রে, দেখতে

পাচ্ছিস তো?" আমি সত্যিসত্যি দেখতে পাচ্ছি না। একটা সূক্ষ্ম জিনিস চুল। যা উড়ে চলেছে দেখতে পাওয়া সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু চাঁটি খাওয়ার ভয়ে বলতেই হচ্ছে, "পাচ্ছি পাচ্ছি—ওই তো!" তাছাড়া সবাই দেখতে পাচ্ছে আর আমি পাচ্ছি না, তাই বা কী করে হয়? আমাকে সবাই বোকা ভাববে না?

মোনা বুজরুকি জানে বটে। মন্দিরের পেছনে ধসেপড়া ইটের চাবড়া প্রচুর। হঠাৎ সেখান থেকে তপুর আদরের নেড়িকুকুর ভুলো বেরিয়ে বিকট হাঁচতে শুরু করল। মোনা যেই তার ঠ্যাং ধরতে গেছে, সে লেজ গুটিয়ে গুলতির মতো দৌড়ুতে শুরু করল। সে সমানে 'ছ্যাঁও ছ্যাঁও' করে হাঁচতে হাঁচতে দৌড়ুচ্ছিল।

মোনাও দৌড়ুল। আগাছার জঙ্গল, তারপর চষা খেত আমরা সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। দুজনের রেস দেখতে থাকলুম। একটু পরে দুটিতেই উধাও হয়ে গেলে বড়দি বলল, "আয়! আমরা বাড়ি যাই। মোনা বুজরুক ওকে ধরে আনবে দেখবি।"

জিজ্ঞেস করলুম, "ভুলোর অত হাঁচি হচ্ছিল কেন বড়দি?"

বড়দি গম্ভীর মুখে বলল, "মোনার চুল ভুলোর নাকে ঢুকেছে যে। দেখবি, হাঁচির চোটে ভুলোর কী অবস্থা হয়।"

বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণ পরে মোনা ফিরে এল খালি হাতে। বলল, "নদী সাঁতরে ওপারে চলে গেল ব্যাটাচ্ছেলে। মড়াখেকো কুকুর যে! দিব্যি সাঁতার কাটতে জানে। নদীতে মড়া ভেসে যায়। এসব কুকুর তাই টেনে এনে খায়। মড়াখেকো না হলে চামড়া খাবে কেন? যাইহোক, দাদাভাই—" সে তপুকে সান্ত্বনা দিল, "কেঁদো না। এবার বরং বিলিতি কুকুর পোষো।"

পিসেমশাই কথাটা শোনামাত্র গর্জে বললেন, "বেরোও! বেরোও বলছি! বুজরুকি দেখাতে হবে না আর। বিলিতি কাপড় গাধায় পরে! বিলিতি কুকুর গাধায় পোষে।"

শেষ বাক্য দুটো যে স্লোগান, মোনা না জানলেও আমরা জানতুম।...

এর পর আরও কিছু বুজরুকি দেখেছিলুম মোনার। বড়দি ডোবায় ছাড়া স্নান করত না। খিড়কির পেছনে ডোবাটা ছিল খুব গভীর। বারোমাস জল থাকত। বড়দি তাতে সাঁতার কাটত। সাঁতার কাটার চোটে কতবার কানের দুল হারিয়েছিল ইয়ত্তা নেই। কিন্তু জলের তলা থেকে দুল উদ্ধার করতে হারু জেলেকেই ডাকা হত। সে জাল ফেলে পাঁক আর শ্যাওলার গাদা তুলে জড়ো করত এবং পাতিপাতি তাই খুঁজে ঠিকই দুল উদ্ধার করে দিত। শেষে মা কড়া নির্দেশ জারি করেছিলেন, "জলে নামবার আগে দুল খুলে রেখে যাবি।"

বড়দি তাই ঘরেই টেবিলের ওপর দুলজোড়া রেখে স্নান করতে যেত। একদিন তা ভুলে গিয়েছিল। ডোবার ধারে গিয়ে মনে পড়ায় সে ঘাটের ওপর কাঠে দুলদুটো রেখে জলে নেমেছিল। তারপর উঠে এসেই মাথায় হাত। একটা দুল নেই। মুখ চুন হয়ে গেল বড়দির। চুপিচুপি আমাকে ডেকে বলল, "নিপু, একবার যা না ভাই—মোনাকে খবর দিয়ে আয়। আমার নাম করে বলবি, খুব দামি সোনার দুল হারিয়ে গেছে। মা জানলে পিঠের চামড়া খুলে নেবে! আর শোন, এদিক দিয়ে চুপি চুপি নিয়ে আসবি ওকে। কেউ যেন টের না পায়।"

বড়দি আবার জলে সাঁতার কাটতে থাকল। আমি গেলুম মোনার বাড়ি। মোনা তার বাড়ির উঠোনে পেয়ারাগাছের তলায় খাটিয়া পেতে শুয়ে ছিল। আমাকে দেখে বলল, "খবর কী দাদাভাই?"

ওকে সব বললুম। শোনার পর মোনা বুজরুক হাই তুলে বলল, "তাই তো! এখন যে একজনের আসার কথা। এসে আমাকে না দেখতে পেলে রাগ করে চলে যাবে। তখন আমার সব বিদ্যা-বুজরুকিও খতম হয়ে যাবে।"

রহস্য টের পেয়ে বললুম, "কে গো বুজরুকদা?"

মোনা চোখে ঝিলিক তুলে বলল, "সে একজন আছে। বললে, ছোট ছেলে ভয় পাবে।"

"না বুজরুকদা! ভয় পাব না। বলো না, কে সে?"

মোনা চাপাস্বরে বলল, "সে মানুষ নয় বুঝলে তো! শ্মশানের ধারে শিমুলগাছটা দেখেছ কি? "সেই যে ডগার দিকটায় বাজ পড়ে কালো হয়ে আছে। ওই হল তার ডেরা। অনেক সাধনা করে তাকে মানিয়েছি।"

"কী সাধনা করেছ বুজরুকদা?"

মোনা হাসল। "সাত-সাতটা কালো বেড়াল বলি দিয়েছিলুম। কালো বেড়াল একটা দুটো পেতে পারো খুঁজলে। সাতটা কালো বেড়াল খুঁজতে আমাকে কত মুল্লুক ঘুরতে হয়েছিল, জানো তো?"

"কালো বেড়াল বলি দিলে বুঝি লোকটা—"

আমার কথা কেড়ে জিব কেটে মোনা বলল, "লোকটা-লোকটা কোরো না সে কি লোক?"

"তবে কী সে?"

"যাই হোক, শুধু এটুকু বলতে পারি তোমাকে—সে জ্যান্ত নয়।" বলে সে উঠে পড়ল। "যাক গে। অত করে বলছ যখন, চলো গিয়ে দেখি দিদিভাইয়ের দুল কে চুরি করল।"

খুব ভয়ে-ভয়ে তার দিকে আড়চোখে তাকাতে তাকাতে হেঁটে গেলুম—তার সঙ্গে একটু দূরত্ব রেখেই। তাহলে এতদিনে বোঝা গেল, তার বুজরুকি চুলে নেই। চুলের সঙ্গে আর একজনের গোপন যোগসূত্র আছে—যে জ্যান্ত নয় এবং মানুষ বা লোক-টোকও নয়। ওরে বাবা! ভাবতে গেলে রক্ত হিম হয়ে যায় যে!

ডোবার ঘাটে গিয়ে মোনা বুজরুক যথারীতি একগাছা চুল ছিঁড়ে মন্তর পড়ে ফুঁ দিল। চুলটা আমার চোখের সামনে উড়ে একটুখানি যেতে-না-যেতে মোনা বলে উঠল, "তবে রে!" তারপর চুলের দিকে লক্ষ্য করব কী, তার দিকেই চোখ গেছে আমার। সে হন্তদন্ত এগিয়ে চলেছে।

বড়দি ঘাটের কাছে ভিজে গায়ে মুখকালি করে বসে প্যাটপেটে চোখে তাকিয়ে আছে। মোনা একটা শিরীষ গাছে উঠে পড়েছে ততক্ষণে। তারপর দেখি দুটো কাক কা-কা করে তাকে ঠোকরাবার তাল করছে। মোনা কাকের বাসা হাতড়াচ্ছে দেখে অবাক হয়ে গেলুম।

একটু পরে সে নেমে এল। একগাল হেসে বলল, "এই নাও দিদিভাই। চোরের

ওপর বাটপাড়ি করে আনলুম। কিন্তু আর যেন যেখানে-সেখানে ভুলে রেখো না। চকচকে জিনিস দেখলেই কাকেরা লোভ সামলাতে পারে না।"

বলেই সে হনহন করে চলে গেল। বুঝলুম, শ্মশানের সেই শিমুলগাছের বাসিন্দার জন্যই এমন করে দৌড়ে গেল বখশিস না চেয়ে।

বড়দি দুলদুটো কানে পরে বলল, "শুনছিস নিপু? কাকদুটোর কেমন হাঁচি হচ্ছে? নাকে মোনা বুজরুকের চুল ঢুকে গেছে যে। দেখবি, হেঁচে ওদের কী অবস্থা হয়।"

কাকদুটোকে দেখতে দেখতে বললুম, "বড়দি, কাকেরা কি কা-কা করে হাঁচে রে?"

বড়দি বলল, "তাইতো হাঁচবে। ওরা যে কাক।"

সেদিনই বিকেলে বড়দিকে শ্মশানের বাজপড়া শিমুলগাছের ব্যাপারটা বলে ফেললুম! আর চেপে রাখতে পারছিলুম না। কালো বেড়ালের কথা শুনে বড়দি নেচে উঠল। "এই নিপু! আমরাও বুজরুক হব। তুই আর আমি—ব্যস! খবর্দার, তপু-পুপুদের বলবি না যেন।"

বললুম, "কিন্তু সাতটা কালো বেড়াল কোথায় পাব রে বড়দি?"

বড়দি চিন্তিত মুখে বলল, "একটা তো পাচ্ছিই। ঠাকুমারটা।"

ঠাকুমার একটা কালো বেড়াল আছে বটে। ভুলো মন আমার! বললুম, "ঠাকুমা যদি জানতে পারেন!"

বড়দি বলল, "জানবে না। শোন নিপু আজ রাতেই বেড়ালটাকে ধরে শ্মশানে নিয়ে যাব।"

আপত্তি করে বললুম, "বুজরুকদা বলেছে একটাতে তো হবে না। সাতটা চাই।"

বড়দি চোখ পাকিয়ে বলল, "একটা-একটা করে হোক না। সাত আগে, না এক আগে? এক দিয়ে শুরু করা যাক। তারপর দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত। বুঝতে পারলি তো এবার?"

পারলুম। সে-রাতে বড়দি আর আমি বায়না ধরলুম ঠাকুমার কাছে শোব। কতকাল গল্প শুনিনি ঠাকুমার। ঠাকুমা তাতে খুশিই হলেন।

বিরাট খাটে তিনজনে শুয়ে আছি। গল্প শোনাচ্ছেন ঠাকুমা ফোকলা দাঁতে। বোঝা যাচ্ছে না, আর শোনারও কান নেই। কান এবং মন পড়ে আছে ঠাকুমার বুকের কাছে কালো বেড়ালটার ওপর। তারপর কখন ঘুমিয়ে গেছি কে জানে!

হঠাৎ 'খ্যাঁও' করে এক বাজখাঁই চিৎকার, ঠাকুমার গলা, এবং একই সঙ্গে বড়দির কান্না আমাকে জাগিয়ে দিল। আলো জ্বলছে ঘরে। ঠাকুমাকে দেখলুম, হাঁ করে তাকিয়ে আছেন বড়দির দিকে। বড়দি মেঝেয় দাঁড়িয়ে আছে হাত চেপে ধরে। গলগল করে রক্ত ঝরছে। বাড়িতে ততক্ষণে হইচই শুরু হয়ে গেছে।

বুঝলুম, বড়দি ঠাকুমার হুলোকে বেমক্কা ধরতে গিয়েছিল। কামড়ে দিয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে মোনা বুজরুককে ডাকার কথা নয়—ডাকলে সে টের পেয়ে যেত, খুব বাঁচা গেছে। ডাক গেল নাড়ুবাবু ডাক্তারের কাছে।

কিন্তু মোনাকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। কদিন পরে মাঠ থেকে খেলে বাড়ি ফিরছি।

মোনা বুজরুকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ফিক করে হেসে বলল, 'শুনলুম দিদিভাইকে বেড়ালে কামড়েছে! বেড়ালটা কালো বটে তো? হুঁ-হুঁ—তোমাকে বলেছিলুম না—সেই যে গো, শ্মশানের বাজপড়া শিমুলগাছটার কথা?"

বাকিটা শোনার আগেই আমি এক দৌড়ে একেবারে বাড়ির ভেতর। রক্ত ঠাণ্ডা হিম। গলা শুকিয়ে কাঠ। আমি কি বুজরুক হতে চেয়েছিলুম নাকি? বড়দিটাই তো—

বৃষ্টিরাতের বিপদ-আপদ

আমাদের গোরাচাঁদ রোডে একপশলা বৃষ্টিতেই হাঁটু জল জমে। এদিন বিকেল চারটে থেকে রাত আটটা অব্দি একটানা বৃষ্টি। খবরের কাগজের আপিসে চাকরি করি। রাত নটায় ডিউটি শেষ। বেরিয়ে দেখি, বৃষ্টি বন্ধ। কাতারে কাতারে লোক বাস-ট্রামের অপেক্ষায় এসপ্ল্যানেড জুড়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। ভাগ্য ভাল।
একটা বাসে গোত্তা মেরে ঢুকে গেলুম। আধঘণ্টা পরে যখন গোরাচাঁদ রোডের মোড়ে বাস থামল, নেমেই দেখি অথৈ সাগর।

বাড়ি পর্যন্ত এত জল ঠেলে এগোতে হলে নির্ঘাত নিউমোনিয়া হবে। এক রিকশোওলা পাঁচ টাকা দর হাঁকল। পাঁচমিনিটের হাঁটারাস্তার জন্য পাঁচটাকা। দায়ে পড়ে রাজি হয়ে চেপে বসলুম। রিকশোওলা টান দেবার আগে ফের বলল, 'কোথায় যেন যাবেন বললেন বাবু?'

'থানার কাছে।'

রিকশো এগোলো। একে জল, তার ওপর লোডশেডিং। টিপটিপ করে ফের বৃষ্টি ঝরাও শুরু হয়েছে। হুড তোলা হয়েছে। পর্দাটাও নামিয়ে দিতে হল। অন্ধকারে চারিদিকে খালি ঝপাং ঝপাং জলের শব্দ। মাঝে মাঝে মোটরগাড়ির মৃত্যুকালীন শ্বাস টানার মতো ঘড়ঘড়ানি। এক ঝলক করে আলো। পর্দার ফাঁকে নোংরা নর্দমা উপচানো জলের বিদঘুটে হাসিমুখ। কিন্তু চলেছি তো চলেছি। বাড়ি সমান দূরত্বে থেকে যাচ্ছে। ভাবছি, আহা বেচারা রিকশোওলা! পেটের দায়ে এই অমানুষিক খাটুনি খাটছে। মানুষ হয়েও জানোয়ারের মতো গাড়ি টানছে। আর আমি নবাব খাঞ্জা খাঁয়ের মতো বসে আছি। খারাপ লাগছে, অথচ উপায় কী? একটুও জলে ভেজা সহ্য হয় না। সপ্তায় দুদিন স্নান করি। একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে দাঁতের গোড়া ফোলে। সর্দিকাশি এসে হামলা করে।

কিন্তু ব্যাপারটা কী? এখনও বাড়ি পৌঁছুনো যাচ্ছে না কেন? পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে কিছু ঠাহর হল না। ঘুটঘুট্টে আঁধার। বললুম, 'কোথায় এলুম হে?'

রিকশোওলা বলল, 'কোথায় যাবেন বললেন যেন বাবু?'

খাপ্পা হয়ে বললুম, 'থানার কাছে। কতবার বলব বলো তো?'

কী উজবুক লোক রে বাবা! কোথায় যাবে বোঝেনি, অথচ দর হেঁকে বসেছে পাঁচটা টাকা। পরক্ষণে ফের মায়া হল। আহা বেচারা! পেটপুরে খেতে পায় না, তাই জলের ভেতর রিকশো টানতে কষ্ট হচ্ছে। তার ওপর রাস্তার যা অবস্থা। খানাখন্দ পায়ে পায়ে। চাকা গড়ানো সহজ তো নয়।

কতক্ষণ পরে আবার পর্দার ফাঁকে উঁকি দিলুম। তেমনি নিরেট আঁধার। কোথাও একচিলতে আলো নেই! আঁধারে জলের ঝপাং ঝপাং শব্দ। লোকেরা জল ভেঙে হাঁটছে। মাঝে মাঝে রিকশোর ঠংঠং। কিন্তু তাহলেও এত দেরি হওয়া তো উচিত নয়। সন্দেহ হল, ঠিক শুনেছে কি না রিকশোওলা—হয়তো বাড়ি ছাড়িয়ে বেনেপুকুর বাজারের কাছে এসে গেছি। তাই বললুম, 'কী ব্যাপার হে? এখনও পৌঁছুনো গেল না যে! ঠিক পথে যাচ্ছ তো?'

রিকশোওলা বলল, 'কোথায় যেন যাবেন বললেন বাবু?'

যা বাবা! এযে দেখছি ভুলো মনের রাজা। খাপ্পার চূড়ান্ত হয়ে বললুম, 'কতবার বলব তোমাকে? অ্যাঁ? কানে শুনতে পাওয়া নাকি? থানার কাছে—এ। থা—না—র কা—ছে—এ—এ! চেঁচিয়ে ওর কানে ঢোকাতে চাইলুম। 'থানা বোঝো? থানা?'

'আজ্ঞে। বুঝেছি।'

বৃষ্টিটা বেড়ে গেল এতক্ষণে। কুঁকড়ে বসে রইলুম। আবার অন্ধকার জলে নানারকম শব্দ। ঠংঠং রিকশোর আর্তনাদ! খানাখন্দে চাকা আটকে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। আরও কিছুক্ষণ পরে চেঁচিয়ে বললুম, 'এখনও থানার কাছে পৌঁছুতে পারলে না? ব্যাপারটা কী?'

'কোথায় যেন যাবেন বললেন বাবু।'

আবার সেই কথা। গর্জে বললুম, 'রোখো, রোখো! আমি এখানেই নামব।'

এই যে এসে পড়েছি, বাবু। একটু সবুর করুন।'

'না। এখানেই নামিয়ে দাও।'

রিকশোওলা রিকশো থামাল। বলল, 'ওই তো পিলখানা—আলো জুগজুগ করছে।'

হাঁটুজলে বৃষ্টির মধ্যে নেমে ওর হাতে পাঁচটাকার নোট গুঁজে দিয়ে সামনে বাঁহাতি আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলুম। রিকশোওলা রিকশো ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল। আর বুঝতে অসুবিধে হল না যে লোকটা কানে কম শোনে। বলেছি থানার কাছে, সে শুনেছে 'পিলখানা'র কাছে।

কিন্তু 'পিলাখানা' যে বলে গেল, সে আবার কী জিনিস? এ নাম তো কস্মিন কালে শুনিনি। বাঁ হাতি গেটের ভেতর একটা উঁচু তিনদিকে খোলা দালানের চত্বরে লণ্ঠন সামনে রেখে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে আছেন। মাথায় টাক। মুখে অমায়িক ভাব। জায়গাটা ঠাকুরদালান বলে মনে হল। গেটের কাছে আমাকে দেখামাত্র তিনি বলে উঠলেন, 'কী সৌভাগ্য! আসুন আসুন।'

আমি তো অবাক। ভাবলুম, নিশ্চয় চেনেন-টেনেন কোনো সূত্রে। ছাদের তলায় তো পৌঁছুনো যাক। বৃষ্টিতে ভিজে একসা হয়ে যাচ্ছি।

ভদ্রলোক একই ভঙ্গিতে বললেন, 'বসুন, রামবাবু, তখন থেকে আপনার অপেক্ষা করছি। তবে বৃষ্টিটাও বড্ড বেশি আজ।' বলে হাঁক দিলেন মুখ ঘুরিয়ে, 'কেষ্টা! অ কেষ্টা! বড়বাবু এসেছেন রে! শিগগির চা নিয়ে আয়।'

সর্বনাশ! আমাকে কোন রামবাবু ওরফে বড়বাবু ভেবে বসেছেন। রিকশোওলা কানে কালা। আর ইনি চোখে কম দেখেন নাকি। ঝটপট বললুম, 'দেখুন, আপনার

বোধহয় ভুল হচ্ছে। আমি রামবাবু নই। রিকশোওলা ভুল করে আমাকে থানার বদলে পিলখানায়—'

কথা কেড়ে খি খি করে হাসলেন বৃদ্ধ। 'না, না। ভুল করে নি। ঠিক জায়গায় নামিয়ে দিয়েছে। অ কেষ্টা, চা কৈ রে?'

'কী মুশকিল! কথাটা শুনুন। আমি রামবাবু নই।'

পেছনদিকের দরজা খুলে এক মূর্তির উদয় হল। কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। লিকলিকে পাঁকাটি গড়ন। পরনে হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি। সাদা দাঁত বের করে বলল, 'বড়বাবু বরাবর এই রকম বলে। বুঝলেন দাদুমণি? বসুন, বসুন—চা খান। পরে কথা হবে।'

সে এককাপ চা প্লেটসুদ্ধ এনে লাল মসৃণ মেঝেয় রাখল। তারপর সেই রকম হেসে চলে গেল। বৃদ্ধ বললেন, 'বসুন। কাজের কথা সেরে নেওয়া যাক চা খেতে খেতে।'

বেগতিক দেখে বললুম, 'প্লিজ শুনুন। প্রথম কথা আমি রামবাবু নই। দ্বিতীয় কথা, আমি ভুল করে পিলখানায় চলে এসেছি। রিকশোওলা—'

'ভুল কিসের? পিলখানার এখন সে দিন নেই, তাই! একসময় এখানে নবারের তিরিশটে হাতি বাঁধা থাকত! তাই পিলখানা নাম। পিল মানে হল গিয়ে হাতি—এলিফ্যান্ট। বৃদ্ধ আবার খিখি করে হাসলেন। 'এখন হাতি নেই। তার বদলে আমরা আছি। আমি, কেষ্টা, গোবর্ধন, আর ওই হরি। হরি একটু পরে আসবে। হরি নৈলে জমে না! অ গোবরা, দেখে যা কে এসেছেন!'

পেছনের দিকে কোত্থেকে কেউ খ্যানখেনে গলায় বলল, 'কে দাদুমণি?'

বদ্ধ বললেন, 'রামবাবুরে, রামবাবু! মানে—আমাদের বড়বাবু। বুঝলি তো?'

'যাচ্ছি দাদুমণি!'

'ওরে অ কেষ্টা, হরিকে গিয়ে বল্ রামবাবু এসে গেছেন।'

আমি ভাবলুম, ভুলটা যখন ভাঙছে না এঁদের, না ভাঙুক। বৃষ্টিরাতে এককাপ গরম চা ছাড়ি কেন? তারপর ব্যাপারাটা কোথায় গড়ায়, দেখা যাক।

চা খেতে থাকলুম। বৃদ্ধ বললেন, 'হ্যাঁ—যেজন্য খবর দিয়েছিলুম। ওর আসার আগে তার গোড়াপত্তন করা যাক। কথা হল ওই ভগলুকে নিয়ে।'

'ভগলু কে?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। শুনেছি, ওপাশের ওই কবরখানার একটা গাছে কোত্থেকে এসে আড্ডা নিয়েছে। তা—'

'গাছে? গাছে কেন?'

'মাটি জুড়ে তো কবর। মুসলমানরা ওকে থাকতে দেবে কেন? ও তো হিন্দু। তাই খুব ঝগড়া হয়েছিল। শেষে রফা হয়েছে, গাছে তো আর কবর নেই। কাজেই গাছে ভগলু আস্তানা করতেই পারে।'

'বেশ! তারপর?'

'তা ভগলুর নাকি গাছ থেকে বৃষ্টিতে ভিজে খুব কাশি হচ্ছে। সারারাত খকখক করে কাশে। তাই আমাদের এই পিলখানায় আশ্রয় চায়। এদিকে কেষ্টাদের তাতে

আপত্তি। ভগলুটা নাকি বেজায় নোংরা। ভগলু সেটা বুঝতে পেরে রোজ রাতে ঢিল ছুড়ছে। তিষ্ঠোনো যায় না।'...

বলার সঙ্গে সঙ্গে খুট্ করে একটা ঢিল পড়ল তফাতে। তিনদিন খোলা ঠাকুরদালানের মণ্ডপের মতো চত্বর। ঝটপট সরে বসলুম। বৃদ্ধ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই শুরু হল! কেষ্টা! গোবরা!'

কেষ্টকে দেখেছি। এবার গোবরাকে দেখলুম। একটা প্রকাণ্ড কুমড়ো বললেই চলে। পরনে কেষ্টার মতই হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি। দুজনে এসেই চত্বরের একদিকে দাঁড়িয়ে ঘুষি পাকিয়ে অন্ধকারের দিক লক্ষ্য করে চেঁচাতে থাকল, 'ভগলু। দাঁতের পাটি খুলে নেব বলে দিচ্ছি।'

বৃদ্ধ উত্তেজিতভাবে বললেন, 'দেখলেন তো স্বচক্ষে, রামবাবু? এজন্যই আপনাকে ডাকা। এর বিহিত না করলে তা থাকা যায় না।'

অনুমান করলুম, ওদিকটাই তাহলে কবরখানা। তার মানে ওটা গোবরা গোরস্তান এবং তার মানে আমাকে রিকশাওলা উল্টোদিকে এনে ফেলেছে। এবং তার মানে...

না। মাথা ঠিক রাখতে হবে। বললুম, 'আপনারা শান্ত হোন। আমি দেখছি ব্যাটাকে!'

কেষ্টা আমার কথা শুনে সাহস পেল না যেন। ফের চেঁচাল ভগলুর উদ্দেশে। 'কী হচ্ছে রে ভোগলে! দাঁড়া—রামবাবু যাচ্ছে! কে সে জানিস তো? বেনেপুকুর থানার বড়বাবু! তোকে বেঁধে গুঁতো মারতে মারতে হাজতে নিয়ে যাবে।'

অন্ধকার থেকে ভগলুর কথা ভেসে এল। 'আরে যাবে যা! কেত্তা দারোগা হাম দেখ লিয়া! বিহার মুল্লুককা কেত্তা দারোগাভি এ ভগলুকো দেখা, তো তেরা বাঙালি দারোগাবাবু!'

গোবর্ধন বলল, 'শুনলেন দাদা, শুনলেন ব্যাটার আস্পর্ধার কথা?'

গলা চড়িয়ে বললুম, 'ভগলু! তুমকো হাম আভি আরেস্ট করে গা।'

যস্মিন দেশে যদাচার। যে জায়গায় এসে পড়েছি, তাতে তাল দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু আমার শাসানি শুনে ভগলু তার গাছের আস্তানা থেকে হি হি করে হেসে বলল, 'চলা আও না! আও বাঙ্গালিবাবু!'

বৃদ্ধ বললেন, আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছে রামবাবু! শুনছেন তো?'

উঠে দাঁড়িয়ে ভাবছি, ওই হচ্ছে ভেগে পড়ার মোক্ষম সুযোগ। এমন সময় অন্ধকার কবরখানার দিকে চ্যাঁচামেচি শোনা গেল—'কেষ্টা! গোবরা! দাদুমণি! চলে এসো শিগগির! ভোগলে ব্যাটার ঠ্যাং ধরে ফেলেছি।' সেই সঙ্গে ভগলুরও চেঁচামেচি চলেছে। 'ছোড় দে! ছোড় দে হরিয়া! হাম গির যায়ে গা! গির যানে সে হাম ফজলু খাঁকা উপরমে গিরেগা। উও কসাই আসে। হামকো জবাই করেগা।'

হ্যাঁ—গাছের নিচে এক কসাই ফজলু খাঁয়ের কবর! তার ওপর পড়লে গলায় ছুরি চালিয়ে দেবে। তাই ভগলু ত্রাহি ত্রাহি আর্তনাদ করছে। কিন্তু হরি তার ঠ্যাং ছাড়ার পাত্র নয়। এদেরও ডাকছে।

বৃদ্ধ, কেষ্টা আর গোবর্ধন ঝপাং ঝপাং করে জলে লাফিয়ে পড়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হল। লণ্ঠনটা জ্বলছে। চায়ের কাপপ্লেট পড়ে আছে। আমিও ঝাঁপ দিলুম—তবে

গেটের দিকে।

বৃষ্টিটা ছেড়েছে এতক্ষণে। জল ভেঙে প্রাণপণে এগিয়ে গেলুম যেদিক থেকে এসেছি, সেই দিকে! একখানে একটা বাড়ির রোয়াকে লণ্ঠন দেখলুম। কিন্তু আর সাহস হল না তাকাতে। যদি আবার...

ভূত্রাক্ষস

কিরিবুরু পাহাড়ী উপত্যাকায় একসময় ঘন জঙ্গল ছিল। সেই জঙ্গলে শিকার করার জন্য রামগড়ের রাজা একটা টিলার মাথায় 'হান্টিং লজ' বা শিকার ভবন তৈরি করেছিলেন। মাঝে-মাঝে শিকারে গিয়ে সেখানে তিনি থাকতেন। বাড়িটা কাঠের এবং ওপরে টালির চাল। তার লাগোয়া একটা উঁচু মঞ্চও তৈরি করেছিলেন। মঞ্চে উঠে দূরবীনে চোখ রেখে জন্তুজানোয়ার দেখতেন।

গতবছর কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের সঙ্গে কিরিবুরু গিয়ে দেখি, কোথায় জঙ্গল? সারা উপত্যকা জুড়ে চাষবাস হয়েছে। চারিদিকে পাহাড়গুলো পর্যন্ত ন্যাড়া হয়ে গেছে। এখানে-ওখানে আদিবাসীদের কয়েকটা ছোট্ট বসতি ছড়িয়ে রয়েছে। উপত্যকা দুভাগ করে যে নদীটা বয়ে যাচ্ছে, তার ওধারে টিলার মাথায় রামগড়ের রাজার হান্টিং লজ আর মঞ্চটা অবশ্য আছে। কিন্তু দেখলে মনে হবে যেন হানা বাড়ি।

নদীর এপারে সে৷ দফতরের ডাকবাংলোয় আমরা উঠলুম আগের ব্যবস্থা মতো। তারপর চারদিকে দেখে নিয়ে কর্নেলকে বললুম, 'এ কোথায় এলুম আমরা? জঙ্গলের টিকিটিও তো দেখা যাচ্ছে না। মিছিমিছি রাইফেল বয়ে এনেই বা কী লাভ হল?' কর্নেল মুচকি হেসে বললেন, 'একটু ধৈর্য ধরো জয়ন্ত। তোমার রাইফেলের শক্তিপরীক্ষার সুযোগ অবশ্যই পাবে।'

সেচ দফতরের জিপে আমরা এসেছি। জিপের ড্রাইভারের নাম বদ্রীপ্রসাদ। সে লাল কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছিল আর বাংলোর চৌকিদারের সঙ্গে কথা বলছিল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'কর্নিল সাহাব! কর্নিল সাহাব। তুরন্ত্ আইয়ে, ঢুণ্ডু নিক্‌লা!'

কর্নেল তখুনি বেরিয়ে গেলেন। আমি কিছু বুঝতে না পেরে হতচকিতভাবে অকে অনুসরণ করলুম। এপ্রিলের বিকেল পড়ে এসেছে। ফিকে লালচে রোদ্দুর ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে নদীর উপরে কিছু দেখতে থাকলেন। বদ্রীপ্রসাদ এবং চৌকিদারের মুখ উত্তেজনায় থমথমে। তারাও ওদিকে তাকিয়ে আছে। আমি কিন্তু কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। তারপরই শুনলুম নদীর এপারে ওপারে ছোট্ট বসতিগুলো থেকে হইহই করে লোকেরা বেরুচ্ছে। ঢোল আর ক্যানাস্তারা পেটাতে পেটাতে তারা শোর-গোল তুলেছে। কিন্তু কাউকে বসতি ছেড়ে নড়তে দেখছি না। মনে হচ্ছে, ওরা কোন সাংঘাতিক জন্তু দেখে উত্তেজিত হয়ে ়।

একটু পরে সব উত্তেজনা থিতিয়ে গেল। কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন, 'হুম! কিছু বোঝা যাচ্ছে না।'

জিগ্যেস করলুম, 'ব্যাপারটা কী?'

কর্নেল একটু হাসলেন। তারপর সাদা দাড়ি থেকে একটা শুকনো পাতা ফেলে দিয়ে বললেন, 'শুনলে না? ঢুণ্ডু বেরিয়েছিল।'

'ঢুণ্ডু! সে আবার কী?'

'হয়তো কোনো জন্তু—কিংবা জন্তু নয়।'

'তার মানে?'

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন, 'এদের ভাষায় ঢুণ্ডুর মানে হল ভূত-রাক্ষস। সন্ধি করে তুমি ভূত্রাক্ষস বলতেও পারো।

অবাক হয়ে বললুম, 'ভূত আবার রাক্ষস হয় কী করে? রাক্ষসই বা ভূত হয় কি ভাবে?

কর্নেল বাংলোয় ঢুকে তাঁর অত্যদ্ভুত সেই ক্যামেরা নিয়ে এলেন। এই ইলেকট্রনিক ক্যামেরা অন্ধকারেও ছবি তুলতে ওস্তাদ। তারপর বললেন, 'রাক্ষস মানুষ খায় এবং ভূতের ক্ষমতা কিংবা স্বভাব-চরিত্র তো তুমি বিলক্ষণ জানো। ঢুণ্ডুর দুরকম ব্যাপারটা আছে। কিরিবুরু উপত্যকা থেকে গত তিনমাসে সাতজন লোক নিখোঁজ হয়ে গেছে। তাদের প্রত্যেকের কংকাল খুঁজে পাওয়া গেছে নদীর চড়ায়। আশ্চর্য ব্যাপার, কংকালে একবিন্দু মাংস নেই—ঢুণ্ডু মাংস চেটেপুটে সাফ করে ফেলেছে। শুধু হাড়গুলো নিখুঁত রয়েছে।

এতক্ষণে বুঝলুম, আমার ধুরন্দর বৃদ্ধ বন্ধু কেন কিরিবুরু উপত্যকায় এসেছেন। এ তো দস্তুরমতো অ্যাডভেঞ্চার। আমার গা শিউরে উঠল অজানা আতংকে। বললুম, 'একটু আগে ঢুণ্ডুকে কি সত্যি দেখলেন আপনি?'

'এক পলকের জন্যে দেখলুম।' কর্নেল গম্ভীরভাবে বললেন। 'রাজাবাহাদুরের হান্টিং লজের নিচে একটা লোক ঘাস কাটছিল। তার দিকেই লক্ষ্য ছিল ওর। লোকটা কীভাবে টের পেয়ে পালিয়ে আসছিল চ্যাঁচাচে চ্যাঁচাতে। আমি দেখলুম কাঠের বাড়িটার কাছে একটা পাথরের আড়ালে কালো কি একটা অদৃশ্য হল। মানুষের মতো দেখতে কতকটা। যাইহোক, ডার্লিং, এবার তোমার রাইফেলের শক্তিপরীক্ষা হবে। চলে এস।...'

টিলাটা ঘন ঘাসে ও ঝোপঝাড়ে ঢাকা। তার মধ্যে ছোট বড় নানা সাইজের পাথর মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। হান্টিং লজের অবস্থা জরাজীর্ণ। তবে দরজায় মরচে ধরা তালা ঝুলছে। সূর্য পাহাড়ের নিচে চলে গেছে। ধূসর আলোয় নিচের সবুজ শস্যে ঢাকা উপত্যকা যেন উত্তেজনায় শিউরে উঠছে মনে হচ্ছিল।. কর্নেল কাঠের মঞ্চের পেছনে একটা গাছের ডালে ক্যামেরাটাকে যতক্ষণ মজবুত করে বেঁধে আটকে দিলেন, ততক্ষণে আমি গুলিভরা রাইফেল তাক করে চারদিকে সতর্ক নজর রাখলুম। ক্যামেরার সাটার থেকে একটা কালো সুতো টেনে এনে কর্নেল সামনে ঘাসভরা মাটির ওপর টানটান করে অন্যপাশে একটা ঝোপের গোড়ায় আটকে দিলেন। এই সুতোয় যার পা লাগবে, তার অজান্তে ক্যামেরায় তারই ছবি উঠবে।

এরপর আমরা লজের বারান্দায় উঠলুম। কর্নেল টর্চ আর রিভলবার বের করে দরজার তলায় টান দিতেই খুলে গেল। কর্নেল বললেন, 'আশ্চর্য তো তালাটা যেন খোলাই ছিল।'

জংধরা দরজা ঠেলতে বিশ্রি ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে খুলে গেল। ভেতরে টর্চের আলো ফেলে দেখা গেল, একধারে শুধু একটা লোহার খাট-ছাড়া আর কিছুই নেই। মেঝেয় ধুলো জমেছে। পেছনে একটা জানালা খোলা এবং গরাদ ভেঙে রয়েছে। নিশ্চয় চোরের কীর্তি। আসবাবপত্র বা অন্যান্য জিনিস কবে চুরি করে নিয়ে গেছে।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে কর্নেল চাপা গলায় বললেন, 'ডার্লিং! আজ রাতে এটাই আমাদের আস্তানা। কিটব্যাগে কিছু শুকনো খাবার আছে। আর এই ফ্ল্যাস্কে কফি আছে। হুম্! রোসো। মোমবাতিগুলো বের করি।'

এই হানাবাড়িতে রাত কাটানোর কথা শুনে আমার বুক কেঁপে উঠল। কর্নেল একটা মোম জ্বেলে লোহার খাটের কোনায় বসিয়ে দিলেন। ঘরের ভেতর কেমন একটা চিমসে গন্ধ। তার মধ্যে কফি খেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু কর্নেলের তাগিদে খেতেই হল। উনি চুরুট ধরিয়ে খোলা জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি মোমের আলোয় ঘরের ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলুম।

পাশের ঘরের দরজাটা ভেঙে পড়েছে। টর্চ জ্বেলে উঁকি মেরে দেখলুম, মেঝে জুড়ে ইঁদুরের গর্ত। কাঁকুরে মাটির স্তূপ। একখানি সাপের খোলস দেখে চমকে উঠলুম। সর্বনাশ! সাপ বেরিয়ে যদি এ ঘরে হানা দেয়?

কর্নেল আমার কাছে এসে উঁকি মেরে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'হুম,! সাপের আড্ডা মনে হচ্ছে। তবে আমাদের পায়ে হান্টিং বুট আছে। একটু লক্ষ্য রাখতে হবে।' বলে আর একটা মোম জ্বেলে এনে এ ঘরের দরজার মাঝামাঝি রাখলেন। 'ব্যস্! আর চিন্তার কারণ নেই। সাপ এই আলো পেরিয়ে এ ঘরে ঢুকবে না। কারণ আলোর সামনে সাপ নিজেকে অসহায় বোধ করে। বড় জোর ফণা তুলে আলোকে হিস হিস শব্দে ধমক দেবে।

আমরা লোহার খাটে বসে পড়লুম। বাইরে এতক্ষণে একটা জোরালো বাতাস বইতে শুরু করেছে। কাঠের বাড়িটা অদ্ভুত শব্দ করছে। বারবার চমকে উঠছি। একবার খোলা জানালা, একবার মেঝের দিকে, আর একবার পাশের ঘরের দরজার জ্বলন্ত মোমের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকাচ্ছি। কর্নেলের সঙ্গে অনেক ভয়ঙ্কর রাত কাটিয়েছি, কিন্তু এমন সাংঘাতিক রাত কখনও বুঝি কাটাইনি। কিছুক্ষণ পরে বাইরে হলুদ আভা দেখে বুঝতে পারলুম জ্যোৎস্না ফুটেছে।...

কাঠের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছি, দুপায়ের ফাঁকে রাইফেল—একটু তন্দ্রামতো এসেছিল, কর্নেলের চিমটি খেয়ে সোজা হয়ে বসলুম। কর্নেল ইশারায় বাইরের দরজার দিকে তাকাতে বললেন। তাকিয়ে দেখি। দরজাটা একটু একটু কাঁপছে। কেউ যেন নিঃশব্দে চাপ দিচ্ছে।

আমার পিলে চমকে উঠল তাই দেখে। নির্ঘাৎ সেই আজব ভূত্রাক্ষস ঢুণ্ডু ব্যাটাচ্ছেলে! রাইফেল বাগিয়ে ধরলুম। কর্নেল একহাতে টর্চ অন্যহাতে রিভলবার নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

দরজায় চাপটা বাড়ছে ক্রমশ। মচমচ করছে জীর্ণ কাঠের কপাট। এবার আমিও উঠে দাঁড়ালুম। দরজাটা আমাদের ফুট দশেক দূরে। হঠাৎ কপাট দড়াম করে ভেঙে পড়ল। পরমুহূর্তে টর্চের আলোয় দেখলুম...

কিন্তু ওকি মানুষ, না ভয়ঙ্কর জন্তু? শরীরের গড়ন অবিকল মানুষের। কিন্তু একটুও লোম নেই—মাথাটাও ন্যাড়া। কালচে রঙের ভৌতিক প্রাণী যেন। তার নাক মুখ-চোখ সবই মানুষের।। কিন্তু চোখদুটো জ্বলন্ত নীল টুনি বাল্ব যেন। তার মুখ থেকে অদ্ভুত চাপা একটা গরগর আওয়াজ বেরুচ্ছে, তাও শুনলুম।

মাত্র কয়েকটা সেকেন্ড। আমি রাইফেলের ট্রিগার চাপ দিলুম। প্রচণ্ড গর্জন করে গুলি বেরল। অটোমেটিক রাইফেল। ছটা গুলি শেষ করে ফেললুম। তারপর দেখি, আজব প্রাণীটা অদৃশ্য। কর্নেল দরজায় উঁকি মেরে টর্চের আলো ফেলে বললেন, 'পালিয়েছে! যাগ কে, আপাতত আমাদের কাজ শেষ। চলো, বাংলোয় ফেরা যাক। ঢুণ্ডুবাবাজীকে স্বচক্ষে দর্শনের ইচ্ছা ছিল। দেখলুম, আবার কী?'

সকালে ঘুম ভেঙে দেখি, কর্নেল অভ্যাসমতো প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন—এখন টেবিলে ওঁর ছোট্ট ট্রেতে কয়েকটা ভেজা ফোটো। সদ্য প্রিন্ট করেছেন। আমাকে উঠতে দেখে বললেন, 'ঢুণ্ডুবাবাজীকে দেখে যাও ডার্লিং! আমাদের চোখ অনেক সময় ভুল করে। কিন্তু ক্যামেরার চোখ নির্ভুল।'

ছবিগুলো দেখে বললুম, 'রাতে যাকে দেখেছি, সেই বেটা।'

'কোনো তফাত চোখে ঠেকছে না।?'

'না তো।'

'ভালো করে দেখে বলো, জয়ন্ত।' কর্নেল আরেকটা ছবি দিলেন।।

দেখে বললুম, 'টাওয়ারের পাশে একটা পাথরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে একটা উলঙ্গ পাগল—মাথাটা ন্যাড়া।...হুঁ, পাথরের গায়ে কালোমতো একটা চিহ্ন।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে আমরা বেরুব। রেডি হয়ে নাও।'

ঘণ্টাখানেক পরে দিনের উজ্জ্বল আলোয় আমরা হান্টিং লজে পৌঁছলুম। রাতের সেই আতঙ্ক আর টের পাচ্ছি না। টাওয়ারের কাছে খুঁজে খুঁজে সেই পাথরটা আবিষ্কার করলেন কর্নেল। তারপর দেখি, পাথরটার মাথায় কালো গোলাকার একটা ইঞ্চিখানেক উঁচু কী একটা জিনিস। কর্নেল সেটা নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ পাথরটা নড়ে উঠল একটু কাত হয়ে গেল। অবাক হয়ে দেখলুম, হাতচারেক চওড়া একটা কুয়োর মতো সুড়ঙ্গ ধাপে-ধাপে নেমে গেছে।

একমুহূর্ত ইতস্তত করে কর্নেল বললেন, 'এস জয়ন্ত, ঢুণ্ডুর ডেরায় ঢুকি।'

কর্নেল সবে প্রথম ধাপে পা রেখেছেন, হাতে টর্চ—কারণ ভেতরটা অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে, আচমকা ভেতরে চাপা গরগর শব্দ শোনা গেল। তারপর বিদ্যুৎবেগে সেই ঢুণ্ডুর আবির্ভাব ঘটল এবং কর্নেলের গলা দুহাতে চেপে ধরল। কর্নেল জড়ানো গলায় বলে উঠলেন, 'মাথা! মাথা!'

কর্নেলকে নিয়ে ঢুণ্ডু তখন সিঁড়ির ধাপে পড়েছে এবং ধস্তাধস্তি শুরু হয়েছে।

'মাথা' বলতে কী বোঝাচ্ছেন কর্নেল। বুঝতে দেরি হল একটু। তারপর লক্ষ্য করলুম কর্নেল একটা হাত বাড়িয়ে ঢুণ্ডুর মাথা ধরার চেষ্টা করছেন। আমি রাইফেল বাগিয়ে ধরতে দেরি করিনি। কিন্তু গুলি করে লাভ নেই, তা দেখেছি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রাইফেলের বাঁট দিয়ে ঢুণ্ডু ব্যাটার মাথায় প্রচণ্ড জোরে আঘাত করলুম।

ঠঙাস করে শব্দ হল। ব্যাটার মাথা না লোহার পিণ্ড! ফের ওর মাথার পেছনে এক ঘা দিতেই রাইফেলের বাঁট ভেঙে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত কাণ্ডও ঘটল।

ঢুন্ডুর মাথাটা ছিটকে গিয়ে দমাস করে নিচে কোথাও পড়ল এবং ধাপে ধাপে ঢঙ ঢঙ শব্দ করতে করতে পাতালে গড়াতে থাকল। তারপর, দেখলুম, ওটা মাথা নয় আদতে—একটা নিছক হেলমেটের মতো জিনিস। ঢুণ্ডুর মুণ্ডু ঠিকই আছে এবং তা একটা জলজ্যান্ত মানুষেরই। কারণ তাতে চুল আছে।

ভাঙা রাইফেল দিয়ে দুহাতে ওর চুল খামচে ধরতেই ঢুণ্ডুবাবাজী বেকায়দায় পড়ে মানুষের গলায় আর্তনাদ করল, 'উঃ! উহু-হু! গেছিরে! গেছিরে! ছাড়, ছাড়! মরে গেলুম রে!'

কর্নেলের সাদা দাড়ি এবং টাক ধুলোয় ধূসর। টুপি আর টর্চ কুড়িয়ে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে বললেন, 'ঢুণ্ডু বা বাজীকে নিয়ে এস ডার্লিং! মহা ত্যাঁদোড় ব্যাটাচ্ছেলে।'

ঢুণ্ডু লক্ষ্মীছেলের মতো বলল, 'আহা টানে না এত। চলো না, যাচ্ছি। আমার চুল টানলে বেজায় লাগে যে!'

ভূত্রাক্ষস বা ঢুণ্ডুর পরিচয় পাওয়া গেল রামগড় থানায়। কর্নেল বললেন, 'কলকাতার বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ভবরঞ্জন বক্সীর অন্তর্ধান রহস্য তাহলে ফাঁস হল। কিরিবুরু হান্টিং লজে রামগড়ের রাজা একটা পাতাল-কক্ষ বানিয়ে ছিলেন শুনেছিলুম। বক্সী তার খোঁজ পেয়ে সেখানে গুপ্ত ল্যাবরেটরি করেছিলেন বোঝা যাচ্ছে। মানুষের মাংস থেকে উন্নতজাতের মানুষ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। পাগল আর কাকে বলে? মাঝখান থেকে সাতটা লোকের প্রাণ গেল। ইস্পাতের পোশাক পরে মানুষ চুরি করতেন। গুলি বিঁধবে কেমন করে? তবে ওই চেহারা দেখেই হতভাগা লোকগুলো ভিরমি খেত।'

বিকেলে কর্নেল পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে কিরিবুরু গেলেন পাতাল-ল্যাবরেটরি দেখতে। বক্সীমশাই আইনের চোখে খুনী। তাঁর বিচার হবে। সে যাই হোক, আমি সার্কিট হাউসেই থেকে গেলুম। মানুষের পচা-গলা মাংস দেখতে যাবার ইচ্ছে আমার ছিল না।...

তেরো ভূতের কবলে

সবে চাঁদটা উঠেছে। আর তার ফিকে জ্যোৎস্নায় সার বেঁধে একদঙ্গল ছায়ামূর্তি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের কালো মুখে সাদা দাঁতগুলো ঝিকমিক করছে। তারপর তারা এক পা এক পা করে এগিয়ে আসতে থাকল।

কেকরাডিহির মাঠে অনেক বছর আগে এক সন্ধেবেলার এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য মনে পড়লে এখনও আতঙ্কে আমার শরীর হিম হয়ে যায়। কথায় বলে বারো ভূতের পাল্লায় পড়া। আমি পড়েছিলুম তেরো ভূতের পাল্লায়।

ছিপ ফেলে মাছ ধরার বাতিক তো কম দঃখে ঘোচেনি। অমন দামি বিলিতি হুইল মুচড়ে ভেঙে ট্রেনের জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছিলুম। তারপর নাককান ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, আর কদাচ ছিপ হাতে করব না। সেই প্রতিজ্ঞা এখনও রেখেছি। উপরন্তু মাছ কেন, আমিষ খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছি। তাই বেশ নিরাপদেই আছি বলতে গেলে।

ব্যাপারটা বললে কেউ বিশ্বাস করবে না জানি। কিন্তু এতদিন পরে কাগজে পড়লুম, কেকরাডিহির কাছে সেই কাকমারি ঝিলে সরকার মৎস্য-চাষ প্রকল্প শুরু করবেন। কাজেই আগাগোড়া ছাপার হরফে সবটাই বলে দেওয়া উচিত—লোকেরা যদি সাবধান হয়। কিন্তু মাছখেকো বাঙালি পরলোকে গিয়েও মাছের জন্য ছোঁক-ছোঁক করে। আমার কথা শুনবে কি কেউ?

বছর-পাঁচেক আগের কথা। তখন আমার ছিপের নেশা ছিল প্রচণ্ড রকমের। আমাদের মফস্বল শহরটার আনাচে-কানাচে এমন পুকুর বা জলা ছিল না, যেখানে আমি ছিপ ফেলিনি। নেশা তুঙ্গে উঠলে তখন দূরে যাওয়া শুরু করেছিলুম। কোথায় কোন গ্রামে কার পুকুরে কী রকম মাছ আছে, তক্কেতক্কে থেকে খবর নিতুম আর সেখানে গিয়ে হাজির হতুম।

মাছ তো বাজারে পয়সা দিয়ে কেনা যায়। আবার জাল ফেলেও মাছ ধরতে অসুবিধে নেই। কিন্তু ছিপ ফেলে মাছ ধরার কোনো তুলনা হয় না। তার চেয়ে বড় কথা, মাছ ধরার চেয়ে মাছের আশায় জলের ধারে বসে থাকার মতো আনন্দ আর কিছুতে নেই।

নিরিবিলি নিঝুম পরিবেশ। দামের ওপর একঠ্যাঙে সাদা বক বসে যেন ধ্যান করছে। মাছের প্রতীক্ষায় থেকে হঠাৎ কোনো তিতি-বিরক্ত মাছরাঙা চ্যাঁ চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে উঠছে। জলের ওপর তরতরিয়ে খেলে বেড়াচ্ছে জলমাকড়সার ঝাঁক। টুকটুকে লালি গাংফড়িংটা ফাতনার ওপর উড়ে-উড়ে ছোঁ মারছে। তারপর ফাতনার কাছে জলের বুজকুড়ি ফুটেছে। হ্যাঁ, চারে মাছ এসেছে। এত মোটা বুজকুড়ি যখন, তখন মাছটা না কোন্ কিলো-দশেক হবে। উত্তেজনায় রক্ত চনমন করছে। ঝুঁকে বসে ছিপটা শক্ত করে ধরেছি। ফাতনা নড়লেই মারব এক জোরালো খ্যাঁচ। তারপর...

ঠিক এক মুহূর্তে বিদঘুটে ঘটনাটা ঘটতে শুরু করেছিল। কিন্তু তখনও কিছু টের পাইনি।

তার আগের কথাটা বলি নিই।

শুনেছিলাম কেকরাডিহির ওদিকে একটা ঝিল আছে। তার নাম কাকমারি ঝিল। কাকের কথাটা কেন আসছে জানতুম না। পরে অবশ্য জেনেছিলুম। তো সেই ঝিলে নাকি আদ্যিকালের বিশাল-বিশাল সব মাছ আছে। ছিপ ফেললে তারা এসে টোপ ঠোকরায় বটে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ একটা মাছও গাঁথতে পারেনি বড়শিতে। সেই শুনে আমার জেদ চড়ে গিয়েছিল।

আশ্বিনের এক দুপুরবেলা কেকরাডিহি স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে পড়লুম। নেমে দেখি, ছোট্ট এক স্টেশন। খাঁ-খাঁ করছে চারদিক। স্টেশনমাস্টার বয়সে প্রবীণ। আমাকে দেখে একটু হেসে বললেন, "কাকমারির ঝিলে ছিপ ফেলতে এসেছেন বুঝি? যান, গিয়ে দেখুন যদি একটা গাঁথতে পারেন। তবে..."

ওঁকে হঠাৎ চুপ করতে দেখে বললুম "তবে কী?"

উনি কেমন যেন গম্ভীর হয়ে বললেন, "কিছু না। বলছিলুম কি, একটু সাবধানে থাকবেন।"

"কেন বলুন তো? ছিনতাইয়ের ভয় আছে নাকি?"

স্টেশনমাস্টার এবার কেমন যেন হাসলেন। "না না। জঙ্গুলে জলা জায়গা। ওখানে ছিনতাইবাজরা যাবে কী আশায়? কাক। বুঝলেন? কাকের বড় উপদ্রব ওখানে। সেজন্যেই তো কাকমারি ঝিল নাম হয়েছে। মাছ মারবেন, না কাক মারবেন, সেটাই প্রবলেম। যাক্ গে। এসেই পড়েছেন যখন তখন আর দেরি করবেন না। সন্ধের আগেই ফিরে আসুন ভালয়-ভালয়।"

এই সব অদ্ভুত কথাবার্তা শুনে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলুম না। ভদ্রলোক স্টেশনঘরে ঢুকে গেছেন। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, "ঝিলটা কোনদিকে বলুন তো?"

জানালায় মুখ বাড়িয়ে বললেন, "নাক-বরাবর হেঁটে যান। আর একটা কথায় মাছ যদি গাঁথতে পারেন, আমার কিন্তু ওয়ান-থার্ড পাওনা রইল।" তারপর হেঁ হেঁ করে বিদঘুটে হাসতে থাকলেন।

প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাক-বরাবর হাঁটতে থাকলাম। রাস্তা-টাস্তা নেই। পোড়ো জমির ওপর ঘন ঘাস আর ঝোপঝাড় গজিয়ে রয়েছে। বেশ খানিকটা এগিয়ে ঝিলটা দেখা গেল। দারুণ সুন্দর পরিবেশ। জলজ গাছ আর দামে ঢাকা ঝিলটা আয়তনে প্রকাণ্ড বলা যায়। মস্ত বটগাছের তলায় মাছধরার ঘাটটা দেখে মন আনন্দে নেচে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যে চার ছড়িয়ে টোপ গেঁথে ছিপ ফেলে আরাম করে ছায়ায় বসে পড়লুম।

কিছুক্ষণ পরে ফাতনার কাছে বুজকুড়ি কাটতে দেখে ছিপ বাগিয়ে ধরেছি। তারপর ফাতনাটা নড়ে ওঠা মাত্র যেই খ্যাঁচ মারতে গেছি, অমনি কা-কা করে কোত্থেকে একঝাঁক কালো কুচকুচে কাক আমার মাথার ওপর কালো চাকার মত পাক খেতে শুরু করেছে। তাদের বিকট চ্যাঁচামেচিতে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে।

কাকের কথাটা পথে আসতে আসতে ভুলেই গিয়েছিলুম। ছিপ ছেড়ে দিয়ে প্রচণ্ড খাপ্পা হয়ে পড়লুম। তারপর ঢিল কুড়িয়ে কাকগুলোকে তাড়াবার চেষ্টা করলুম। এই করতে গিয়ে আমার টুপিটা পড়ে গেল! আমার মাথায় বিরাট টাক। ধড়িবাজ

ক্যাকগুলো সেই টাক লক্ষ করে ঝাঁপিয়ে আসতে থাকল। তখন মরিয়া হয়ে ছিপ তুলে বাঁইবাঁই করে ঘোরাতে শুরু করলুম। গাছের পাতায় শেষ পর্যন্ত বড়শি আটকে গেল বটে, কিন্তু, এবাক কাকগুলো জব্দ হয়ে সরে গেল। বটগাছটার মাথায় গিয়ে বসল।

আগে জানলে গোটাকতক পটকা আনতাম সঙ্গে। কী আর করা যায়। অনেক কষ্টে পাতা থেকে বড়শি ছাড়িয়ে ফের টোপ গেঁথে ঠিক জায়গায় ফেলে বসে রইলুম। কিন্তু এবার সতর্ক হয়েছি। বারবার পিছন ফেরি দেখি নিচ্ছি। কিন্তু কাকগুলো আর টুঁ করছে না। ডালপালার ভেতর কোথায় বুঝি ঘাপটি মেরে বসে আছে। কয়েক মিনিট নির্ঝঞ্ঝাট কেটে গেলে বুঝলুম, বাছাধনরা ভয় পেয়ে গেছে। দৈবাৎ বড়শি গেঁথে গেলে কী অবস্থা হবে, নিশ্চয় আঁচ করছে।

ফাতনার কাছে বুজকুড়িগুলো মিলিয়ে গেছে কখন। মাছটা হয়তো ডাঙার ওপর এই হুলস্থূলু টের পেয়ে কেটে পড়েছে। কাকগুলোর ওপর রাগে খাপ্পা হয়ে গেলুম! তারপর খেয়ায় হল, ওই যাঃ! টুপিটা কোথায় পড়েছে খুঁজে আনতে হয়। কাকের লক্ষ্যস্থল আমার এই বিরাট টাকটাকে এখনও ঢাকিনি কোন্ আক্কেলে?

টুপিটা ঝোপের পাশে পড়েছিল। কুড়িয়ে মাথায় পরেছি, হঠাৎ বটতলার অন্য পাশ থেকে একটা কালো খেঁকুটে চেহারার লম্বানেকো লোক বেরিয়ে এল। পাড়াগাঁয়ের মাঠে খেতখামারে যারা কাজ করে, সম্ভবত তাদেরই কেউ। কোমরে একটুখানি ন্যাকড়াজড়ানো শুধু, বাদবাকি শরীর নগ্ন। একগাল হেসে সে বলল, "মাছ ধরতে পারলেন বাবুমশাই?"

বিরক্ত হয়ে বললুম, "কই আর পারলুম? যা কাকের উপদ্রব!"

লোকটা খ্যা খ্যা ধরনের হাসি হেসে বলল, "বলে দেব। আর ঝামেলা করবে না—তবে কিন্তু মাছের ভাগ দিতে হবে বাবুমশাই!"

"তা না হয় দেব। কিন্তু বলে দেবে মানে কী? কাকগুলো কী তোমার পোষা কাক নাকি?"

"আজ্ঞে, কতকটা।"

"কতকটা মানে?"

লোকটা তার লম্বা নাকের ডগা চুলকে বলল, "এত কথায় কাজ কী বাবুমশাই? যান, বসুন গে।"

ছিপের কাছে বসলুম আবার। ভাবলুম লোকটা আসলে রসিকতা করছে। বললুম, "ওহে! মাছ ধরতে পারলে তোমাকে একটা অবশ্যই দেব। তুমি দেখ, যেন কাকগুলো আর বিরক্ত না করে। বরং গাছের ডাল ভেঙে নাও একটা।"

লোকটা বলল, "কিছু ভাববেন না। আপনি ফাতনার দিকে চোখ রাখুন।"

ফাতনাটার কাছে আবার বুজকুড়ি ফুটে উঠল। ছিপ বাগিয়ে ধরলুম। ফাতনাটা নড়লেই খ্যাঁচ মারব। কিন্তু সেই সময় পেছনের বটতলায় ধুপ ধুপ ধুপ ধুপ শব্দ হল এবং চেরা গলায় কারা চ্যাঁচামেচি করে দৌড়ে এল, "মাছ! মাছ! মাছ! মাছ!"

ঘুরে দেখি, সেই লোকটার মতোই কালো কুচকুচে লম্বানেকো একদল কলো লোক এসে হাজির। তারা "মাছ মাছ" বলে চ্যাঁচামেচি করছে এবং আগের লোকটা

তাদের থামাবার চেষ্টা করছে। রাগে মহাখাপ্পা হয়ে উঠে দাঁড়ালুম। তারপর প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললুম, "চুপ সব। চুপ! পেয়েছ কী তোমরা? এখানে হইচই করছ কেন অত?"

লোকগুলো একগলায় বলল, "মাছ, মাছ!"

তেড়ে গিয়ে বললুম, 'মাছ ধরতে না ধরতেই মাছ চাইতে এসেছ। ধরলে তবে তো!"

আগের লোকটা বলল, "বাবুমশাই বড় ভালমানুষ। তোরা খামোকা চ্যাচাচ্ছিস কেন বাপু? মাছ আগে বড়শিতে ধরা পড়ুক। শুনুন বাবুমশাই, আমরা মোটমাট বারোজন আছি। বেশি নয়, মাথাপিছু একটা করে টুকরো দেবেন। ব্যস!" বসে সে ঠোঁট চেটে নিল! "আহা! কতকাল আমরা মাছ খাইনি!"

এসব লোকের সঙ্গে তর্ক করে লাভ নেই। তাতে আমি একা, আর ওরা বারোজন। তাই আবার ছিপের কাছে গিয়ে বসলুম। চারের মাছটা আবার পালিয়েছে। মাছ ধরতে বসার আনন্দটাও আর নেই। স্টেশনমাস্টার কি এজন্যই সাবধানে থাকতে বলেছিলেন।

একটু পরে ওদের দেখার জন্য পেছনে তাকালুম। অবাক হয়ে দেখলুম, ধেড়ে লোকগুলো বাচ্চা ছেলেদের মতো বটগাছটার ঝুরি বেয়ে উঠছে কেউ, কেউ ডালে চড়ে বসেছে, কেউ ডাল থেকে ধুপ করে পড়ছে। আবার ঝুরি বেয়ে উঠে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, একপাল হনুমান যেন। বয়স্ক লোকেরা এমন করে খেলে, কস্মিনকালে তো দেখিনি।

এতক্ষণে একটু খটকা লাগল। কিন্তু চারে বুজকুড়ি দেখা দিয়েছে। মাছটা টোপ না খেয়ে ছাড়বে না। ফাতনার দিকে মন না দিয়ে তারা কী করছে, তাই নিয়ে মাথা ঘামানো বৃথা।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পরে পেছনে তাকাতে অবশ্য ভুলিনি। লোকগুলো আপনমনে যেন খেলায় মেতে রয়েছে। ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না। ফাতনাটা একবার নড়ল মনে হল। কিন্তু দোনামনার জন্য খ্যাঁচ মারতে পারলুম না! দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামল। বিকেলও ক্রমশ ফুরিয়ে যাচ্ছিল। আলো কমে এল। পেছনে বটেব ঝুরি এবং ডালপালায় লোকগুলো একই ভঙ্গিতে খেলায় মেতে আছে। তারপর ওদের কথা মন ঝেঁটিয়ে ফেললুম। চুলোয় যাক ওরা। ছিপে মাছ ধরতে একাগ্রতা দরকার। মনে আশা জেগেছে, অনেক মাছ ঠিক সন্ধ্যার মুখে টোপ ধরে মোক্ষম—টান দেয়—এই মাছটাও তাই করবে।

কিন্তু হাতের রেখা মুছে ফেলার মতো ধূসরতা ঘনিয়ে উঠল এবং ফাতনাটাও অস্পষ্ট হয়ে উঠল, তখন হতাশ হয়ে ছিপ গুটিয়ে ফেললুম। ঝিলের জলের ওপর কুয়াশার পর্দা ঝুলছে। শূন্য ঝোলা আর ছিপটা হাতে নিয়ে ক্লান্তভাবে পা বাড়ালুম। বটতলায় আবছা আঁধার জমেছে। পোকামাকড় ডাকতে শুরু করেছে। কিন্তু লোকগুলো কোথায় গেল? ভাবলুম, মাছ গাঁথতে পারিনি লক্ষ্য করে ওরাও হতাশ হয়ে কেটে পড়েছে।

একটু দূরে কেকরাডিহি স্টেশনের সিগন্যাল-বাতি জ্বলজ্বল করছিল। সন্ধ্যা সাতটা

নাগাদ আমার ফেরার ট্রেন। আস্তে সুস্থে হাঁটছিলুম। সবে চাঁদটাও বেরিয়ে এসেছে। ফিকে জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে কেকরাডিহির মাঠে। লোকগুলো এবং কাকগুলোর চেহারার মধ্যে কেমন যেন মিল আছে—ভাবতে ভাবতে খটকাটা বেড়ে গিয়েছিল। তারপর মনে হল, আমারই দেখার ভুল। রোদ-বৃষ্টি-শীতে খেটে ওদের চেহারা অমন খেঁকুটে হয়ে গেছে। আর কাকের হামলাও কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এদিকে মাছের ওপর গ্রামের লোকের অমন কাঙালপনা থাকতেই পারে। সব মাছ তো শহরে চালান যাচ্ছে আজকাল। কাজেই আমি অকারণ একটা স্বাভাবিক ব্যাপারকে রহস্যময় বলে ভাবছি।

কিন্তু হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, সামনে একদঙ্গল ছায়ামূর্তি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। থমকে দাঁড়ালুম। তাদের কালো মুখে সাদা দাঁত ঝিকমিক করছে। আতঙ্কে বোবাধরা গলায় বলে উঠলুম,—"কী চাই তোমাদের?"

তখনকার মতো একগলায় ওরা চেঁচিয়ে উঠল, "মাঁছ, মাঁছ!"

এতক্ষণে নাকি-স্বরে মাছ উচ্চারণ শুনেই শরীর হিম হয় গেল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলুম ওরা কারা। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললুম, "মাছ তো পাইনি।"

একসঙ্গে ব্যাটাচ্ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠল, "মিছে কঁথা। মিছে কঁথা।

কাকুতিমিনতি করে বলুলুম, "বিশ্বাস করো মাছ পাইনি।"

একজন বলল, "ওরে! ওঁর ঝোলাটা কেঁড়ে নেঁ!"

তারপর দেখি, ওরা এক পা এক পা করে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। অমনি ঝোলাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। ওরা বিদঘুটে চ্যাঁচামেচি করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝোলাটার ওপর। আর সেই সুযোগে আমি দৌড় দিলুম। দৌড় দৌড় দৌড়! একেবারে স্টেশনে পৌঁছে সোজা স্টেশনঘরে ঢুকে পড়লুম।

টেবিলের ওপর রেলের লণ্ঠন জ্বলছে। কিন্তু স্টেশনমাস্টার কোথায় গেলেন? হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁকে ডাকব ভাবছি, কোনার অন্ধকার জায়গা থেকে তাঁর সাড়া পেলুম। 'কী মশাই, মাছ পেলেন নাকি?"

বললুম, "মাছ তো দূরের কথা, কাকমারির ঝিলে গিয়ে জোর বেঁচে গিয়েছি। উঃ! আপনি ঠিকই বলেছিলেন।"

"কিন্তু আমার যে মাছের ভাগ চাই! কথা দিয়েছেন।" বলে স্টেশনমাস্টার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলেন। মুখে সেই অদ্ভুত হাসিটা। "আমি মাছ খেতে ভালবাসি। মাঁছ আঁমার চাঁই!"

শেষ বাক্যটি কি নাকিস্বরে উচ্চারণ করলেন? আর ঠিক সেই লম্বানেকো আজব প্রাণীগুলোর মতোই ওঁর গায়ের রঙ এবং উনি এক পা এক পা করে আমারই দিকে এগুচ্ছেন দেখছি! একলাফে বেরিয়ে যাব ভাবছি, হঠাৎ কেউ ঘরে ঢুকে হেঁড়ে গলায় গর্জন করল, "তবে রে ব্যাটা মাছখেকো! আবার তুমি আমার আপিসে ঢুকে বসে আছ?"

স্টেশনমাস্টাররূপী লোকটা অমনি জানালা গলিয়ে পালিয়ে গেল। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছি। আসল স্টেশনমাস্টার—যাঁর সঙ্গে তখন আলাপ হয়েছিল, হাসতে হাসতে বললেন, "ভয় পাননি তো? অখদ্যে স্টেশন মশাই, এই

ঝামেলা লেগেই আছে। দেশে মাছের যে বড্ড আকাল। যাকগে, বসুন, মুখ দেখেই বুঝেছি কী ঘটেছে।"

যাই হোক, সেই আমার ছিপে মাছধরার নেশা ঘুচে গেছে তো গেছে। আসার সময় ছিপটা ভেঙে ট্রেনের জানালা গলিয়ে ফেলে দিয়েছি। এখন বেশ শান্তিতেই আছি। নিরামিষ খাই-দাই।..

হাওয়া বাতাস

সেবার পুজোর সময় আমার মামাবাড়ির ছোটবড় সবাই মিলে হিমালয় ভ্রমণে গেলে বাড়ি পাহারার দায়িত্ব পড়েছিল আমার কাঁধে। অবশ্য আমি একা নই, বাড়ির পুরনো কাজের লোক রামলালও ছিল। লোকটা রাঁধুনি হিসেবে খাসা। দুজনে মনের আনন্দে যথেচ্ছ খেতুম আর ক্যারাম পিটতুম। শুধু রাতের বেলাটা...

সে কথা বলতেই এই গল্প।

বাড়িটা শহরতলি এলাকায়। একেবারে নির্জন আর গাছপালা পুকুর-ডোবাও প্রচুর। মনেই হবে না শহরের নাকের ডগায় এমন পাড়াগেঁয়ে পরিবেশ থাকতে পারে। তাছাড়া খুব পুরনো আমলের বাড়ি। চারদিকে বাগান, পুকুর, একটা বাঁশবন পর্যন্ত।

রামলালের বয়স হলেও শরীরখানা এখনো জোয়ানের মত তাগড়াই। বোঝা যায়, এক সময় রীতিমত ব্যায়ামবীর ছিল। আর এমন মানুষ কাছে থাকলে পরিবেশ যাই হোক, কোন রকম ভয়-ভাবনা থাকার কথা নয়। চোর-ডাকাতের সামনে রামলাল গোঁফে তা দিয়ে দাঁড়ালেই লেজ তুলে পালিয়ে যেতে পথ পাবে না।

হ্যাঁ, প্রথমদিন সে কথাই মনে হয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যার মুখে বাইরের গেট বন্ধ করতে গিয়ে যখন রামলাল আমাকে ডেকে বলল, দাদাবাবু, আপনি একটু দাঁড়ান তো এখানে, আমার কেমন ডর বাজছে—তখনই আঁচ করলুম, লোকটাকে যত সাহসী ভেবেছিলুম, ততটা হয়ত নয়।

গেট বন্ধ করে ঝটপট ঘরে ঢুকে রামলাল একটু হেসে বলল, চোর, গুণ্ডা, ডাকু— তাদের সঙ্গে একহাত লড়া যায় দাদাবাবু! কিন্তু হাওয়া-বাতাসের সঙ্গে তো লড়া যায় না!

অবাক হয়ে বললুম, তার মানে? ও রামলাল, হাওয়া-বাতাস ব্যাপারটা কী?

রামলাল চোখ টিপে বলল, সে আছে। কর্তাবাবু যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন, ততক্ষণ কোন ঝামেলা হয় না। রাতবিরেতে উনি বাড়ি না থাকলে ব্যাটা পেয়ে বসে!

কেমন অস্বস্তি হল ওর কথাটা শুনে। বললুম, কার কথা বলছ, খুলে বল তো রামলাল ?

রামলাল ফের চোখ টিপে বলল, আছেন তো! মালুম হয়ে যাবে।

হয়ত মালুম খানিকটা হল কিছুক্ষণ পরেই। দোতলায় একটা ঘরে বসে ফের একদফা চা খেতে খেতে একটা গোয়েন্দা উপন্যাস সবে খুলেছি। রামলাল নিচের

তলায় কিচেনে রাতের জন্য রান্না করছে এবং মাঝেমাঝে তার হেঁড়ে গলার গানও শুনতে পাচ্ছি। হঠাৎ একটা বাতাস উঠল শনশনিয়ে। বাগানের দিকে যেন হুলস্থূল শুরু হল। তারপর বাঁশবন থেকে বিচ্ছিরি ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শোনা যেতে লাগল। ঘরের জানালার কপাটগুলো খটখট করে নড়তে থাকল। আর সেই সময় গেল আলো নিভে। সারা এলাকা অন্ধকার হয়ে গেল দেখে বুঝলুম লোডশেডিং। কিন্তু ততক্ষণে রামলালের গানটা বন্ধ হয়ে গেছে। তারপর সিঁড়িতে ধুপধাপ দুদ্দাড় শব্দ করে সে এসে হাজির হল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, কিচেনে হেরিকেন ছিল। খুঁজে পেলুম না। শিগগির মোম জ্বালুন দাদাবাবু!

টেবিলে ড্রয়ার হাতড়ে মোমবাতি বের করে জ্বেলে নিলুম। আশ্চর্য, বাতাসটা আর নেই। বললুম, কী ব্যাপার রামলাল? তুমি কি ভয় পেয়েছো?

রামলাল কাঁচুমাচু মুখে হাসল। বলল, পাইনি, আবার পেয়েছিও। বুঝলেন না দাদাবাবু? হাওয়া-বাতাসের সঙ্গে এঁটে ওঠা মুশকিল। দেখুন না, গলাটা এখনও বরফ হয়ে আছে। হাওয়া-বাতাসের চড় বলে কথা।

বিরক্ত হয়ে বললুম, হ্যাত্তেরি তোমার হাওয়া-বাতাসের নিকুচি করেছে। তুমি কী বলতে চাইছ, বুঝতে পারছি না!

রামলাল তেমনি চোখ টিপে রহস্যময় হেসে বলল, আছেন যখন এ বাড়িতে, সব মালুম হয়ে যাবে। এখন কৃপা করে একটু কিচেনে এসে বসুন দাদাবাবু! ব্যাটা বড্ড জ্বালাচ্ছে।

ওর কথা শুনে এবং ভাবভঙ্গি দেখে অস্বস্তি বেড়ে গিয়েছিল। তবে লোকটা গায়েগতরে যেমন, সাহসের বেলায় মোটেও তেমনটি নয় তাহলে। রান্না এবং খাওয়া শেষ হলে ওপরের ঘরে শুতে এলুম। আমি ওকে এ ঘরে শুতে বলতুম, কিন্তু কিছু বলার আগে রামলাল নিজেই অনুরোধ করল, আমার ঘরেই মেঝেতে শুতে পারলে রাতের ঘুমটা তার হবে। নইলে নাকি ঐ 'হাওয়া-বাতাস' তাকে ঘুমুতেই দেবে না।

বাতাসের কি প্রাণ আছে? বাতাস কি ভাবে এবং কেন মানুষকে জ্বালাতন করবে আমি ভেবেই পাচ্ছিলুম না। ততক্ষণে আলো এসেছে। মেঝেয় শতরঞ্চির ওপর চাদর পেতে রামলাল নাক ডাকাতে শুরু করেছে। ভিন্ন জায়গায় আমার সহজে ঘুম আসে না। তাছাড়া ঐ অস্বস্তি। বিছানায় শুয়ে টেবলল্যাম্পের আলোয় গোয়েন্দা উপন্যাসটা পড়ার চেষ্টা করছি। এমন সময় আবার সেই উটকো বাতাসটা বাগানের দিকে শনশনিয়ে উঠল। তারপর জানালা খটখটিয়ে ঘরে ঢুকল। জোরে ফ্যান চালিয়ে দিয়েছিলুম মশার অত্যাচারে। ভাবলুম, ভালই হল, বাইরের হতচ্ছাড়া বাতাসটা এসে মশাগুলোর রফা দফা করুক!

কিন্তু ফের সেই লোডশেডিং। তারপর বাঁশবনের ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজের মধ্যে ক্রমশ যেন যন্ত্রণাকাতর মানুষের গোঙানি শুনতে পেলুম। কে যেন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ককিয়ে-ককিয়ে কাঁদছে। আমার গায়ে কাঁটা দিল। এ কখনও কানের ভুল নয়। তাছাড়া ঘরের ভেতর বাতাসটা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। চারদিকে বাইরে এবং ভেতরে প্রচণ্ড হুলস্থূল চলছে। আমি কাঠ হয়ে পড়ে রইলুম। উঠে জানলা বন্ধ করার সাহসও

হল না।

তারপর আচমকা নিচের তলায় প্রচণ্ড শব্দে কী একটা পড়ে গেল শুনলুম। পড়ার শব্দে মনে হল, বিকট ঝনঝন শব্দে বুঝি প্রকাণ্ড একটা কাচ ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। ডাকলুম, রামলাল রামলাল! ওঠ, শিগগির ওঠ তো!

অবাক হয়ে দেখি, রামলাল কখন জেগে গেছে। সে ভারি গলায় বলল, চুপসে শুয়ে থাকুন, দাদাবাবু! ও কিছু না!

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, কী বলছ তুমি? নিশ্চয় নিচের কোনো ঘরের জানালা খুলে গেছে। ছবিটবি পড়ে ভেঙে গেছে।

রামলাল বলল, ও হাওয়া-বাতাসের কাণ্ড দাদাবাবু! চুপচাপ শুয়ে থাকুন।

খাপ্পা হয়ে বললুম, নিকুচি করেছে, তোমার হাওয়া-বাতাসের! মামাবাবু এসে যদি দেখেন, এভাবে আমরা বাড়ি পাহারা দিয়েছি, তোমারও চাকরি যাবে, আমিও মুখ দেখাতে পারব না। ওঠ, চল দেখি কী ভাঙল।

রামলাল অন্ধকারে বলল, আপনি দেখুন দাদাবাবু! আমি যাব না।

রাগ হলে মানুষের সাহস বাড়ে। বালিশের পাশ থেকে টর্চ নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে গেলুম। সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় টের পেলুম বাতাসটা হঠাৎ থেমে গেছে।

বাতাস বলা উচিত হবে না। একে ঝড় বলাই ভাল। শরৎকালে এমন ক্ষণিক ঝড় ভারি অদ্ভুত! বছরের এসময়টা ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টিও হয় এবং তা একনাগাড়ে কয়েকদিন থাকে। কিন্তু এই আচমকা ঝড়ের স্থায়িত্ব মাত্র কয়েক মিনিট। তাছাড়া একফোঁটা বৃষ্টি নেই। আকাশ সারাদিন প্রায় নির্মেঘ ছিল। রাতেও তাই। আকাশভরা তারা ঝকমক করছে দেখেছি। নিচের তলায় পৌঁছে মনে পড়ল, যাঃ। চাবির গোছাটা আনতে ভুলে গেছি। মামাবাবু সব চাবির ডুপ্লিকেট দিয়ে গেলেন। বলে গেলেন, প্রতিদিন সব ঘর যেন রামলালকে দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে নিই; পরিচ্ছন্নতার বড় বাতিক ওঁর।

টর্চের আলো বসার ঘরের দরজায় পড়তেই চমকে উঠলুম। দরজা হাট করে খোলা। মরিয়া হয়ে ভেতরে ঢুকে গেলুম। যা ভেবেছি, তাই। ঘরের দেয়ালে প্রকাণ্ড সব বিদেশী পেন্টিং টাঙানো ছিল। দাদামশাইয়ের মস্ত একটা ছবি ছিল। মহাপুরুষদের ছবি ছিল খানকতক। একটাও দেয়ালে আর নেই। মুখ থুবড়ে নিচে পড়ে খানখান হয়ে গেছে সব কাচ। ফ্রেম পর্যন্ত ভেঙে গেছে।

আরও অদ্ভুত ব্যাপার, সারা ঘরে যেন হুলস্থূল লড়াই করছে কারা। সোফাগুলো উল্টে পড়েছে। ডিভানটা কাত হয়ে রয়েছে। বইয়ের দুটো আলমারি টানাটানি করে স্থানচ্যুত করেছে কারা।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে গেছি ব্যাপার দেখে। অবশ আঙুল টর্চের বোতাম থেকে সরে যেতেই অন্ধকার ঘিরে ফেলল এবং তখন সচেতন হয়ে আবার বোতাম টিপলুম।

উজ্জ্বল একঝলক আলো কোণের দিকে গিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ডে রক্ত ছলকে উঠল। সারা শরীর হিম হয়ে গেল যেন। কোণের মেঝে ও দেয়ালে চাপচাপ রক্ত জ্বলজ্বল করছে।

আর এক মুহূর্ত দাঁড়াবার বা ব্যাপারটা ভাল করে দেখার সাহস হল না। তক্ষুণি ঘুরে কাঁপতে কাঁপতে এবং টলতে টলতে প্রায় দৌড়ে চললুম।

সিঁড়িতে আছাড় খেয়ে টর্চটাও গেল বিগড়ে। চেঁচিয়ে উঠলাম। রামলাল! রামলাল!

রামলাল মোম হাতে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে বলল, কী হল দাদাবাবু?

ভাঙা গলায় অতি কষ্টে বললুম, নিচের ঘরে কাকে খুন করা হয়েছে।

রামলাল আশ্চর্য, ফিক করে হাসল। আগের ভঙ্গিতে বলল, ও কিছু না! হাওয়া-বাতাসের কাজ। চলে আসুন, দাদাবাবু।...

সমস্ত ব্যাপারটা স্বাভাবিক এবং ভয়ঙ্কর। কিন্তু সকালে দুরুদুরু বুকে নিচের সেই ঘরে গিয়ে আমি অবাক হয়ে দেখি, রাতের সেই ভয়ঙ্কর প্রলয়ের সেই চিহ্ন নেই কোথাও! কোথাও এক ফোঁটা রক্ত কেন, এতটুকু লাল দাগ পর্যন্ত নেই!

তাহলে কি ব্যাপারটা নিছক দুঃস্বপ্ন?

মোটেও না। একই স্বপ্ন দুজনে তো একসঙ্গে দেখা অসম্ভব। তাছাড়া রামলাল বলল, কর্তাবাবু বাড়ি না থাকলে এমনটা হয়। বাড়ির ছোটবড় সবাই তা জানে। তাই রাতের ঘটনা নিয়ে আমার মতো কেউ মাথা খারাপ করে না।

শরতের উজ্জ্বল রোদে বাড়ি এবং পরিবেশ কী সুন্দর আর নির্দোষ দেখাচ্ছিল। অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল রাতের ঘটনাগুলো। দিনমানে হাওয়া নেই। যেমন একটা গুমোট ভাব। বিকেল অব্দি রামলালের সঙ্গে সেই বসার ঘরে ক্যারাম খেললুম। তারপর রোদ কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তি জেগে উঠল। রাত হলেই সেই বাড়িটা জেগে উঠবে। তাকে জাগিয়ে তুলবে এসে এক অদ্ভুত ঝোড়ো হাওয়া। বড় অবিশ্বাস্য লাগে।

এ রাতে শোবার সময় মনে মনে ঠিক করেছিলুম, যা কিছু ঘটুক রামলালের মতো নির্বিকার থাকব। রামলাল যথারীতি নাক ডাকিয়ে ঘুমতে শুরু করল। কিন্তু আমি জানি, ঘটনা শুরু হলে সে জেগে যাবে। যথারীতি লোডশেডিং চলেছে। বাইরে চারদিকে একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতা। যেন মঞ্চের পর্দা ওঠার প্রতীক্ষায় স্থাবর জঙ্গম রুদ্ধশ্বাসে রয়েছে। রাত দশটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আবার বাগানের দিকে শনশন শব্দ শুনতে পেলুম। অমনি একটা জেদ এসে গেল। নিচের ঘরটাতে কাল রাতে যেন এক হত্যাকাণ্ডের শেষ দৃশ্যে উপস্থিত হয়েছিলুম, আজ গোড়া থেকে উপস্থিত থাকার ইচ্ছে পেয়ে বসল।

পাছে রামলাল বাধা দেয়, তাই টর্চ নিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে গেলুম। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ততক্ষণে সেই অদ্ভুত রহস্যময় ঝোড়ো বাতাস হুলস্থুল বাধিয়েছে এসে। সিড়িঁতে পা রাখা দায়। ঝড়ের ধাক্কায় টাল খাচ্ছি শুধু।

সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমেই আলো ফেললুম বসার ঘরের দরজায়। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না, যা দেখলুম। ঘরের দরজাটা পুরনো এবং প্রকাণ্ড। মচমচ খটাঙ খট শব্দে দুটো কপাট খুলে গেল। বাতাসটা শনশন করে ঢুকে গেল তক্ষুনি। ভেতরে তোলপাড় শুরু হল।

এক লাফে নেমে ঘরে ঢুকে পড়লুম। টর্চের আলোয় কয়েক সেকেন্ডের জন্যে

ভেসে উঠল পাতাচাপা ঘাসের মত ফ্যাকাশে বেঁটে একটা শরীর মানুষেরই শরীর। পরনে প্যান্টশার্ট আর মাথায় টুপিও যেন আছে। সে একটা ছবি টেনে নামাচ্ছিল। আমার দিকে ঘুরল। মুখটা যেন চীনাদের মত। এই মুহূর্তে টর্চটা বিগড়ে গেল। আমি চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলুম, রামলাল! রামলাল!

তারপর টের পেলুম অসম্ভব ঠাণ্ডাহিম দুই হাতে কেউ আমার গলা টিপে ধরেছে। জ্ঞান হারানোর মুহূর্তেও রামলালকে ডাকার চেষ্টা করছিলুম...!

জ্ঞান হলে দেখি রামলালের বিষণ্ণ মুখ। সে আস্তে বলল, শরীর ঠিক হয়েছে তো দাদাবাবু?

প্রথমে ঘড়ি দেখে নিলুম। বারোটা পাঁচিশ বাজে। উজ্জ্বল আলো। বিদ্যুৎ এসে গেছে। শরীর খুব ক্লান্ত। গলায় সেই ঠাণ্ডা স্পর্শটা এখনও লেগে আছে। দুঃস্বপ্ন নয়, যা ঘটেছে, সবই সত্যি তাহলে।

ব্যাপারটা রামলালকে বলতে যাচ্ছিলুম, সে বাধা দিয়ে বলল, চুপসে নিদ করুন দাদাবাবু! বুঝলেন তো হাওয়া বাতাসের ব্যাপারটা কী! এ বাড়ি কর্তামশাই কেনার পর প্রথম প্রথম আমি খুব লড়ার চেষ্টা করেছিলুম। পারিনি! তবে কর্তামশাইও এ বাড়িতে আর থাকতে চান না। বলে গেছেন, ফিরে এসে বেচে দেবেন।

বললুম, নিচের ঘরে একজন চীনা আমার গলা টিপে ধরেছিল।

রামলাল বলল, চীনা নয় দাদাবাবু! জাপানি। শুনেছি ব্রিটিশ আমলে জাপানের সঙ্গে লড়াই বাধলে লোকটা নিজের পেটে ছোরা মেরে আত্মহত্যা করেছিল। এ বাড়িটা ছিল তারই। তবে ব্রিটিশ সোলজাররা এসে লাশটা ওই বাঁশবনে ফেলে দিয়ে দিয়েছিল। তখনও নাকি ধড়ে প্রাণটা ছিল! এখনও রাত-বিরেতে বাঁশবনে শুয়ে কাঁদে।

চমকে উঠে বললুম, তাহলে রক্তই দেখেছি! হারাকিরির রক্ত!

হাই তুলে রামলাল বলল, ছেড়ে দিন। আপনাকে বলেছিলুম দাদাবাবু, এসব নিয়ে মাথা ঘামাবেন না! হাওয়া বাতাস থেকে গা বাঁচিয়ে চললে কোন ক্ষতি হবে না। লড়তে গেলেই যত ঝামেলা! বুঝলেন তো?

বুঝলুম। জাপানি ভদ্রলোক হারাকিরি করে মারা গেছেন বটে, এখনও ব্রিটিশদের ওপর রাগটা মেটেনি। ওঁকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার, এদেশ ছেড়ে ব্রিটিশরা কতকাল আগে চলে গেছে। আমার বিশ্বাস, সেটা বুঝলেই উনি স্বদেশে চলে যাবেন।...

ভুতুড়ে চশমা

নাতিকে কোলে নিয়ে আদর করতে গিয়ে মুরারিবাবুর চশমাটা গচ্চা গেল। নাতিটির সবে একটি দুটি দাঁত গজিয়েছে। মুখের কাছে আঙুল দেখলেই খপ করে ধরে। কুটুস করে কামড়ে দেয়, খিক খিক করে হাসে।

কিন্তু দাদুর চোখ থেকে একটানে চশমা খুলে নিয়ে ছুড়ে ফেলবে, ভাবা যায়? এখনই এমন বিচ্ছু, তো ভবিষ্যতে কেমন হবে আন্দাজ করে উদ্বিগ্ন হলেন মুরারিবাবু।

চশমা না থাকলে একেবারে কানা বললেই চলে। তাছাড়া চশমটা সবে কিছুদিন আগে করিয়েছিলেন। স্টিলফ্রেমের দামী চশমা।

চশমা ভেঙেছে যে দুষ্টুটা, তার দাদা নুকুর বয়স বছর আষ্টেক। দাদুর অবস্থা দেখে দুঃখিত হয়ে বলল, 'চলো দাদু, তোমাকে চশমার দোকানে নিয়ে যাই।'

মুরারিবাবু বললে, 'সে তো বউবাজারে। হরিকে বল, একটা ট্যাক্সি ডেকে আনুক।'

হরির ভরসা করা কঠিন। ট্যাক্সি ডাকার ছলে সে মোড়ের চায়ের দোকানে ঘণ্টাদুয়েক আড্ডা দিয়ে এসে হয়তো বলবে, কেউ আসতে চাইছে না বড়বাবু!'

নুকু তা জানে বলেই নিজেই বেরিয়ে গেল এবং তক্ষুণি একটা ট্যাক্সিও ডেকে আনল। মাঝে মাঝে নুকু তার ক্ষমতা দেখিয়ে এমন করে তাক লাগিয়ে দেয়। তবে দাদুর সঙ্গে তার যাওয়া হল না। স্কুলের সময় হয়ে আসছে।

ট্যাক্সিওয়ালার চেহারা খেঁকুটে, রোগা। মাথাটি প্রকাণ্ড। তার মধ্যিখানে কাঠির মতো একগোছা চুল বসানো। কুতকুতে চোখ। ইয়া বড় নাক। খুব আলাপী মানুষ! পথে যেতে যেতে বলল, 'ছেলেমানুষ। বড় মুখ করে এসে বলল, দাদু চশমা ভেঙেছে। বউবাজারে যাবেন চশমা করাতে। তা চশমা না থাকার কষ্ট আমি বুঝি, স্যার!'

মুরারিবাবু হাসলেন। 'আপনার তো চশমা নেই দেখছি। কী করে বুঝলেন?'

'ছিল।' ট্যাক্সিওলা বলল। 'আর দরকার হয় না। গত মাসে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। ওতেই চোখ সেরে গেছে।'

মুরারিবাবু অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে?'

'লরির সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা। বুঝলেন না? এক ধাক্কাতেই চশমা গুঁড়ো এবং চোখ পরিস্কার।' ট্যাক্সিওলা খিক খিক করে হাসতে লাগল। 'তারপর থেকে আর চশমার দরকার হয় না। এই যে আপনি চশমা ছাড়া দেখতে পাচ্ছেন না—একটা অ্যাকসিডেন্ট হলেই—বুঝলেন না?'

আঁতকে উঠে মুরারিবাবু বলেন, 'সর্বনাশ! ওসব অলক্ষুণে কথা বলবেন না মশাই! আমার চশমাই ভাল।'

ট্যাক্সিওলা বলল, 'না, না। কথার কথা বলছি। তা বউবাজারে কোন দোকানে চশমা করবেন স্যার?'

'ফ্রেন্ডস অপটিক্যালস। খুব নাম করা দোকান'।

আপনি ইং চুংয়ের দোকানে করান না কেন? গলির ভেতর ছোট্ট দোকান হলে কী হবে? শস্তায় অত ভাল চশমা আর কেউ করতে পারে না। আধঘণ্টার মধ্যে পেয়ে যাবেন।'

মুরারিবাবু একটু ভেবে বললেন, 'হ্যাঁ, ফ্রেন্ডস অপটিক্যালস বড্ড বেশি দাম নেয়। তা ইং চুংয়ের সঙ্গে আপনার আলাপ আছে নাকি?'

'খুব আছে, চলুন না, দেখবেন কত অমায়িক লোক ইং চুং সায়ব।'

ট্যাক্সিওলা বউবাজারে একটা গলির মুখে ট্যাক্সি রেখে বলল, 'আসুন, কাছেই।'

'ইং চুং অপটিক্যালস' লেখা আছে ছোট সাইনবোর্ডে। ঘুপচি একফালি ঘরের

ভেতর বসে আছে একজন চীনা। কফিনের সাইজ শোকেসের ভেতর গোটাকতক চশমা রয়েছে। মিটমিটে একটা বাল্ব জ্বলছে পেছনে। সরু গলিটা এমনিতেই দিনদুপুরে আঁধার হয়ে আছে।

ট্যাক্সিওলা বলে দিল, আমাদের পাড়ার লোক চুং সায়েব, বুঝলে তো? বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখলে চলবে না—ট্যাক্সি দাঁড় করানো আছে।'

মুরারিবাবু খুব অবাক হয়েছিলেন। বসিয়ে রেখে আধঘণ্টার মধ্যে চশমা দেবে? অবশ্য চীনারা সব বিষয়ে দক্ষ। ওদের দেশে প্রাচীনযুগে আশ্চর্য সব বৈজ্ঞানিক কাণ্ডকারখানাও ঘটেছে! সেই প্রাচীন বিদ্যার জোরেই হয়তো চুং সায়েব আধঘণ্টার মধ্যে চশমা বানিয়ে দিলেও দিতে পারে। তবে ট্যাক্সির মিটার কিন্তু ঘুরবে এবং ভাড়ার অংক বেড়ে চলবে।

তা বাড়ুক। চটজলদি চশমা পেলে কত সুবিধে। এই ভেবে মুরারিবাবু প্রেসক্রিপশান বের করে দিলেন চুং সায়েবকে। স্টিলফ্রেমের চশমা পছন্দ, তাও বললেন। চুং সায়েব দেখে ফেরত দিয়ে বলল, 'ওক্কে বাবু! ওনলি টেন মিনিটস!'

বলো কী! দশ মিনিটে দেবে? মুরারিবাবু তাকিয়ে রইলেন মুগ্ধ দৃষ্টে। চুং সায়েব ঘরের ভেতর দিকে একটা সুড়ঙ্গে ঢুকে গেল। ট্যাক্সিওলা চোখ নাচিয়ে বলল, "ম্যাজিক সার, ম্যাজিক! আমার বেলা আধঘণ্টা লেগেছিল। আপনার মাত্র দশ মিনিট। আসলে আপনাকে খদ্দের হিসেবে মনে ধরে গেছে চুং সায়েবের।'

মুরারিবাবু বললেন, 'হয়তো সবরকম পাওয়ারের চশমা আগে থেকে করা থাকে। তাই—'

'বলা কঠিন, সার!' ট্যাক্সিওলা বলল। 'এই যে দেখছেন আমার মুণ্ডুর মাপ। চোখের কোনা থেকে কান অব্দি মেপে দেখুন—পাক্কা দশ ইঞ্চির কম নয়। এই বেখাপ্পা মাপের ফ্রেমও কি আগে থেকে করা থাকে? আসলে স্যার, চীনারা বহুরকম বিদ্যা জানে। বুঝলেন না?'

বুঝলেন মুরারিবাবু। তাই ঠিক। প্রাচীন কোনো গুপ্তবিদ্যার জোরে চুং সায়েব ঠিক মাপের চশমা ঝটপট বানিয়ে ফেলতে পারে। তেমনি মুগ্ধ চোখে ঘরের ভেতরকার সেই সুড়ঙ্গের দিকে তাকিয়ে রইলেন মুরারিবাবু।

কিছুক্ষণ পরে সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এল চুং সায়েব। একটা ডিশের ওপর রাখা সুন্দর স্টিলফ্রেমের চশমা। মুরারিবাবুর চোখে পরিয়ে দিয়ে ছোট গোল একটা আয়না ধরল ওঁর মুখের সামনে। মুরারিবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। অপূর্ব! চেহারা খুলে গেছে একেবারে। মাপেও ঠিক। আর পাওয়ার ঠিক। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। বাইফোকাল চশমা। ওপরের কাচ তফাতে দেখার জন্য এবং নিচের অংশ পড়াশুনার জন্য। চমৎকার!

ম্যানিব্যাগ বের করতেই চুং সায়েব বলল, 'টোয়েন্টি রুপিজ ওনলি!'

মাত্র কুড়ি টাকা! তাহলে দেখা যাচ্ছে ফ্রেন্ডস অপটিক্যালস মহা জোচ্চোর। দুশো টাকা নিয়েছিল আগের চশমাটার!

টাকা মিটিয়ে অনেকবার 'থ্যাংস জানিয়ে নতুন চশমা পরে ট্যাক্সিতে এসে চাপলেন মুরারিবাবু। ট্যাক্সিওলা স্টার্ট দিয়ে খি-খি করে হেসে বলল, 'কী বুঝলেন

সার? যা বলেছিলুম, তাই কি না বলুন?'

মুরারিবাবু একগাল হেসে বললেন, 'ভাল, খুব ভাল।'

ট্যাক্সিওলা বাড়ির সামনে পৌঁছে দিয়ে বলল, 'ভাড়াও দেখুন খুব বেশি ওঠেনি। মাত্র টাকা পনের। অন্য কেউ হলে—'

ট্যাক্সিওলাকে আর কথাই বলতে দিলেন না মুরারিবাবু। একটা কুড়ি টাকার নোট গুঁজে দিলেন ওর হাতে। নমস্কার করে চলে গেল ট্যাক্সিওলা।

ট্যাক্সির নাম্বরটা দেখে রাখলেন। ডব্লিউ বি টি ৯৯৯৯। ভবিষ্যতে কখনও দেখা হলে সুবিধে হবে। বলা যায় না, বর্ষাকালের দিনে কোথাও গিয়ে আটকে গেছেন, কোন ট্যাক্সি রাজি হচ্ছে না, দৈবাৎ যদি ওকে পেয়ে যান—তাঁকে না করতে পারবে না। বড় উপকারী ভালোমানুষ লোকটা। বাড়ির সবাই খুব তারিফ করল নতুন চশমাটার। এমন কী যে বিচ্ছু নাতি চশমা ভেঙেছিল, সেও দাদুর মুখের দিকে তাকিয়ে খিট খিট করে হাসতে লাগল। তাই বলে আর ওর ধারে-কাছে যাচ্ছেন না দাদু।

নিজের ঘরে ঢুকে এদিনকার কাগজটা নিয়ে বসলেন মুরারিবাবু। কাগজ পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে তাকাচ্ছিলেনও। এক সময় হঠাৎ দেখলেন, শরতের নীল ঝকঝকে আকাশে একটা ট্যাক্সি ছুটে আসছে—ছুটে আসবে কীভাবে, উড়েই আসছে এবং প্রচণ্ড বেগে তাঁর দিকেই আসছে। আসতে আসতে একেবারে জানালার কাছে। আর ট্যক্সিটার জানালা দিয়ে মুণ্ডু বের আছে করে সেই ট্যাক্সিওলা—লম্বা নাক, প্রকাণ্ড মুণ্ডু, মাথার ওপর বসানো একগোছা কাঠি-কাঠি চুল, কুতকুতে চোখ আর ঠোঁটে বিদঘুটে হাসি..

আঁৎকে উঠে দৃষ্টি সরিয়ে নিলেন। কিন্তু এ কী! ট্যাক্সিটা যে তাঁর ঘরের ভেতর এবং সেই ট্যাক্সিওলা মুখ বাড়িয়ে হাসছে।

খবরের কাগজে চোখ রাখলেন সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু—ওরে বাবা! কাগজের ওপরেও যে তাই। সেই ট্যাক্সি এবং ট্যক্সিওলা। এবার এতটুকুনটি হয়ে গেছে। পরিষ্কার পড়া যাচ্ছে ট্যাক্সির নম্বর। সেই নম্বর!

ভয় পেয়ে চশমা খুলে ফেলে হাঁক দিলেন মুরারিবাবু, 'হরি! ও হরি! শিগগির একবার আয় তো!'

হরি এসে একগাল হেসে বলল, 'লতুন চশমাখানা শুনলুম ভালই হয়েছে, বড়বাবু। পরুন একবার, দেখি।'

মুরারিবাবু বললেন, 'হরি! তুই একবার চশমাটা পরতো বাবা!'

হরি অবাক হয়ে বলল, 'কেন বড়বাবু? আমি চশমা পরব? আপনার চশমা?'

'ধুর হতভাগা! যা বলছি, কর। নে—পর।'

জোর করে পরিয়ে দিলেন হরির চোখে। হরি বলল, 'বাঃ! খুব পোস্কের চশমা! সব বড়-বড় পষ্টাপষ্টি দেখতেছি।'

'কিছু দেখতে পাচ্ছিস? জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকা।'

হরি জানালার কাছে এসে আকাশের দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'উরে বাব্বা! একখানা ট্যাক্সি আসতিছে যে বড়বাবু! এই! এই! চাপা দেবে যে!'

বলে চশমাটা খুলে ফেলল। মুরারিবাবু উত্তেজনা ও আতঙ্ক চেপে বললেন, 'এবার

ঘরের ভেতরটা দ্যাখ তো হরি!

হরি ভয়ে পেয়ে ছিল। বড়বাবুর কথার ভয়ে-ভয়ে আবার চশমা পরে ঘরের ভেতর তাকিয়েই 'সব্বোনাশ! ট্যাক্সিখানা ঘরে ঢুকে পড়ত্তিছে' বলে খুলে ফেলল চোখ থেকে।

মুরারিবাবু গুম হয়ে চশমা নিয়ে বললেন, 'হরি! কথাটা কাউকে বলিস নে। এটা একটা ম্যাজিক চশমা বুঝলি তো?'

হরিও গুম হয়ে মাথা নেড়ে নিজের কাজে চলে গেল...।

দুই

হরিকে মুরারিবাবু বললেন বটে ম্যাজিক চশমা, কিন্তু ভালই বুঝে গেছেন এ একটা ভুতুড়ে চশমা এবং এর পেছনে নিশ্চয় কোনো চক্রান্ত আছে। তা না হলে চুং সায়েব এর ভেতর ওই ট্যাক্সিওলাকেই তার ট্যাক্সিসমেত ঢুকিয়ে দিয়েছে কেন? সেদিনই আবার যেতে হল বউবাজারে। ফ্রেন্ডস অপটিক্যালসেরই শরণাপন্ন হতে হলে মুরারিবাবুকে। কিছু বেশি টাকা দিয়ে পরদিন বিকেলের মধ্যেই ডেলিভারি পাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। তারপর গেলেন সেই ইং চুং সায়েবের দোকানে।

গিয়েই কিন্তু হতবাক মুরারিবাবু। সেই গলি, সেই ঘুপচি আলো-আঁধারি ঘর, তোবড়ানো রঙচটা সেই ছোট্ট সাইনবোর্ড—সবই ঠিক আছে। কিন্তু এ যে একটা চানাচুর-তেলেভাজার দোকান! এক বুড়ো কাঠখোট্টা চেহারার লোক কয়লার উনুনে প্রকাণ্ড কড়াই চাপিয়ে নাকমুখ সিঁটকে বসে আছে। কড়াইয়ের কালো তরল পদার্থটা থেকে প্রচণ্ড ঝাঁঝ ছড়াচ্ছে। মুরারিবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'ওহে, এখানে চুং সায়েবের চশমার দোকান ছিল, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে দোকান কোথায় উঠে গেল?'

লোকটা ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'কী বলছেন বাবুজী?'

মুরারিবাবু সাইনবোর্ডটা দেখিয়ে বললেন, 'ইং চুং সায়েবের দোকান ছিল না এটা?'

লোকটা গরম তেলে বেগুনি ছেড়ে দিয়ে বলল, 'তা তো জানি না বাবুজী। আমি এই দোকান করেছি পাঁচ-ছ বছর আগে।'

চটে গেল মুরারিবাবু। 'কী বাজে কথা বলছ? আজ সক্কালে এখান থেকে চশমা করিয়ে দিয়ে গেলুম। আর তুমি বলছ পাঁচ-ছ বছর এই দোকান করেছ? তাহলে এই সাইনবোর্ডটা কেন?'

লোকটা বলল, 'সাইনবোর্ড তো পাঁচ-ছ বছর ধরেই আছে। তাতে কী হয়েছে? খামোকা ঝামেলা করবেন না বাবুজী! গলির ভেতর আরও চশমার দোকান আছে। আপনি ভুল করছেন।'

মুরারিবাবু জোর গলায় বললেন, 'অসম্ভব। ওই তো ঘরের ভেতর সেই সুড়ঙ্গটাও দেখতে পাচ্ছি। চালাকি কোরো না আমার সঙ্গে। নিশ্চয় ওই সুড়ঙ্গের ভেতর চুং সায়েব লুকিয়ে আছে। ওকে ডাকো।'

লোকটা খাপ্পা হয়ে বলল, 'আঃ! কী ঝুটঝামেলা করছেন বাবুজী? সবাইকে

জিগ্যেস করুন না, এখানে কোনো চশমার দোকান ছিল না।'

মুরারিবাবু ছড়ি তুলে সাইনবোর্ডে ঠুকে বললেন, 'আলবাৎ ছিল!'

গণ্ডগোল দেখে লোক জড়ো হচ্ছিল। পাশের দোকানের এক ভদ্রলোক ব্যাপারটা শুনে বললেন, 'আপনারই ভুল হচ্ছে সার! ইং চুং সায়েবের চশমার দোকানই ছিল এটা। তবে তা ছ-সাত বছর আগের কথা। চীনা সায়েব ভালই চশমা বানাত। একা থাকত। তারপর একরাত্রে ওকে ডাকাতরা খুন করে যায়। তারপর থেকে কিছুদিন ঘরটা খালি পড়ে ছিল। শেষে মটরুবুড়ো এসে ভাজার দোকান করে।'

মুরারিবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আস্তে আস্তে চলে এলেন গলি থেকে সদর রাস্তায়। পকেটে চুং সায়েবের চশমাটা ঠিকই আছে। অথচ চুং সায়েব আর বেঁচে নেই। ছ-সাত বছর আগে ডাকাতরা তাঁকে খুন করে গেছে! আজ সকালে তাহলে কি কোন অলৌকিক পদ্ধতিতে মুরারিবাবু ছ-সাত বছর পিছিয়ে গিয়েছিলেন?

খুব রহস্যময় ব্যাপার বলতে হয়। মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আর ওই ট্যাক্সি এবং ট্যাক্সিওলাই চশমার ভেতর ঢুকে গেল কীভাবে?

এ হেঁয়ালি উদ্ধার করা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। উদ্ধার করা যেত হয়তো, যদি ট্যাক্সিওলার সঙ্গে ফের দেখা হত।

কিন্তু ট্যাক্সিওলা যে চুং সায়েবের মতো ছ-সাত বছর আগের এক মরে যাওয়া মানুষ নয়, তাই বা কে বলল? হুঁ—সম্ভবত সেও তাই। অপঘাতে মরে যাওয়া মানুষ। তা না হলে লরির সঙ্গে তার ট্যাক্সির মুখোমুখি ধাক্কা, চশমা ভাঙা এবং চোখ সেরে যাওয়ার কথা বলেছিল কেন?

শিউরে উঠলেন মুরারিবাবু। আবার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সাহস করে আবার একবার চশমাটা বের করলেন। চোখে পরে আকাশের দিকে তাকালেন। আধ মিনিট পরেই সেই দৃশ্য আবার। তেড়ে আসছে হলুদ-কালো ট্যাক্সি। জানালা দিয়ে মুণ্ডু বের করা ট্যাক্সিওয়ালা—সেই লম্বা নাক, মাথার ওপর কাঠি-কাঠি একগোছা চুল!

ঝটপট চশমাটা খুলে পকেটে ভরে রাখলেন। তারপর সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউয়ের মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকা একটা বাসে উঠে পড়লেন। বাসে প্রচণ্ড ভিড়। কিন্তু উপায় কী? চারটে বাজতে না বাজতে এই অবস্থা হয়ে যায়। বয়স হয়েছে মুরারিবাবুর। চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে কোনোরকমে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই টের পেলেন তাঁর পাঞ্জাবির পাশ পকেটে কেউ হাত ঢোকাচ্ছে। দু-হাতে ওপরকার রড ধরে আছেন। হাত দুটো নামাবার উপায় নেই। এতটুকু নড়ারও সাধ্য নেই। সামনে-পেছনে-দুপাশে লোকেরা তাঁকে ঠেসে রেখেছে। এ অবস্থায় মুখে 'পকেটমার! পকেটমার!' বলে চেঁচানো ছাড়া আর কিছু করা যায় না। কিন্তু চ্যাঁচাতে গিয়ে থামলেন মুরারিবাবু। বরং মুচকি হাসলেন।

যে পকেটে পকেটমার হাত ঢোকাচ্ছে, সেই পকেটে সেই ভুতুড়ে চশমাটা ছাড়া আর কিছু নেই! নিয়ে যাক না ব্যাটা, আপদ বিদেয় হোক বরং। ওই বিদঘুটে জিনিসটা আবার কী ঝামেলা বাধায় বলা যায় না। কে বলতে পারে, আচমকা একসময় ট্যাক্সিটা চশমা থেকে বেরিয়ে তাঁকে চাপা দেবে না! হুঁ—সেটা হয়তো অসম্ভব নয়। যে-জোরে ছুটে আসে, মনে হয় তাঁর ওপর এসে পড়ল বলে।

কিংবা ছোট্টটি হয়ে চোখের ভেতর ঢুকে যেতে পারে।

পকেটমার পকেটে হাত ঢোকাচ্ছে আর মুরারিবাবু এইসব কথা ভেবে খিক-খিক করে হাসছেন। পাশের লোকেরা তাঁর দিকে চোখ ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে। নিশ্চয় পাগল ভাবছে তাঁকে। ভাবুক।

কিন্তু তারপরেই কেউ চেঁচিয়ে উঠল, 'তবে রে ব্যাটা! তখন থেকে দেখছি এই ভদ্রলোকের পকেটে হাত ঢোকানোর চেষ্টা করছ—'

সঙ্গে সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল চলন্ত বাসের ভেতর। একসঙ্গে অসংখ্য যাত্রী কানফাটানো গলায় চ্যাঁচাতে থাকল, 'মার! মার! শেষ করে দে।'

বাসে পকেটমার ধরা পড়লে যা হয়। সে এক হুলস্থূল কাণ্ড। ভিড়ের ধাক্কায় মেয়েদের আর্তনাদ, বাচ্ছাদের ভ্যাঁ—বেগতিক বুঝে ড্রাইভার বাস দাঁড় করাল।

মুরারিবাবু দেখলেন, একটা লোককে যাত্রীরা টানতে টানতে বাস থেকে নামাচ্ছে এবং সেই লোকটাই নিশ্চয় তাঁর পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল।

কিন্তু রাস্তায় তাকে টেনে নামাতেই মুরারিবাবু হকচকিয়ে গেলেন। পকেটমার আর কেউ নয়, সেই ট্যাক্সিওলা—লম্বা নাক, মাথার ওপর বসানো কাঠি-কাঠি চুল! মুরারিবাবু ভিড় ঠেলে নামবার চেষ্টা করে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ওকে মারবেন না! ওকে মারবেন না!'

কিন্তু এখন এসব কথা কে শোনে! রাস্তার লোকেরাও এসে জুটে গেছে। সবাই তাকে মারবার চেষ্টা করছে। ভিড় ঠেলে মুরারিবাবু কিছুতেই কাছে যেতে পারলেন না।

এই সময় বাসের কন্ডাক্টার চেঁচিয়ে বলল, 'বাস ছেড়ে যাচ্ছে! ওঠবার হলে উঠে পড়ুন!'

নিমেষে ভিড় শূন্য হয়ে গেল। এ বাস ছেড়ে দিলে আবার কখন পাবে, তার ভরসা নেই। মুরারিবাবু তাকিয়ে রইলেন। কৈ? কোথায় গেল সেই ট্যাক্সিওলা—যাকে পকেটমার বলে লোকেরা বেদম পিটুনি দিচ্ছিল?

তন্নতন্ন করে খুঁজে আর তাকে দেখতেই পেলেন না মুরারিবাবু। কোন ফাঁকে কেটে পড়েছে সে। তবে শুধু ওইটুকুই পরিষ্কার বোঝা গেল, লোকটা চশমাটা এবার হাতানোর তালে আছে। নিশ্চয় কোনো কারণে সে চশামাটা মুরারিবাবুর কাছে থাকা আর ঠিক মনে করছে না!

হুঁ—রহস্য আরও জট পাকিয়ে গেল তাহলে। মুরারিবাবু ভাবনায় গুম হয়ে গেলেন। তারপর বাসটা স্টার্ট দিতেই সম্বিৎ ফিরল। 'রোখো! রোখো! বলে চেঁচিয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু তক্ষুনি থমকে দাঁড়ালেন। কোন সাহসে আবার বাসে চাপতে যাচ্ছেন—ভিড়ের মধ্যে?...

তিন

সেদিনই অনেক রাতে আরও একটা ঘটনা ঘটল। মুরারিবাবুর রাত জেগে বই পড়ার অভ্যাস। কিন্তু চমশার অভাবে বই পড়া হল না। অথচ ঘুমও আসতে চাইল না। তাই বলে চুং সায়েবের চশমা পরে বই পড়ার সাহস ছিল না। বইয়ের পাতায়

দেখবেন শুধু একটা রহস্যময় ট্যাক্সি! বইপড়া তো যায় না এভাবে।

শুয়ে ছিলেন চুপচাপ। চশমারহস্য নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছিলেন অগত্যা। সেই সময় ফোন বাজল। রাত বারোটার কে ফোন করছে? হাত বাড়িয়ে ফোন তুলে বললেন, 'হ্যালো! কাকে চাই!'

'আপনি কি মুরারিমোহন সাঁতরা?'

'হ্যাঁ। কে বলছেন আপনি?'

'আমি তারপদ বক্সী। নমস্কার সার।'

'আপনাকে তো চিনতে পারলুম না ঠিক।'

'সে কী সার! আজ সকালেই তো আপনাকে ট্যাক্সি করে চুং সায়েবের দোকানে—'

মুরারিবাবু নড়ে উঠলেন। 'আরে শুনুন, শুনুন!'

শোনার আগে আমার কথাটা বলে নিই সার!'

উত্তেজনা চেপে মুরারিবাবু বললেন, 'হুঁ—বলুন।'

'চুং সায়েব কেলেঙ্কারি করেছে। আজ সকালে আপনাকে চশমা তৈরি করে দেওয়ার পর দুপুরবেলা আমার সঙ্গে এক জায়গায় হঠাৎ দেখা। হাসতে হাসতে বলল কী—সেই বুড়োবাবুর চশমা ভেতর আমাকে ট্যাক্সি সমেত ঢুকিয়ে দিয়েছে। শুনে তো আমি ভাবনায় পড়ে গেলুম। বুড়োবাবু—মানে আপনি যদি ব্যাপারটা পুলিশের কানে তোলেন,—বুঝলেন তো সার?'

'কিছু বুঝলাম না।'

'তাহলে গোড়ার কথাটা খুলে বলি, সার!'

'বলুন। সেটাই শুনতে চাই।'

'বছর ছয়েক আগে এক রাত্তিরে ভবানীপুরে প্যাসেঞ্জার নামিয়ে খালি ট্যাক্সি নিয়ে শ্যামবাজারে ফিরে আসছি, চৌরঙ্গীতে চারজন লোক দাঁড় করিয়ে বলল, শ্যামবাজার যাবে। খুশি হয়ে ওঠালুম তাদের। কিন্তু তখন কি জানতুম ওদের কী মতলব? বলল, বউবাজার হয়ে একটা কাজ সেরে ওদের যেতে হবে। তাই বউবাজারের দিকে চললুম। চুং সায়েবের দোকানের গলির মুখে একটা ট্যাক্সি দাঁড় করাতে বলল। তিনজন নেমে গেল। একজন আমায় পেছন থেকে ছুরি দেখিয়ে বলল, চুপ। যা বলব, করবে। 'টুঁ' করলে মারা পড়বে। বুঝলেন তো সার?'

'হুঁউ। ওরা চুং সায়েবের দোকানে ডাকাতি করেছিল। তারপর চুং সায়েবকে খুন করে—'

'ট্যাক্সিতে ফিরে এল। প্রাণের ভয়ে একটা কথা বলতে পারলুম না। বুঝলেন না?'

'আহা বুঝতে পেরেছি। তারপর?'

'তারপর সার ডাকাতগুলো হুকুম দিলে, স্পিড বাড়াও! বাধ্য হয়ে স্পিড বাড়ালুম। সেন্ট্রাল এভেনিউতে যেই পৌঁছেছি, আচমকা একটা লরি এসে পড়ল মুখোমুখি। আর ব্যস! বুঝলেন তো সার?'

'বুঝলুম। আপনি অক্কা পেলেন!'

'একেবারেই।'

'তার মানে আপনি ভূত হয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছেন?'

'হেঁ হেঁ—লজ্জা পাই সার, ভূত বললে।'

'ভূত বললে লজ্জা পান, কিন্তু বাসে উঠে আমার পকেটে হাত ঢোকাতে লজ্জা পান না!'

'ধরা পড়ার ভয়ে সার! পুলিশ—বুঝলেন না? পুলিশ এখনও খুঁজছে আমাকে।'

'সেই পুলিশও নিশ্চয়ই ভূত?'

'ঠিক ধরেছেন সার! তাই বলছিলুম, দয়া করে যদি চশমাটা আমাকে দেন, খুব ভাল হয়। চুং সায়েব আমাকে আর জড়াতে পারবে না ডাকাতি কেসে। পুলিশও প্রমাণ পাবে না।'

মুরারিবাবু গর্জে বললেন, 'চালাকি?'

'কেন সার?'

'আপনি ভূত?'

'হেঁ হেঁ—আর লজ্জা দেবেন না সার!'

'শাট আপ! আপনি ভূত হয়ে আমাকে টেলিফোন করছেন রাত দুপুরে? আমি কচি খোকা?'

'সে কী সার? বিশ্বাস করলেন না?'

'না। চুং সায়েবকে ডাকতরা খুন করেছিল শুনে এসেছি। কিন্তু আপনি দিব্যি ট্যাক্সি করে এখনও ঘুরছেন—তার মানে, আপনি বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন। চুং সায়েব ভূত। তাতে আর সন্দেহ নেই। ভূত হয়ে চুং সায়েব এতদিনে আপনাকে ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন। আপনাকে আমি ধরিয়ে দেব। মশাই! আমাকে কি বুদ্ধু পেয়েছেন যে বিশ্বাস করব, ভূত হয়েও আপনি আমার পকেটে হাত ঢোকাচ্ছিলেন এবং লোকেদের হাতে যথেচ্ছ পিটুনি খাচ্ছিলেন?'

'চুং সায়েবের ভূত যদি চশমা করে দিতে পারে, তাহলে আমিই বা আপনার পকেটে হাত ঢোকাতে পারি না কেন? লোকের হাতে মার খেতেই বা অসুবিধেটা কিসের সার?'

তর্কে হেরে গিয়ে মুরারিবাবু বললেন, 'কিন্তু আমি তো ভূত নই। আমি আপনাদের পুলিশ-ভূতকে পাচ্ছি কোথায় যে চশমাটা দেব তাদের?'

'ওরা আপনার আনাচে-কানাচেই ঘুরছে সার! আজ সকালে আমার ট্যাক্সি করে আপনাকে যেতে দেখেছে না?'

মুরারিবাবু শিউরে উঠে জানালাগুলোর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'আপনি কোত্থেকে ফোন করছেন?'

'যে হাসপাতালের মর্গে ছিলুম, সেই হাসপাতালের পাবলিক বুথ থেকে।'

'বেশ। চলে আসুন। চশমা পেয়ে যাবেন।'

'আমি গোপনে যাব, সার!' তারাপদ বক্সী চাপা গলায় বলল। 'গিয়ে আপনার জানালায় টোকা দেব। আপনি যেন দয়া করে জেগে থাকবেন।'

'জানালা খোলা থাকে আমার ঘরে।'

'এটা উচিত নয় সার। বিস্তর খারাপ লোক আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায় আজকাল।'

'ঠিক আছে। বলছেন যখন বন্ধ করে দেব। আপনি আসুন।'

ফোন রেখে মুরারিবাবু গুম হয়ে বসে রইলেন মিনিট দুই। মুহুর্মুহু গা শিউরে উঠল। এতক্ষণ একজন ভূতের সঙ্গে কথা বলছিলেন ভেবেই।

তারপর ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে জানালাগুলো বন্ধ করে দিলেন। একটু পরে ঝমঝম করে হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হল। বর্ষার রাত। তাছাড়া এবার বর্ষাটা বড্ড বেশি রকমের।

কিন্তু তারাপদ বক্সীর আসবার নাম নেই। ভুতুড়ে চশমা ভূতের হাতেই চলে যাক, তাতে ক্ষতি মাত্র গোটা পঁয়তাল্লিশ টাকা। মাঝখান থেকে চর্মচক্ষে ভূতদর্শন হয়ে গেল। মন্দ কী! এখন সবকথা জানার পর দরকার খানিকটা সাহস। ভয় পেলে চলবে না।

আবার ফোন বাজল ক্রিং ক্রিং করে। তারাপদ বক্সী এ রাতে আসতে পারবে না বলবে নাকি? কে জানে, আনাচে-কানাচে পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছে বলছিল!

কাঁপা কাঁপা হাতে ফোন তুলেই বললেন', 'তারাপদবাবু নাকি?'

ফোনের ভেতর ভারিক্কি গলায় ভেসে এল, 'আপনি কি তারাপদ বক্সীর কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি কে?'

'বউবাজার থানা থেকে বলছি। আপনার তাহলে তারাপদর সঙ্গে যোগাযোগ আছে?'

'না—মানে—'

'মানেটানে আবার কী? শুনুন মুরারিবাবু! আমাদের কাছে খবর আছে, ১৯৭৮ সালের ২১শে জুলাই তারিখে বউবাজার এলাকায় ইং চুং সায়েবের দোকানে যে ডাকাতি হয়েছিল, সে ব্যাপারে আপনার কাছে একটা মূল্যবান এভিডেন্স আছে।'

'বুঝেছি। চশমাটার কথা বলছেন তো?'

'হ্যাঁ। শুনুন, এখনই আমরা যাচ্ছি আপনার কাছে। সাবধান চশমাটা যেন কাউকে দেবেন না। আমার খবর পেয়েছি, তারাপদ ওটা চুরির মতলবে ঘুরছে। আপনার কাছে চাইতেও যেতে পারে। আপনি যা ভালোমানুষ, বলা যায় না কিছু।'

মুরারিবাবু বিব্রতভাবে বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা।'

'আচ্ছা-টাচ্ছা নয়। আমরা যাচ্ছি।'...

ফোন রেখে মুরারিবাবু আবার গুম হয়ে গেলেন। বেচারা তারাপদ বক্সীর তো কোন দোষ নেই। ছুরি দেখিয়ে ডাকাতরা ওকে বাধ্য করেছিল ট্যাক্সি নিয়ে যেতে। খামোকা পুলিশ হয়রান করবে ওকে।

কিন্তু তারাপদকে চশমা দিলে পুলিশ এসে তাঁকেই হয়রান করবে। কে জানে এ পুলিশ কোন পুলিশ? পুলিশ, নাকি শুধু পুলিশ? পুলিশ বলেই মনে হচ্ছে।

বাইরে খুব বৃষ্টি ঝরছে সমানে। একটা জানালা খুলেই বন্ধ করে দিলেন মুরারিবাবু। বৃষ্টির ছাঁট আসছে। ঘরের ভেতর টেবিল ল্যাম্প জ্বলছিল। হঠাৎ সেটা

নিভে গেল। ফ্যানও বন্ধ হয়ে গেল। লোডশেডিং।

অন্ধকারে টেবিলের ড্রয়ার হাতড়ে একটা মোমবাতি পাওয়া গেল। এত রাতে হরির ঘুম ভাঙানো কঠিন। একটা হেরিকেন হলেই ভালো হত। মোমবাতিটা বড্ড ছোট আর লিকলিকে।

মোমবাতিটা সবে জ্বেলেছেন, বাইরে খটখট ঝুপঝাপ জুতোর শব্দ শোনা গেল। তারপর দরজার কড়া নাড়ার শব্দ। তাড়াহুড়ো করে দরজাটা খুলতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন মুরারিবাবু। চেয়ারের ডগা মাথায় লাগল। বেশ জোর লাগল। ককিয়ে উঠলেন।

তারপরই কানের কাছে নুকুর চিৎকার শুনতে পেলেন, 'দাদু! দাদু!'

চোখ খুলে ফ্যালফ্যাল করে তাকালেন মুরারিবাবু। তাঁর মুখের সামনে নুকু, নুকুর বাবা, নুকুর মা এবং কোলে সেই চমশা-কাড়া বিচ্চু খোকাটা এবং হরিও দাঁত বের করে আছে।

ব্যাপারটা কী? মুরারিবাবু মুখটা একটু তুলেই অবাক হলেন। এ কোথায় শুয়ে আছেন তিনি? এ তো হাসপাতাল বলে মনে হচ্ছে।

আর তাঁর মাথায়, ব্যান্ডেজ, হাতে ব্যান্ডেজ, পায়ে ব্যান্ডেজ।

সঙ্গে সঙ্গে মাথার ভেতরটা কেমন করে উঠল। নুকু বলল, 'দাদু, চোখ খোলো! আমরা তোমাকে দেখতে এসেছি। ট্যাক্সিতে আক্‌সিডেন্ট হয়ে তুমি মরে গিয়েছিলে যে?'

তবে তাই। লম্বা নাক, কুতকুতে চোখ, মাথার ওপর কাঠি-কাঠি চুল একটা লোকের ট্যাক্সিতে চেপে চশমা করাতে যাচ্ছিলেন মনে পড়েছে। কিন্তু কখন অ্যাকসিডেন্টটা হল। কিছুতেই মনে পড়ছে না। যাইহোক, ট্যাক্সিতে ওঠার পর বাকিটা তাহলে ধাক্কা খেয়ে চোখের মতোই মগজ পরিষ্কার হওয়ার ফল। সময়ের উজানে চলে গিয়েছিলেন। খিক খিক করে হেসে উঠলেন মুরারিবাবু। তাঁকে হাসতে দেখে সবাই অবাক। উদ্বিগ্নও। পাগল হয়ে যাবেন না তো?

চার

না। আঘাত তত গুরুতর হয়নি। মাস তিনেকের মধ্যে মুরারিবাবু আগের মতো চলাফেরা করতে পারছেন। তবে ভারি আশ্চর্য একটা ব্যাপার ঘটে গেছে, বিনা চশমায় দিব্যি বইপত্র পড়তে পারছেন এবং দূরের সবকিছুই দেখতে পাচ্ছেন।

তারাপদ বক্সী বলেছিল বটে, 'এক ধাক্কাতেই চোখ পরিষ্কার।' বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি চেপে মোড় অব্দি গেছেন, আচমকা লরির ধাক্কা ট্যাক্সিওয়ালা বেচারা নাকি মারা গেছে।

যে আগেই মরে গিয়েছিল, দ্বিতীয়বার তার মরা না-মরা সমান।

এরপর একদিন মুরারিবাবু রাস্তার মোড়ে গেছেন ট্যাক্সি ধরতে। ভবানীপুরে ভাগ্নে শ্রীমান মুকুলের বাড়ি যাবেন। কিন্তু বাসে বেজায় ভিড়। ট্যাক্‌সিও পাচ্ছেন না। হঠাৎ দেখতে পেলেন একটা খালি ট্যাক্‌সি আসছে। হাত দেখাতেই ট্যাকসিটা দাঁড়িয়ে গেল।

অমনি মুরারিবাবু দেখলেন সেই লম্বা নাক, কুতকুতে চোখ, মাথায় কাঠি কাঠি চুল—তাঁরাপদ বক্সী! আঁতকে পিছিয়ে এসে বললেন, 'না, না যাব না।'

এক ভদ্রলোক ট্যাক্সির জন্য তাক করছিলেন। তিনি তক্ষুনি উঠে পড়লেন। মুরারিবাবু বারণ করার আগেই ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেল। সেই নম্বর। ডব্লিউ বি টি ৯৯৯৯। যাক্‌গে। আরেকজনের মগজ সাফ হয়ে যাবে ধাক্কা খেয়ে। এই কলকাতায় এমন কত ট্যাক্সি এবং কত তারাপদ বক্সী ঘুরে বেড়াচ্ছে—এবং পুলিশও। মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তবে মুরারিবাবু কৃতজ্ঞ বৈকি। এক ধাক্কায় তাঁর চোখ পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর চশমাও লাগে না।...

রাতের আলাপ

রাত দশটা বাজলেই আমাদের পাড়ায় লোডশেডিং হবেই হবে। কাজেই রাতের খাওয়া শেষ করে মাদুর আর বালিশ নিয়ে খোলা ছাদে গিয়ে শুই। ঘুমটা আরামেই হয়।

এ রাতে ছাদে শুতে গিয়ে চমকে উঠলুম। ছাদের কার্নিশের কাছে কালো এক মূর্তি। সারা পাড়া আঁধার কালো। নিশুতি রাতে সুনসান নিরিবিলি ছাদে কালো হয়ে কেউ দাঁড়িয়ে থাকাটা কাজের কথা নয়, বাড়ির মালিক যখন আমি এবং এ ছাদও আইনত আমার।

অতএব চোর না হয়ে যায় না।

কিন্তু আজকালকার চোর আর সে গোবেচারা চোর নয়। তাদের কাছে নাকি ছুরি-বোমা পিস্তলও থাকে। চ্যাঁচামেচি করলেই বিপদ। তাই ভয়ে ভয়ে বললুম, "কে?"

"আমি।" চোর জবাব দিল মিনমিনে গলায়। তারপর ফোঁত ফোঁত করে দুবার নাক ঝাড়ল।

এইতে আমার একটু সাহস হল। বললুম, "আমিটা কে?"

"সেটাই তো বুঝতে পারছিনে স্যার?"

"তার মানে?"

"আমার নামধান কিছু মনে পড়ছে না।"

আরও সাহস পেয়ে ধমক দিয়ে বললুম, "চালাকি হচ্ছে? অন্যের বাড়ির ছাদে উঠে—"

"দয়া করে কথাটা শুনুন আমার।"

"কোনো কথা শুনতে চাইনে। তুমি ছাদে উঠলে কী মতলবে?"

"আজ্ঞে বিশ্বাস করুন—"

"চো-ও-প!" চোরের হালচাল দেখে তখন আমার জোর বেড়ে গেছে। বললুম, "নিশ্চয় তুমি পাইপ বেয়ে ছাদে উঠেছ চুরির মতলবে। দাঁড়াও, আমি চ্যাঁচামেচি করে লোক জড়ো করছি।"

"স্যার! স্যার!" সে ভাঙাগলায় প্রায় কেঁদেই ফেলল। "বিশ্বাস করুন, আমি চুরি করতে আসিনি। আমি কস্মিনকালে চোর নই, চোরের মাসতুতো ভাইও নই। আমি একটি গণ্ডগোলে পড়ে গেছি স্যার!"

কান্নাকাটি শুনে বললুম, "সত্যি বলছ, তুমি চোর নও?"

"না স্যার!"

"তাহলে ছাদে উঠেছ কেন? কী ভাবে উঠেছ?"

"আজ্ঞে, কীভাবে উঠেছি ঠিক মনে পড়ছে না।"

"ন্যাকা! বলি কি, নামধাম মনে পডছে না—অন্যের বাড়ির ছাদে কীভাবে উঠে এল, সেটাও নাকি মনে পড়ছে না।" ওকে আঙুল তুলে শাসালুম। "এক মিনিট সময় দিচ্ছি—আসল কথা ফাঁস না করলে এইসা রামচ্যাঁচানি চেঁচাব যে পাড়াসুদ্ধু লোক লাঠিসোটা নিয়ে এসে তোমায় রামঠেঙানি ঠেঙাবে।"

লোকটা বেজায় ঘাবড়ে গেল এবার। ভ্যাঁ করে কেঁদে বলল, "ওরে বাবা! তাহলে যে আমি আবার মারা পড়ব!"

একটু খটকা লাগল! বললুম, "আবার মারা পড়বে মানে? কবার মারা পড়েছ হে? অ্যাঁ?

"আজ্ঞে, বেশি নয়। মোটে একবার।" লোকটা আবার ফোঁত ফোঁত করে নাক ঝাড়ল। 'ওরে বাবা! ওই একবাবেই যে কষ্ট পেয়েছি। আবার মরতে হলে—ওঃ!"

"ব্যাপারটা কী খুলে বলো তো বাপু?" ওর কান্নাকাটি দেখে এবং এই সন্দেহজনক কথাবার্তায় একটু ভড়কে গিয়েই বললুম?

'বুঝলেন না স্যার?"

"মোটেও না।"

"আজ সন্ধেবেলায় আমি সম্ভবত গাড়িচাপা পড়েছিলুম। আবছা মনে পড়ছে একটু।"

"বলো কী হে? তারপর? তারপর?"

"তারপর আর কী? মরে গেলুম।"

আকাশ থেকে পড়লুম একেবারে। "মরে গেলে? মরেই যদি গেলে তাহলে এখানে এসে আমার সঙ্গে কথা বলছ কী করে?"

"সেটাই তো বুঝতে পারছি না স্যার! এমন কী আমি কে—"

"ওয়েট, ওয়েট! তুমি বলতে চাইছ যে তুমি ভূ-ভূ..."

লোকটা চাপা গলায় বলে উঠল, "বলবেন না স্যার বলবেন না। শুনলে ভয় করে। ওদের আমি ভীষণ ভয় পাই। তাছাড়া জানেন তো? কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলতে নেই।"

এতক্ষণে আমার গায়ে কাঁটা দিল। আস্তে বললুম, "তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু তুমি তো এখন ওদেরই একজন। অথচ তুমি ওদের ভয় পাচ্ছ! এতো ভারি বিদঘুটে কথা বাপু।"

"আমি যে সবে ওদের একজন হয়েছি। নতুনদের এলে যা হয়।"

আমার সন্দেহ ঘুচে গেল। তাহলে যা ভেবেছি, তাই। এখন মাথা ঠিক রাখা

দরকার। চারদিক আঁধারকালো নিশুতি নিঝুম। সাবধানে কথা বলা উচিত। বললুম, "দেখ ভাই, এক কাজ করো। তুমি বরং পাকাপাকি একটা আস্তানা করে নাও কোথাও।"

"আপনার ছাদটা মন্দ নয় স্যার। বেশ নিরিবিলি।"

"তোমার মাথা খারাপ? বরং ওই যে দেখছ চিনুবাবুদের চিলেকোঠা দেখতে পাচ্ছ তো?"

"ওরে বাবা! হাসপাতালের মর্গ থেকে প্রথমে তো ওখানেই গিয়েছিলুম। ওখানে যে এক বড়বাবুর আস্তানা। যেমন তুম্বো চেহারা, তেমনি গলার আওয়াজ। পিস্তল তুলে বলে, পাকড়ো! পাকড়ো!"

"বুঝেছি। চিনুবাবুর বাবা। একসময় পুলিশের দারোগা ছিলেন!"

"তাই মনে হল দেখে। এজন্যেই বলে, স্বভাব যায় না মলে। পিস্তলটারও।"

"তোমারও যায় নি মনে হচ্ছে! তুমি কি ছিলে বলো তো?"

"আজ্ঞে সেটাই তো মনে পড়ছে না।"

"বাঃ! ট্যাক্সিচাপা পড়াটা মনে পড়ছে, চিনুবাবুদের চিলেকোঠায় যাওয়াটা মনে পড়ছে—আর এই আসল কথাটা মনে পড়ছে না?"

"কিছু-কিছু মনে পড়ছে, কিছু কিছু পড়ছে না। বুঝলেন না? সদ্য সদ্য মরেছি কি না! সব গণ্ডগোল হয়ে তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে!"

"বেশ। এখন কী করতে চাও, তাই বলো। আমার ঘুম পাচ্ছে।"

"আপনি শোন না স্যার। শুয়ে পড়ুন।"

"আর তুমি?"

"বসে ভাবি। ভেবে দেখি, আমি কে? তারপর একটা ঠিক করা যাবে।"

আপত্তি করে বললুম, "সেটা কাজের হল না। তুমি বরং অন্য কোথাও গিয়ে ভাবো।"

"আমাকে কি ভয় পাচ্ছেন স্যার?"

"পাচ্ছি বৈকি।"

"ভয় পাবেন না দয়া করে। কারণ আমার নিজেকেই নিজের ভয় করছে!"

"কেন? কেন?"

"বুঝলেন না? টাটকা মরেছি। এখনও ধাতস্থ হয়নি কিছু। দেখতে পাচ্ছেন না স্যার—এখনও অশরীরী পর্যন্ত হতে পারছি না। শরীরটাকে যতবার ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করি, তত এসে পেয়ে বসছে। সেই দুঃখেই তো কাঁদছিলুম তখন।"

"চেষ্টা করে দ্যাখো!" হাই তুলে বললুম। তারপর মাদুর বিছিয়ে বসলুম এতক্ষণে। যার নিজেকে ভয় করছে, তাকে আমার ভয় পাওয়ার কোনো মানে হয় না।

লোকটা বলল, "আপনি শুয়ে পড়ুন। দেখি কী করা যায়।"

অগত্যা আমি শুয়ে পড়লুম। কিন্তু কাত হয়ে একটা চোখ রাখলুম ওর দিকে। লোকটা একটু পরে হঠাৎ জিমন্যাস্টিক শুরু করল। ছোটাছুটি, ডিগবাজি, শূন্যে চরকির মতো পাক খেয়ে হরেক কসরত করে একসময় থামল। ফোঁস ফোঁস করে

শ্বাস ফেলতে লাগল ক্লান্ত হয়ে। বললাম, "ও কী করছ হে?"

"আজ্ঞে অদৃশ্য হবার চেষ্টা করছি। পারছি না।"

"পারবে, পারবে। আবার শুরু করো!"

"করব। কিন্তু গলাটা যে শুকিয়ে গেল। বড্ড তেষ্টা। দয়া করে এক গ্লাস জল খাওয়াবেন স্যার?"

"খাওয়াব। কিন্তু কথা দাও, অশরীরী মানে অদৃশ্য হতে পারলে এ ছাদ ছেড়ে চলে যাবে।"

"দিচ্ছি স্যার। চলে যাব কোথাও।"

"শুধু দিচ্ছি বললে হবে না। দিব্যি করো।"

"কার নামে করব?"

একটু ভেবে বললুম, "বাবা মহাদেবের নামে! উনি তোমাদের দেবতা, জানো না?"

লোকটা বাবা মহাদেবের নামে দিব্যি করলে আমি জল আনতে গেলুম।...

এক গেলাস জল নিয়ে ছাদে ডাকলুম, "কৈ হে! জল নাও।" কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আরও কয়েকবার ডাকাডাকি করে বুঝলুম, ওর চেষ্টা সফল হয়েছে। তখন জলটা নিজেই খেয়ে শুয়ে পড়লুম নিশ্চিন্তে। কিন্তু লোকটা কে?

অবশ্য সকালের কাগজে দুর্ঘটনার খবরে লোকটার নাম পেয়ে যেতেও পারি।...

ছুটির ঘণ্টা

আমার ছেলেবেলায় পাড়াগাঁয়ের প্রাইমারি স্কুলকে বলা হত পাঠশালা আর ক্লাসকে বলা হত শ্রেণী। সব পাঠশালায় ক্লাস ফোর পর্যন্ত থাকবে, তার মানে নেই। আমি যে পাঠশালায় পড়তুম, সেখানে ছিল শিশুশ্রেণী, প্রথম শ্রেণী আর দ্বিতীয় শ্রেণী। শিক্ষক মোটে একজন তাঁকে বয়স্করা বলতেন নিসিং পণ্ডিত। আমরা বলতুম পণ্ডিতমশাই।

নিসিং পণ্ডিতের এক দাদা ছিলেন। তাঁর নাম গিরিজাবাবু। আড়ালে আমরা বলতুম গিজাংবাবু। মাটির ঘর আর খড়ের চালের পাঠশালার দাওয়ায় তালপাতার চাটাই পেতে শিশুশ্রেণীর বাচ্চারা স্বরে অ স্বরে আ বলে বেদম চ্যাঁচাত। খুঁটিতে হেলান দিয়ে পিঁড়ির ওপরে বসে নিসিং পণ্ডিত নিমডালের ছিপটি তুলে বলতেন, আরো জোরে। আরো জোরে। আমরা প্রাণপণে চেঁচিয়ে পড়া মুখস্ত করতুম। তারপর এসে পড়তেন গিজাংবাবু। লম্বা ঢ্যাঙা গড়নের মানুষ। খালি গায়ে ছেঁড়াছেঁড়া নোংরা একটা পৈতে পেঁচানো থাকত। মাথার পেছনে খাড়া এক টিকি। গলায় তুলসীকাঠের মালা। পায়ে খড়ম আর হাতে হুঁকো। একটু তফাতে বসে ভুড়-ভুড় শব্দে হুঁকো টানতেন। তামাকের গন্ধটা ছিল ভারি মিঠে।

ঘরের ভেতর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছেলেরা পড়ত। খুব সম্ভ্রমের চোখে ভিতরটা দেখে ভাবতুম, কবে ঘরে ঢোকার দিন আসবে আমার? নিসিং পণ্ডিত সেই উঁচু শ্রেণীর ছাত্রদের পড়াতে ঘরে ঢুকলে তাঁর দাদা গিজাংবাবু দাওয়ার

শিশুশ্রেণীর দিকে মুচকি হেসে তাকাতেন। তারপর বলতেন, ও কী পড়ছিস্ রে? ওটা কি পড়া হচ্ছে? নে পড়।

"স্বরে অ স্বরে আ
বাড়ি গিয়ে মুড়ি খা
হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ
আমি হুঁকো খাচ্ছি
হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঊ
এর নাম তামাকু..."

ঘর থেকে নিসিং পণ্ডিত শুনতে পেয়ে বলতেন, আবার তুমি গণ্ডগোল বাধাচ্ছ দাদা? ওদের পড়তে দাও তো।

রাগ করে গিজাংবাবু উঠে যেতেন। একটু তফাতে শিবমন্দিরের বটতলায় গিয়ে বসতেন। পাঠশালার চারপাশটা ছিল ভারি নিরিবিলি। নিমগাছের জঙ্গল, আমবাগান, একটা পুকুর—তার পাড়ে এক জরাজীর্ণ মন্দির। মন্দিরের পাশ দিয়ে একফালি রাস্তা ধরে আমি একা বাড়ি ফিরে যেতুম। কারণ ওটাই ছিল আমার শর্টকাট রাস্তা। ফেরার সময় মন্দিরের কাছে কোন কোনদিন দেখা হয়ে যেত গিজাংবাবুর সঙ্গে। লোকটিকে আমার ভালই লাগত। ফিক করে হেসে বলতেন, কী খোকা? কোন শ্রেণীতে পড়ো?

বলতুম ছিছু ছেনি (অর্থাৎ শিশুশ্রেণী)

অমনি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়তেন গিজাংবাবু। হুঁকোর জলও গড়িয়ে পড়ত। সামলে নিয়ে বলতেন, ছিছু ছেনি। অ খোকা, বাড়ি গিয়ে মায়ের কোলে বসে দুধুভাতু খাও গে।

একদিন ফেরার সময় গম্ভীর মুখে বললনে, অ খোকা! নিসিং শটকে শেখায় না? শটকে?

শটকে মানে শতকিয়া—এক থেকে একশো পর্যন্ত মুখস্থ করা। বললুম—আজ্ঞে হ্যাঁ।

কৈ, বলো শুনি।

অ্যাকে চন্দ, দুয়ে পক্ষ। তিনে নেত্ত..

গিজাংবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, থাক্, থাক্। এই শটকে পড়াচ্ছে বুঝি নিসিং? শোন এমনি করে শটকে পড়বে।

'অ্যাকে চাঁদ মামা/রাতে দ্যায় আলো
দুয়ে দুই পক্ষ/ রঙ সাদা কালো
তিনে তিন চোখো/শিব জটাধারী
চারে চার বেদ/জানে সর্পহারী
পাঁচে পঞ্চবান/বড় ভয়ংকর
ছয়ে ষড় ঋতু/শোভে মনোহর
সাতে সিন্ধু সপ্ত/আটে বসু অষ্ট
নয়ে গ্রহ নব/কুদৃষ্টিতে কষ্ট
দশে দশ দিক/করহ মুখস্থ

বাড়ি যাই দাদা/সূর্য গেল অস্ত......'

এখন বুঝতে পারি, গিজাংবাবুর পদ্য রচনার ক্ষমতা ছিল। অতটুকুন বয়সে তাঁর ছড়ার সুরে এসব আওড়ানো শুনে ভক্তি জাগত। কোনদিন ডেকে বলতেন, অ খোকা! পণ্ডিত তোমায় আকার পড়েয়েছে তো? বলো দিকি কাক বানান কি?

বানান শুনে হেসে বলতেন

"কাক থাকে গাছে
জলে থাকে মাছ
বনে থাকে বাঘ
মনে থাকে রাগ...'

পাঠশালার ছুটির ঘণ্টা নিসিং পণ্ডিত নিজেই বাজাতেন। ওটা নাকি পোড়ো শিবমন্দিরেই পুজোর ঘণ্টা। চৈত্রের সংক্রান্তিতে মন্দিরে পুজো হত—বছরে ওই একটা দিনের ঘণ্টা। সেদিন ঘণ্টাটার দরকার হত মন্দিরে। নিসিং পণ্ডিত নিজেই পূজারী। তাই ঘণ্টাটা তাঁর কাছেই থাকত সারা বছর!

গ্রাষ্মের ছুটির পরে একদিন হঠাৎ নিসিং পণ্ডিতের ঘণ্টাটা গেল চুরি। মনমরা হয়ে পণ্ডিতমশাই মুখেই ছুটি ঘোষণা করলেন। কিন্তু সেই পাঠশালা থেকে ছেলেরা হইহই করে বেরিয়েছে, ওমনি পুকুরপাড়ে জঙ্গলের ভেতর মন্দিরের ওখানে কোথাও ঘণ্টার শব্দ শোন গেল, ঢঙ, ঢঙ, ঢঙ!

নিসিং পণ্ডিত লাফিয়ে চেঁচালেন, ধর, ধর। পাকড়ো। তারপর মন্দিরের দিকে দৌড়তে শুরু করলেন। পাঠশালার সর্দার পোড়ো ছিলো বাবুল নামে একটা ছেলে—সে বয়সেও সব ছেলের বড়। তাকে পণ্ডিতমশায়ের পেছন পেছন ছুটতে দেখে আমারও দৌড়লুম।

মন্দিরের ওখানে গিয়ে পণ্ডিতমশাই বললেন, খোঁজ, খুঁজে দ্যাখ! এখানে কোথাও লুকিয়ে আছে।

আমরা সবাই সারা জঙ্গল তন্ন তন্ন খুঁজে ঘণ্টা চোর বা ঘণ্টার পাত্তা পেলুম না। শেষে হতাশ মুখে নিসিং পণ্ডিত বললেন, যাক্ গে। ওটা আর পাওয়া যাবে না। বরাবর ঘণ্টাটার ওপর লোভ ছিল যে। কথায় বলে, স্বভাব যায় না মলে।

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে আমরা মুখ তাকাতাকি করছিলুম। সর্দার পোড়ো বাবুল ধমক দিয়ে বলল, শিগগির বাড়ি চলে যা বলছি। আর এখানে থাকে না...

সেদিনও ব্যাপারটা বুঝতে পারি নি। পরদিন কানাকানিতে টের পেলুম, গিজাংবাবুই নাকি ঘণ্টাটা চুরি করে পালিয়েছেন। তাই আর তাঁকে গ্রীষ্মের ছুটির পর থেকে পাঠশালার আনাচে-কানাচেও দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু মন্দিরের কাছ দিয়ে আসতে-যেতে তামাকের গন্ধ পাই, তাও তো সত্যি। নিশ্চয় তাহলে জঙ্গলে লুকিয়ে তামাক খান গিজাংবাবু।

তারপর প্রতিদিন বিকেলে বেশ মজার কাণ্ড শুরু হল। তখনও ছুটির সময় হয়নি—পড়াশুনো খুব জমে উঠেছে, হঠাৎ কোথাও ঘণ্টাটা বেজে ওঠে ঢঙ ঢঙ করে। অমনি অভ্যাসে পাঠশালা থেকে ছেলেরা হইহই করে বেরিয়ে পড়ে। নিসিং পণ্ডিত আর বাবুল ছিপটি তুলে সবাইকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। কান ধরে

সবাইকে বাকি সময়টা দাঁড়িয়ে শটকে আওড়াতে হয়।

প্রতিদিন এই কাণ্ড। বিকেল চারটে বাজলে ছুটির সময়। নিসিং পণ্ডিত পকেট ঘড়ি বের করে আধঘণ্টা আগে সবাইকে সতর্ক করে দেন—খর্বদার! সব দু'কানে আঙুল গুঁজে পড়া মুখস্থ করো। তাই শুনে আমরা সবাই দু'কানে আঙুল ঢুকিয়ে রাখি।

কিন্তু ঘণ্টাটা ঠিকই বাজে। অনেকক্ষণ ধরে বেজে তারপর থেমে যায়—যেন হতাশভাবে।

দিনকতক পরে মন্দিরের পথে বিকেলে বাড়ি ফিরছি একা। হঠাৎ দেখি, মন্দিরের একপাশে বসে আছেন গিজাংবাবু! হুঁকো টানছেন। পাশে ঘণ্টাটা রাখা আছে। মুখটা গম্ভীর।

চলে আসব কিংবা ফিরে গিয়ে পণ্ডিতমশাইকে খোঁজ দেব—তাই ভাবছি! তখন একটু হেসে বললেন, কী খোকা? কেমন পড়াশুনো চলছে? কী বানান পড়াচ্ছে নিসিং?

বললুম, দীর্ঘ উকার।

হুঁকো নামিয়ে রেখে গিজাংবাবু বলল হুং, কৈ বলো দিকি, ভূত বানান কী?

ভয়ে দীর্ঘ উকার ত ভূত।

কী বললে? ভয়ে দীর্ঘ উকার! হুঁ—ভয়েই বটে। ভয়ের সঙ্গে ভূতের সম্পর্ক আছে যে। তা অ খোকা, ভূত কখনও দেখেছ?

বিকেল পড়ে এসেছে। গাছপালার ভেতর পুরনো মন্দির। ছায়া ছম ছম করে। একটু ভাল হল। বললুম, আজ্ঞে না।

ভয়ে দীর্ঘ উকার আছে বটে, ভূতকে ভয় পাবার কিছু নেই। গিজাংবাবু মিটি মিটি হেসে বললেন, ভূত মানুষের মতোই দেখতে। হুঁকোও খায়। কথায় বলে না। অভ্যাস যায় না মলে। আমার অভ্যাস যায়নি। হুঁকো এখনও খাই। আর এই ঘণ্টাটার ওপর বড্ড লোভ ছিল। কেন জানো? নিসিংটার কাণ্ড দেখে। একদল বাচ্চা ছেলেকে সারাদিন খোঁয়াড়ে আটকে রাখে। এ কি তাদের ভালো লাগে? তাই ইচ্ছে করত, ঘণ্টাটা পেলে আমি ঢঙ ঢঙ করে ছুটি বাজিয়ে দিতুম।

আমি কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলুম।

গিজাংবাবু হাই তুলে বললেন, বাড়ি যাও খোকা। আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। তারপর আমাকে আরও অবাক করে পেছনে বটগাছটার গিয়ে উঠলেন। ঘণ্টার দড়িটা কোমরে গোঁজা, হাতে হুঁকো! তারপর উঁচু ডালে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজলেন। তারপর নাক ডাকতে বসলেন।

পণ্ডিতমশায়ের দাদার এরকম করে গাছে চড়ে ঘুমোনটা আমার ভাল মনে হল না। ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলুম।

পরদিন পাঠশালায় গিয়ে নিসিং পণ্ডিতকে বলে ফেললুম, ওঁর দাদার কথা। ভাবলুম ঘণ্টাটা উদ্ধারের সূত্র পেয়ে উনি আমাকে পড়া বলতে না পাড়ার শাস্তিটা কমিয়ে দেবেন।

কিন্তু শোনামাত্র খাপ্পা হয়ে নিসিং পণ্ডিত গর্জালেন, কান ধর! কান ধরে দাঁড়া

হতচ্ছাড়া! অ বাবুল। এই বয়সেই কী জলজ্যান্ত মিথ্যে বলতে শিখেছে শুনছিস্!

বাবুল ভেতর থেকে গম্ভীর স্বরে বলল, দুঘা ছিপটি। আমি আঁতকে উঠে কেঁদে ফেললুম। বললুম, না পণ্ডিতমশাই। কাল বিকেলে আপনার দাদা...

মাটিতে ছিপটি ঠুকে নিসিং পণ্ডিত বললেন, চোপরাও! দাদা একমাস আগে সান্নিপাতিক জ্বরে ভুগে মারা গেছে! তাকে গঙ্গার ধারে দাহ্ করে এসেছি। আর বাঁদর বলে কি না, তাকে মন্দিরে বসে হুঁকো খেতে দেখেছে! অ বাবুল, এই মিথ্যুকটা বড় হয়ে কী হবে বল্ দিকি?

বাবুল ভেতর থেকে বলল, তিন ঘা ছিপটি।

যাই হোক, আমার মন্দিরের পথে শর্টকাট করে পাঠশালা যাতায়াত সেই শেষ। তবে মাঝে মাঝে পড়া মুখস্থ করতে করতে হঠাৎ তামাকের ভুরভুরে মিঠে গন্ধটা ভেসে আসত মন্দিরের দিক থেকে। আর যেন অবেলায় ঘণ্টাটাও চাপা সুরে ঢঙ ঢঙ করে বাজত। আশ্চর্য ব্যাপার, আমি ছাড়া আর কেউ এসব টের পেত না।

কিন্তু ঘণ্টাটা শেষ পর্যন্ত নিসিং পণ্ডিত ফেরত পেয়েছিলেন। শুনেছি, গয়ায় পিণ্ডি দিয়ে আসার পর একদিন মন্দিরে গিয়ে ঘণ্টাটা কুড়িয়ে পান। শিবলিঙ্গের পিছনে লুকানো ছিল। এবং হুঁকোটাও।

কারণ পিণ্ডি পেয়ে মানুষের আত্মা উদ্ধার হয় যায় বটে, কাঁসর ঘণ্টা আর হুঁকোর যে আত্মা নেই। তাই তাদের পৃথিবীতে পড়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

হাতি পোষা কি সহজ কথা?

এক ছিল বোকারাম, আর ছিল বুদ্ধুরাম। দুজনে ভারি বন্ধুতা। এক সঙ্গে খায়দায়। এক সঙ্গে থাকে। এক সঙ্গে ঘোরে।

একদিন হলো কী, দুজনে নদীর ধারে বেড়াতে বেরিয়েছে। সেখানের চরে চাষীরা তরমুজ ফলিয়েছে। বোকারাম আর বুদ্ধুরাম তরমুজ দেখে ভারি অবাক হয়ে এক চাষীকে জিগ্যেস করল—ওগুলো কী দাদা?

চাষাটি কিন্তু কী কারণে রেগেমেগে বসে ছিল চুপচাপ। কথাটা কানেই নিলো না। ফের জিগ্যেস করলে। এবার সে বিরক্ত হয়ে বলল—ঘোড়ার ডিম!

দুই বন্ধুতে একেবারে হাঁ। আরে তাই বলো! ভাবি, এত সব ঘোড়া আসে কোত্থেকে! তাহলে এখান থেকেই রাজ্যের ঘোড়া ফলে! বাঃ বাঃ! একটা জিনিসের মতো জিনিস দেখা হলো বটে।

কিছুক্ষণ তরমুজগুলো দেখার পর অনেক প্রশংসা করে তারপর তারা হাঁটতে লাগলো। একটু পরেই তাদের সামনে পড়লো কুমড়োর ক্ষেত। বড় বড় কুমড়ো ফলে রয়েছে। সেখানে দুজনে থমকে দাঁড়ালো। এগুলো আবার কী?

অনেকক্ষণ দুজনে মাথা ঘামালো। কিন্তু কিছু ঠিক করতে পারলো না। সামনে কোন লোকও নেই যে জিগ্যেস করে।

হঠাৎ বুদ্ধুরাম লাফিয়ে উঠে বলল—পেয়েছি, পেয়েছি!

বোকারাম বলল—কী কী?

বুদ্ধুরাম গম্ভীর মুখে বলল,—পিছনেরগুলো যদি ঘোড়ার ডিম হয় তো এই বড় জিনিসগুলো নিশ্চয় হাতির ডিম!

বোকারাম খুব খুশি হয়ে বন্ধুর প্রশংসা করলো। তারপর বলল—আমার মাথায় একটা মতলব খেলেছে ভাই। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। এই সুযোগে একটা হাতির ডিম নিয়ে পালাই চলো। হাতির বাচ্চা হলে দুজনেই তাকে লালন পালন করবো। তারপর, বড় হলে বেচে দেবো—তখন দুজনে অনেক টাকার মালিক হবো।

বুদ্ধুরাম তো ভারি খুশি। তাই সই। বিনিপয়সায় এত লাভ!

দুজনে চুপিচুপি একটা কুমড়ো তুলে নিয়ে দৌড়াতে থাকলো। কিছু দূরে যাবার পর নিরাপদ বোধ করে দুজনে একটা গাছের তলায় বিশ্রাম নিতে থাকলো। সেই সময় বোকারাম বলল—দ্যাখ্যো ভাই, হাতিটা বড় হলে বেচে তো দেবো। কিন্তু তার আগে আমার বড় সাধ, আমি ওর পিঠে চেপে বিয়ে করতে যাবো। তখন কিন্তু আপত্তি করতে পারবে না।

বুদ্ধুরাম একটু ভেবে বলল—সেটা কিন্তু ঠিক হবে না ভাই। আমিই তো তোমাকে হাতির ডিম চিনিয়েছি! তুমি তো চিনতে পারোনি। অতএব আগে আমারই হাতির পিঠে চেপে বিয়ে করতে যাওয়া উচিত।

বোকারাম বলল—বারে! আমি তোমার চেয়ে বয়সে বড় না? কাজেই বিয়েটা আমারই করা উচিত আগে। এবং...

বুদ্ধুরাম রেগে বলল—কক্ষনো না।

বোকারামও ক্ষেপে গেল। গর্জে বলল—আলবৎ আমি আগে চাপবো।

বুদ্ধুরাম ঘুষি পাকিয়ে বলল—খবরদার!

এবং দুজনে জোরে মারামারি লেগে গেল। মারামারি করতে করতে যেই না কুমড়োটা কাড়াকাড়ি করতে যাওয়া, অমনি দুম করে পড়ে ফাটাফুটি হয়ে গেল সেটা।

ঠিক সেই সময় গাছতলায় পাতা কুড়িয়ে খাচ্ছিলো একটা মস্তো পাঁঠা। কুমড়োপটাস শুনে সে আচমকা ভয় পেয়ে দৌড় লাগলো। অমনি বোকারাম চেঁচিয়ে উঠলো—হাতির বাচ্চা পালাচ্ছে, হাতির বাচ্চা পালাচ্ছে! বুদ্ধুরামও চেঁচাতে চেঁচাতে পাঁঠার পিছনে দৌড়ালো।

পাঁঠাটা পিছনে দুটো লোককে দৌড়তে দেখে প্রাণভয়ে আরও জোরে ছুটতে লাগলো।

এখন হলো কী, পাঁঠাটা কি না ধর্মরাজের মানতের পাঁঠা। দিয়েছিল গাঁয়ের জমিদার রায়বাবুরা। তাদের দারোয়ান যখন দেখলো যে দুটো লোক মানতের পাঁঠাই ধরবার জন্য দৌড়চ্ছে, সে বেজায় রেগে বোকারাম আর বুদ্ধুরামকে অ্যায়সা পিটুনি লাগালো কহতব্য নয়। তারপর সে দুজনের মাথার চুল ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে গ্রাম থেকে বের করে দিলো। তখন দুই ন্যাড়া আর করে কী, মনের দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে নিজেদের ঘরে ফিরে চলল! হাতি পোষা কি সহজ কথা?

চোরাবালির চোর

ছোটমামার মাথায় বড় বড় চুল। চুল নয়, যেন সজারুর কাঁটা। রকমারি শ্যাম্পু ঘষেও ছোটমামা তাঁর ওই নচ্ছার চুলগুলোকে বাগ মানাতে পারছিলেন না। শেষে বাবা পরামর্শ দিলেন, 'তার চেয়ে ন্যাড়া হচ্ছ না কেন ভায়া?'

ছোটমামা মুখে কিছু না বললেও ভেতরে-ভেতরে রেগে টঁই হয়ে যেতেন। কদিন পরে দেখি, ছোটমামা স্নানের পর একটা শিশি থেকে লাল রঙের একটা তরল পদার্থ ঢেলে চুলে ঘষছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'গন্ধতেল নাকি ছোটমামা?'

ছোটমামা গম্ভীর মুখে বললেন, 'কবরেজী আরক।'

আরক থেকে কেমন যেন একটা বিদ্‌ঘুটে গন্ধ বেরুচ্ছিল। মাথার ঘষার পর ছোটমামা একটা বাঁকাচোরা কাস্তের গড়নের অদ্ভুত চিরুনি বের করে চুল আঁচড়াতে শুরু করলেন। তারপর অবাক হয়ে দেখলাম, ছোটমামার খাড়া চুলগুলো নেতিয়ে মাথায় সেঁটে গেল। ছোটমামা আয়নার দিকে চেয়ে নিজের মাথা দেখতে দেখতে বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'তোর বাবাকে এবার ডাক! ন্যাড়া হতে বলছিলেন না আমায়? হুঁঃ!'

বললাম, 'আরকটা না হয় কবরেজী। এই চিরুনিটা কোথায় পেলেন ছোটমামা? এও কি কবরেজী চিরুনি!'

ছোটমামা খুশিমুখে বললেন, 'নাড়ুবাবু কবরেজকে চিনিস তো? ওই যে মোড়ের মাথায় আয়ুর্বেদ ভবন।'

ছোটমামার চুলের একটা হিল্লে হওয়ায় বাড়ির সবাই খুশি। বাড়িতে অসুখবিসুখ কারও নেই—অথচ একটা লোক সবসময় রোগীর মতো মুখ করুণ করে বেড়াচ্ছে। থেকে থেকে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। এই দেখে কার না খারাপ লাগে? এখন ছোটমামার মুখ আর করুণ নয়। সবসময় হাসিখুশি।

কিন্তু কদিন পরেই ছোটমামার সেই কবরেজী চিরুনিটা হারিয়ে গেল। ড্রয়ার, তাক, আলামারি, বিছানা তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাওয়া গেল না। ছোটমামার মুখের চেহারা আবার করুণ হয়ে গেল। ঠাকুমা বললেন, "এ তাহলে শিঙ্গিদের হুলোবেড়ালের কাজ। ওর জ্বালায় কিছু থাকবার যো নেই। আমার জর্দার কৌটোটা সেদিন নিয়ে পালাচ্ছিল দেখলে না?"

ঠাকুর্দা বললেন, 'হুলোর পক্ষে জর্দা খাওয়া অসম্ভব নয়। গন্ধটা যে মিঠে। তাই বলে চিরুনি কি করবে ব্যাটাচ্ছেলে?'

ঠাকুমা বললেন, 'কেন? হুলোর গায়ের লোমগুলো দেখ নি? নান্টুর চুলে চেয়ে খাড়া।'

মা বললেন, 'উঁহু—বেড়াল নয়, কাক। সেদিন সাবানকৌটো নিয়ে পালিয়েছিল। আম গাছের ডগায় ওর বাসা থেকে খোকাকে দিয়ে পেড়ে আনালাম। তাই না রে খোকা?'

খোকা, মানে আমি, সায় দিয়ে বললাম, 'কাকেরা কি সাবান মাখে মা?'

মা বললেন, 'কিছু বলা যায় না।'

আমি বললাম, 'তাহলে কাকটা বেজায় বোকা। কৌটোয় তো সাবান ছিল না!'

এইসব আলোচনা চলছে, ছোটমামা গম্ভীর মুখে শুনছেন! হঠাৎ আমাকে বললেন, 'আমার সঙ্গে একবার আয় তো পুটু।'—বলেই আমার হাত ধরে টেনে বাইরে নিয়ে গেলেন।

ছোটমামার কথার অবাধ্য হওয়া কঠিন আমার পক্ষে, পুটু নামটা যতই অপছন্দ হোক না কেন। রাস্তায় যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কবরেজ মশায়ের কাছে যাবেন তো ছোটমামা?

ছোটমামা বললেন, 'গিয়েছিলাম তো। নাড়ু কবরেজ বললেন, ওই একখানাই ছিল। আর পাওয়া যাবে না। এ তো যে-সে চিরুনি নয়। কামরূপকামাক্ষায় পাহাড়ীজঙ্গলে যে ডাকিনীরা থাকে, তাদের চিরুনি। বুঝলি পুটু? ডাকিনীদের চুল তো সহজ চুল নয়। খেজুর-কাঁটা দেখেছিস? সেই রকম।

কথা বলতে বলতে ছোটমামা খেলার মাঠের দিকে ঘুরলেন। আমি বললাম, 'মামা এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?'

ছোটমামা চাপা গলায় বললেন, 'আমার চিরুনি কে চুরি করেছে, বুঝতে পেরেছি। তাকে হাতে নাতে ধরব, আয়।'

আমার বুক টিপটিপ করল। বললাম, 'ও ছোটমামা, তার চেয়ে থানায় গেলেই তো ভাল হত।'

ছোটমামা থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তা মন্দ বলিস নি। ব্যাটাচ্ছেলে যদি ছুরিটুরি বের করে, বিপদ হবে। চল্ বরং থানাতেই যাই।'

থানার দিকে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্তু চোরটা কে ছোটমামা? কোথায় থাকে?'

ছোটমামা বললেন, 'কোথায় থাকে তা কি জানি? ঐ নদীর ধারে ওকে প্রায়ই ঘুরে বেড়াতে দেখি।'

'কেমন করে জানলেন, সে আপনার চিরুনি চুরি করেছে?'

আমার কথায় ছোটমামা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তোর খালি প্রশ্ন করা অভ্যেস। কেমন করে জানলেন? লোকটার মাথায় যে আমার মতো চুল—বরং আমার চেয়ে আরও খোঁচা-খোঁচা। যেন পেরেক।'

বুঝলাম, তাহলে ছোটমামা ঠিকই ধরেছেন।

আমাদের এই ছোট্ট শহরে বংকুবাবু দারোগার খুব নামডাক। বিশেষ করে আমার বাবার সঙ্গে ওঁর বন্ধুতা আছে। ছেলেবেলায় নাকি বাবার ক্লাসফ্রেন্ড ছিলেন। সেই খাতিরে মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতেও আসেন। সব শুনে কিছুক্ষণ চোখ বুজে ভাবলেন। তারপর বললেন, 'হুম! কেমন চেহারা বললেন যেন? রোগা ঢ্যাঙা, পরনে হাফপ্যান্ট, গায়ে ছেঁড়া গেঞ্জি, মাথার চুল পেরেকের মতো?'

ছোটমামা বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'নদীর ধারে ঘুরে বেড়ায়?'

'আজ্ঞে।'

'রোজ সন্ধ্যার একটু আগে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

বংকুদারোগা দুলতে দুলতে বললেন, 'হুম বুঝেছি। চোরাবালির গোবিন্দ।'

ছোটমামা অবাক হয়ে বললেন, 'চোরাবালি মানে?'

মিটিমিটি হেসে বংকুদারোগা বললেন, 'এই চোরের সঙ্গে চোরাবালির সম্পর্ক আছে—খুব গূঢ় সম্পর্ক। আপনি ভাববেন না। দেখছি ব্যাটাচ্ছেলেকে। তবে কী জানেন? বড্ড ফিচেল।'

ছোটমামা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বললেন, 'দয়া করে একটু বুঝিয়ে বলবেন স্যার?'

বংকুদারোগা বললেন, 'বুঝলেন না? ওই নদীতে একজায়গায় চোরাবালি আছেন জানেন না?'

এবার আমি বললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও ছোটমামা, সেই যে অনেকটা জায়গা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা আছে—লেখা আছে ঃ সাবধান। আর...'

ছোটোমামা নড়ে বসলেন। 'আর একটা মড়ার খুলি আঁকা নোটিশ ঝোলানো আছে। দেখেছি বটে।'

বংকুদারোগা বললেন, 'গোবিন্দ আমার তাড়া খেয়ে কিছুদিন শ্মশানবটের কোটরে লুকিয়ে থাকত। টের পেয়ে হানা দিলাম। কি ধুরন্ধর চোর মশাই! মড়া সেজে একটা খাটিয়ার তালাই জড়িয়ে শুয়েছিল। এদিকে আসল মড়াটাকে খাটিয়ার তলায় লুকিয়ে রেখেছে। যারা মড়া পোড়াতে এসেছে, তারা বটতলায় এসে মুড়ি খাচ্ছে, লক্ষ্যও করে নি। রাতটাও ছিল যে অমাবস্যা।'

বংকুদারোগা একটিপ নস্য নিয়ে ফের বললেন, 'মোড়া পোড়াতে গিয়ে ধরা পড়ল ব্যাপারটা। গোবিন্দ তখন দৌড়ুচ্ছে। অন্ধকারে দৌড়ুতে দৌড়ুতে পড়েছে একেবারে চোরাবালির ওপর। তখন ওখানে কাঁটাতারের বেড়া ছিল না। শুধু একটা নোটিশ লটকানো ছিল।'

ছোটমামা বললেন, 'সর্বনাশ! চোরাবালিতে পড়ে তো তলিয়ে যাওয়ার কথা।'

'হুঁ-উ, তলিয়ে গেল বৈকি গোবিন্দচোর।'

আমি বললাম, 'তারপর কে টেনে তুলল ওকে?'

বংকুবাবু হাসলেন। 'তুলবে কী করে? আমি যখন পৌঁছলাম, তখন বালিতে তার মুণ্ডুটা দেখা যাচ্ছে। টর্চ জ্বেলে রেখেছিলাম। এক মিনিটের মধ্যে মুণ্ডুটাও তালিয়ে গেল। তারপর যেমন বালি, তেমনি। বোঝবার উপায় নেই।'

ছোটমামা অবাক হয়ে বললেন, 'তাহলে তো গোবিন্দ বেঁচে নেই।'

'নেই। আবার আছেও।' বংকুদারোগা গম্ভীর হয়ে বললেন। 'কথায় বলে না? অভ্যেস যায় না মলে। আমার মুশকিল কি হয়েছে জানেন নান্টুবাবু? তাড়া করলেই ব্যাটাচ্ছেলে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে ঝাঁপ দেয়। চোরাবালির ভেতর আড্ডা এখন। ওর খুব নির্ভরযোগ্য আশ্রয়। এখন ওকে ধরাই কঠিন। তবে যদি ওকে মাঝপথে পাকড়াও করতে পারা যায়। তাহলেই সুবিধে হয়। দেখা যাক, আপনি ভাববেন

না।'...

থানা থেকে ফেরার পথে ছোটমামা বললেন, 'তুই বংকুদারোগার কথা বিশ্বাস করলি পুটু? আসলে আজকাল পুলিশই এরকম। মনবোঝানো দুটো কথা বলে বিদায় করতে পারলে বেঁচে যায়। তাদের এই বংকুদারোগা দেখছি, আরও এককাঠি সরেস। গুলতাপ্পির রাজা। মানুষ মরে ভূত হতেই পারে। তাই বলে চোর মরেও কি চোর থেকে যায় কখনও? ভূত ঘাড় মটকাতে পারে বটে, চুরি করতে যাবে কোন্ দুঃখে?'

বললাম, 'কেন ছোটমামা? ভূতের মাথায় পেরেকের মতো চুল থাকলে...'

ছোটমামা খাপ্পা হয়ে বললেন, 'থাম তো। আজ ওবেলায় আমি নিজেই চিরুনিচোরকে হাতেনাতে ধরে ফেলব। সেজন্যই তো নদীর ধারে ওৎ পাততে যাচ্ছিলাম। খামোকা তোর কথায় থানায় গেলাম।'

বেলা পড়ে এলে ছোটোমামা আমাকে নিয়ে বেরুলেন আবার। ছোটমামা প্যান্টের পকেটে একটা দড়ি নিয়েছেন। আর আমাকে দিয়েছেন একটা কাগজ কাটা ছুরি। নদীর ধারে শ্মশানবটের কাছে গিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'আমি ওকে ধরে ফেলব, আর তুই ছুরি বের করে চেঁচিয়ে বলবি, একটু নড়লেই পেট ফাঁসিয়ে দেব—সাবধান!'

এই বলে আমাকে রিহার্সাল দিইয়ে ছাড়লেন। 'বলতো শুনি, কেমন করে চোখ কটমটিয়ে বলবি?'

অগত্যা ছোটমামার জেদে আমাকে ছুরি বাগিয়ে চিক্কুর ছেড়ে বলতে হল, একটু নড়েছ কি পেট ফাঁসিয়ে দেব—সাবধান!'

'উঁহু—সাবধানটা হবে আরও জোরে। এমনি করে।' —বলে ছোটমামা বিকট গর্জালেন, 'সা—ব—ধা—ন।'

বারকতক বলার পর উনি খুশি হলেন। 'হুঁ—ঠিক হয়েছে। বুঝলি পুটু? ভালয়-ভালয় যদি কাজটা করে ফেলতে পারি, তোকে এক প্যাকেট লজেন্স দেব।

শ্মশানবটের এদিকটা নিঃঝুম। শ্মশানে আজ কেউ মড়া পোড়াতে আসে নি। নদীতে ধু-ধু চড়া পড়েছে। দেখতে দেখতে সূর্য ডুবে গেল। আলো কমে এল। সেই সময় ছোটমামা হঠাৎ আমাকে খামচে দিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, 'চলে আয়! ওই দ্যাখ্, ব্যাটাচ্ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।'

চমকে উঠে দেখি, নদীর বালিতে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমরা ঝোপঝাড়ের আড়ালে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলাম। পাড়ের নিচে একফালি জল তিরতির করে বয়ে হচ্ছে। তার ওধারে বালির চড়া ওপার অবধি ছড়িয়ে রয়েছে। কাছাকাছি পৌঁছে দেখলাম, আরে! লোকটা ছোটমামার সেই চিরুনিটা দিয়ে সত্যি সত্যি চুল আঁচড়াচ্ছ যে!

ছোটমামা দড়ি বের করে 'চলে আয়' বলেই নিচে ঝাঁপ দিলেন। আমিও ওঁকে অনুসরণ করলাম। জলটুকু পেরিয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'একপা নড়ছে কি মরেছ, সা—ব—ধা—না!'

ছোটমামা ফুঁসে উঠে বললেন, 'ভ্যাট্! দিলে সব ভেস্তে। এখন নয়, এখন নয়।'

গোবিন্দ কিংবা যেই হোক, সে ঘুরে আমাদের দেখল। তারপর দৌড়ুতে শুরু

করল। ছোটমামা 'তবে রে ব্যাটা চোর, যাবি কোথায়'—বলে দৌড়ুলেন তার পেছনে। আমিও।

তখনও দিনের আলো আছে, তবে খানিকটা আবছা হয়ে গেছে। কালো মূর্তিটাকে ছোটমামা প্রায় ধরে ফেলেন এমন অবস্থা। তারপর হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন। সামনে সেই কাঁটাতারের বেড়া। একটা সাইনবোর্ড লটকানো আছে। তাতে একটা মড়ার খুলি।

হতভম্ব হয়ে দেখলাম, লোকটা বেড়া ডিঙিয়ে ভেতরে চলে গেল। তারপর ধীরসুস্থে বালিতে তলিয়ে যেতে থাকল। কালো মুখের সাদা দাঁতে সে নিঃশব্দে হাসছে দেখে ছোটমামা ভেংচি কেটে বললেন লজ্জা করে না হাসতে ব্যাটাচ্ছেলে চোর কোথাকার? ভাল চাও তো চিরুনিটা দাও বলছি!' ছোটমামা আমার হাত থেকে ছুড়িটা কেড়ে নিয়ে চ্যাঁচামেচি করে বললেন, 'ছুরি ছুঁড়ব বলে দিচ্ছি! চিরুনি দাও আমার। দেবে না? তবে রে! ওয়ান—টু—থ্রি।'

গোবিন্দচোর চেঁচিয়ে উঠল, 'এই! মরে যাব মাইরি! ছুঁড়ো না, ছুঁড়ো না!' তখন তার বুক পর্যন্ত ডুবে গেছে বালিতে।

ছোটমামা বললেন, 'চিরুনি ফেরত দাও! এগেন, ওয়ান—টু—থ্রি!'

গোবিন্দচোর 'হাত্তেরি' বলে চিরুনি ছুঁড়ে দিল। সেটা ঘ্যাস করে ছোটমামার পায়ের সামনে বালিতে বিঁধে গেল কাস্তের মতো। চিরুনিটা তুলে ছোটমামা সম্ভবত শাসাতে যাচ্ছিলেন, তখন গোবিন্দের মুণ্ডুটাও তলিয়ে গেল।

আমি বেজায় ভয় পেয়ে গেলাম। 'ও ছোটমামা! আর এখানে নয়। বড্ড ভয় করছে যে!'

ছোটমামা বললেন, 'ভয় তো আমারও করছে। দাঁড়া, আগে চুলগুলো ঠিক করে নি. তারপর যাচ্ছি।'...

কেকরাডিহির বৃত্তান্ত

ট্রেন যদি প্রচণ্ড লেট করে রাতদুপুরে কোন নিঝুম ছোট্ট স্টেশনে পৌঁছয় এবং সেই স্টেশনের নাম হয় যদি কেকরাডিহি, তাহলে কী অবস্থা দাঁড়ায় সেটা হয়ত ব্যাখ্যা করে বলার দরকার হয় না। তক্ষুনি সব বৃত্তান্ত আঁচ করা চলে।

কেকরাডিহিতে আমার এক পিসতুতো দাদা সেচ দফতরের ইঞ্জিনিয়র। কাজেই তাঁর একটি সরকারি জিপগাড়িও আছে। কিন্তু আগে থেকে খবর দিয়ে কোথাও যাওয়া আমার অভ্যাসে নেই। পুজোর ছুটিতে কোথাও যাওয়া যায় ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কেকরাডিহির কথা মনে পড়েছিল এবং তক্ষুনি বেরিয়ে পড়েছিলুম কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে। ভেবেছিলুম, হঠাৎ গিয়ে পড়ে গেনুদাকে চমকে দেব।

কিন্তু উল্টে আমি নিজেই ভীষণ চমকে গেলুম, যখন স্টেশনমাস্টার বললেন, কেকরাডিহি এই স্টেশনের নাম বটে, তবে লোকালিটি এখান থেকে কমপক্ষে মাইল তিনেক দূরে।

স্টেশনমাস্টার মুচকি হেসে আরও বললেন, দিব্যি তো জ্যোৎস্না ফুটে আছে।

তাকিয়ে দেখুন না চারপাশে, কোথায় আছেন। একেবারে নির্বাসনে।
চারদিকে আর কোনও বাড়িঘর নেই। জ্যোৎস্নায় কাছে ও দূরে কয়েকটা তালগাছ কালো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলুম বিশাল এক মাঠের মাঝখানে এই স্টেশন।
বললুম, তাহলে তো ভারি বিপদে পড়া গেল।
তা বলতে পারেন বটে! স্টেশনমাস্টার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, বিপদ আপনার যেমন, তেমনি আমার কম নয়।
অবাক হয়ে বললুম আপনার কী বিপদ?
স্টেশনমাস্টার একচোখো রেললণ্ঠনের দম একটু বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, বিপদ বৈকি। কোয়ার্টারে গিয়ে যে শুয়ে পড়ব, তার উপায় নেই। জ্বালিয়ে মারবে। তাই স্টেশনেই রাত কাটাতে হয় আমাকে।
—জ্বালিয়ে মারবে? কে?
এত কথা আপনার কাজ কী মশাই?—বলে স্টেশনমাস্টার স্টেশনঘরে ঢুকে গেলেন।
তারপর ভেতর থেকে দরজা আটকে দিলেন। এগিয়ে গিয়ে বললুম, শুনুন শুনুন।
ভেতর থেকে বিরক্ত স্টেশনমাস্টার বললেন, শোনাশুনির সময় নেই মশাই! এক্ষুণ ওরা এসে পড়বে! ঘুমোতে দেবেন না! স্টেশনে থেকেও তো রেহাই নেই।
এতক্ষণে একজন খালাসি বা পয়েন্টসম্যান যেই হোক, খুকখুক করে কাশতে কাশতে স্টেশন ঘরের বারান্দায় এল। তার হাতেও একটা রেললণ্ঠন। লণ্ঠনটার দম কমিয়ে বারন্দায় একটা সিন্দুকের ওপর পা ছড়িয়ে সে শুয়ে পড়ল।
স্টেশনমাস্টারের ব্যাপার-স্যাপার দেখে ভড়কে গিয়েছিলুম! লোকটাকে ডাকলুম, এই যে দাদা, শুনছেন?
তার নাম ডাকা শুরু হয়ে গেল। কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। কেকরাডিহি স্টেশনে দেখছি সবই অদ্ভুত।
কিন্তু তার চেয়ে বিরক্তিকর মশা। মশার কামড়ে অস্থির হয়ে প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ালুম। সেখানেও ঝাঁকে ঝাঁকে মশা আমাকে ছিঁড়ে খেতে থাকল। তখন মরিয়া হয়ে ঠিক করলুম, তিন মাইল রাস্তা হেঁটে কেকরাডিহি চলে যাব। জ্যোৎস্নার রাতে হাঁটতে অসুবিধে হবে না।
স্টেশনের নিচের চত্বর পেরিয়ে নিচের রাস্তা পাওয়া গেল। তারপর দেখি একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমার সাড়া পেয়ে সে ঘুরে বলল, কী?
বললুম, আমি কলকাতা থেকে আসছি। কেকরাডিহিতে আমার পিসতুতো দাদা ইরিগেশান ইঞ্জিনিয়র। ট্রেন লেট করে পৌঁছে বড্ড বিপদে পড়ে গেছি। তাই—
লোকটি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, বুঝেছি। আমারও একই অবস্থা। আমিও কলকাতা থেকে আসছি।
খুব খুশি হয়ে বললুম তাহলে চলুন না; দুজনে গল্প করতে করতে হাঁটি।
হাঁটবার দরকারটা কী?—লোকটা ঘড়ঘড় করে অদ্ভুত হাসল। একটু অপেক্ষা করুন না। এক্ষুনি আব্দুলের রিকশো এসে যাবে।
আরও খুশি হয়ে বললুম বাঃ! তাহলে তো ভালই।

—হ্যাঁ, ভালো। তবে একটু-আধটু মন্দও বলতে পারেন।
—কেন বলুন তো?
—আব্দুল তার রিকশোয় মড়া বয়ে শ্মশানে পৌঁছে দেয়।
—তাতে কী? আমরা তো মড়ার সঙ্গে এক রিকশোয় যাচ্ছি নে!
কিছু বলা যায় না। লোকটি চাপাস্বরে বলে উঠল, এই যে আপনিও আব্দুলের রিকশোয় যাবেন—আপনি মড়া নন, তার গ্যারান্টি দিচ্ছে কে?
লোকটি তো বেজায় রসিক। হাসতে হাসতে বললুম, সে গ্যারান্টি আমি দিতে পারি। আমি একেবারে জ্যান্ত মানুষ। জ্যালজ্যান্ত বলতে পারেন।
আমার গ্যারান্টি আমি কিন্তু দিতে পারছি না, মশাই!
তার মানে আপনি মড়া? হেসে অস্থির হয়ে বললুম, মড়া কখনও কথা বলে? মড়া কি এমনি দাঁড়িয়ে রিকশোর জন্য অপেক্ষা করে?
লোকটি গম্ভীর স্বরেই বলল, কেকরাডিহিতে মড়ারাও জ্যান্ত মানুষের মত। ফারাক নেই। একটু আগে আব্দুল একটা মড়া শ্মশানে নিয়ে গেল। মড়াটা আমাকে দেখে বলে গেল, ভাল তো দাদা? তাহলেই বুঝুন।
লোকটি সত্যিই তুখোড় রসিক। নিজে একটু হাসছে না। অথচ এমন সব কথা বলছে, যা শুনে না হেসে পারা যায় না। বললুম, একটু আগে স্টেশনমাস্টারের সঙ্গে আলাপ হল। ভদ্রলোক বলছিলেন, কোয়ার্টারে রাতবিরেতে শুতে গেলে কারা নাকি জ্বালায়। মড়ারাই জ্যান্ত মানুষের মত ওঁর পেছনে লাগে তাহলে।
ঠিক ধরেছেন। স্টেশনের ওপাশেই তো শ্মশান। লোকটা ফোঁস করে শ্বাস ছেড়ে বলল ফের, যাকগে। আব্দুল এতক্ষণে আসছে! বাঁচা গেল!
জ্যোৎস্নায় কালো হয়ে একটা সাইকেল রিকশা এগিয়ে আসছিল। কোন আলো নেই। একবার চাপা ভেঁপু বাজল শুধু। কাছাকাছি এলে লোকটি বলল, আয় ভাই আব্দুল! এই দ্যাখ, আরেকজন প্যাসেঞ্জার পেয়ে গেলি কেমন। তোর পুষিয়ে যাবে এবারে।
আব্দুল রিকশো থামিয়ে আমার উদ্দেশে বলল,পাঁচ টাকা লাগবে বাবু।
রাজি হয়ে গেলুম। দুজনে রিকশোয় উঠে বসলে আব্দুল প্যাডেলে চাপ দিল। রিকশোর চাকা গড়াতে থাকল। আমার সঙ্গী বলল, মড়াটা কাদের রে আব্দুল?
আব্দুল বলল, রায়পুরের পাঁচুর। আন্ত্রিক হয়েছিল! ওদিকে আন্ত্রিকের যা অবস্থা, রোজ একটা দুটো করে যাচ্ছে, মুকুজ্জেমশাই!
আমার সঙ্গী তাহলে এক মুখুজ্জেমশাই! বেশ রসিক মানুষ বটে। খি খি করে হেসে বললেন, তুইও তো গিয়েছিলি বাবা!
আজ্ঞে—আব্দুল রিকশোওলা সায় দিল। তা আপনার কী অবস্থা বলুন শুনি।
মুখুজ্জেমশাই বললেন, আমার আর কী বলব? জামাই মেডিকেলের ডাক্তার। অনেক চেষ্টাচরিত্র করল। কিন্তু কাজ হল না।
—সবই কপালের লেখন, মুকুজ্জেমশাই!
বুঝতে না পেরে বললুম, কি হয়েছে আপনার?
আবার কি? ওই আন্ত্রিক। মুখুজ্জেমশাই শ্বাস ছেড়ে বললেন। তারপর আমার

দিকে ঘুরে জিগ্যেস করলেন, আপনার কী হয়েছিল?

অবাক হয়ে বললুম, আমার কী হবে?

—আহা, কিছু না হল তো এই তাজা তরুণ বয়সে টেঁসে গেলেন কী করে?

টেঁসে গেলুম মানে?

মুখুজ্জেমশাই খি খি করে অদ্ভুত হেসে বললেন. ও আব্দুল! কথা শোন্। এখনও লুকোছাপা করছে দেখছিস!

আব্দুল বলল, নতুন টাঁসা তো! তাই বলতে একটু লজ্জা হচ্ছে! পরে ঠিকই বলবেন।

হকচকিয়ে গিয়ে বললুম, ব্যাপারটা কী ঠিক বুঝতে পারছি না তো?

দুজনেই খি খি খ্যা খ্যা হাসতে থাকল। রাস্তার দুধারে কালো হয়ে আছে ধানের ক্ষেত। দূরে ঘন কুয়াশা। কোথাও তালগাছের সারি। চাঁদটা জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে সমানে। তারপর কোথায় শেয়াল ডাকতে লাগল। এতক্ষণে কেমন যেন একটু ভয় ভয় আচ্ছন্নতা চেপে ধরল।

মুখুজ্জেমশাই হঠাৎ বললেন, রোখকে রোখকে! আব্দুল, এখানেই নামিয়ে দে!

আব্দুল রিকশো থামিয়ে বলল, এখানে নামবেন কেন?

মুখুজ্জেমশাই নেমে বললেন, এই ছাতিমগাছটা দেখছিস। এটা আমার বরাবর খুব পছন্দ। এখানেই ডেরা করা যাক।

সে কী! তখন বললেন কুঠিবাড়ির জঙ্গলে একটা ভাল গাছ দেখে রেখেছেন।

না রে থাক। —মুখুজ্জ্যেমশাই নরম গলায় বললেন, শ্যাওড়াগাছে বড্ড পেঁচার জ্বালাতন সারা রাত্তির ক্রাঁাও ক্রাঁাও করে জ্বালিয়ে মারে। বরং ছাতিম গাছটা...

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ধারের ছাতিমগাছের ভেতর থেকে কে বলে উঠল, এখানে হবে না। এখানে হবে না। আগে গিয়ে দ্যাখ।

মুখুজ্জেমশাই গর্জে উঠলেন, কোন ব্যাটারে? বাপুতি সম্পত্তি পেয়েছিস? ওটা আমার দেখে রাখা গাছ, তা জানিস? নাম বলছি হতভাগা!

ছাতিমগাছের দিকে উনি দৌড়ে গেলেন। তারপর ধস্তাধস্তি হইচই বেধে গেল। গাছের ডালপালা বেজায় নড়তে থাকল। আব্দুল জোরে রিকশো চালিয়ে দিল। তফাত গিয়ে বলল, মরুক ওরা ঝামেলা করে। চলুন স্যার, আপনাকে বরং কুঠিবাড়ির ওখানে নিরিবিলি তালগাছের কাছে পৌঁছে দিই। মনের সুখে থাকবেন। জ্যোছনা রাত্তিরে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে গান গাইবেন। বাধা দেবার কেউ নেই।

এতক্ষণে সব বুঝে গেছি। কিন্তু কী করব সেটাই বুঝতে পারছি না। আব্দুলের রিকশো এবার খুব বেগে চলেছে। একটু পরে মরিয়া হয়ে ডাকলুম, আব্দুল! আব্দুল!

—বলুন স্যার!

—দেখ ভাই আব্দুল, তোমাদের বড্ড ভুল হয়েছে।

—কী ভুল স্যার?

—আমি—মানে আমি একজন জ্যান্ত মানুষ।

হাসির চোটে আব্দুলের রিকশোর গতি কমল। সে বলল, সে তো আমারও মনে হয়, স্যার! আসলে ব্যাপারটা বুঝতে দেরি লাগে কিনা! যেমন, এই দেখুন

না আমার ব্যাপারটা। আন্ত্রিক হলে হেলথ সেন্টারে ভর্তি হলাম। তারপর কী হল, বুঝতেই পারলাম না, ডাক্তারবাবুরা জানঘরে ফেলে রাখল আমাকে।

জানঘর! সে আবার কী?

—আজ্ঞে, রুগী টেঁসে গেলে যে ঘরে রাখে।

—সে তো মর্গ! কী সর্বনাশ!

আব্দুল হাসল ফের—তা সর্বনাশ বৈকি! বউ এসে জানঘরে আমাকে পড়ে থাকতে দেখে খুব তম্বি করতে লাগল। বলে কী, শুয়ে থাকলে সংসার চলবে? রিকশো না ঠেলল খাওয়া জুটবে কী করে? তাই শুনে জানঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। রিকশো ঠেলার কপাল করে জন্মেছিলুম স্যার! মরেও নিস্তার পাচ্ছি না!

আব্দুল, আমাকে এখানেই নামিয়ে দাও!

আব্দুল রিকশো থামিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তারপর বলল, বাবুর চোখ আছে বটে! ভাল গাছ পছন্দ করেছেন। গাছটা এখনও খালি আছে বলেই মনে হচ্ছে।

বুঝলুম যে রাস্তার ধারে শুকনো প্রকাণ্ড একটা গাছের কঙ্কালের কথাই বলছে। চাঁদটা সেই নিষ্পত্র গাছের একটা ডালে যেন আটকে আছে ঘুড়ির মত। লাফ দিয়ে রিকশো থেকে নেমেই দৌড় দিলুম। আব্দুল পেছনে চ্যাঁচাচ্ছিল, টাকা বাবুমশাই! ভাড়ার টাকা দিয়ে যান!

জলকাদা ধানক্ষেত ভেঙে দৌড়ুচ্ছিলুম। অনেকটা গিয়ে শুকনো পোড়ো জমি পাওয়া গেল। সেখানে একটা আলো জুগজুগ করছিল। আলোর কাছে গিয়ে দেখি, জনা চার পাঁচ লোক বসে আছে এবং তাদের সামনে একটা মড়ার খাটুলি!

আবার মড়ার পাল্লায় পড়া গেল দেখছি। কিন্তু কিছু বলার আগেই লোকগুলো আমাকে দেখামাত্র কেন কে জানে ওরে বাবা রে বলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে গেল। ভড়কে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ খাটুলি থেকে মড়াটা আড়মোড়া খেয়ে উঠে বসল। তারপর হাই তুলে হাত বাড়িয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠল, একটা সিগারেট হবে নাকি, দাদা?

মাথা ঘুরে উঠল। মনে হল অতল খাদের শূন্যতায় পড়ে যাচ্ছি।...

জ্ঞান ফিরেছিল আমার পিসতুতো দাদার কোয়ার্টারে। কীভাবে উদ্ধার পাওয়া গিয়েছিল, সেটা আলাদা গল্প। গেনুদা বলেছিলেন, আগে খবর না দিয়ে কেকরাডিহি আসা কতটা বিপজ্জনক, এবার বুঝলে তো?

বুঝেছিলুম বলেই আর ভুলেও কেকরাডিহির নাম পর্যন্ত মুখে আনি নি।

টুকুন ও চুমকি

টুকুনের মন খারাপ। তার বড় শালিখ পাখিটা খাঁচা থেকে পালিয়ে গেছে। এক বছর ধরে তাকে কত আদরে পুষছিল টুকুন। নাম রেখেছিল চুমকি। রোজ স্কুল থেকে ফিরে টুকুন তার সঙ্গে গল্প করত। স্কুলে সেদিন যা যা হয়েছিল, সেইসব মজার মজার গল্প! চুমকি মন দিয়ে শুনত আর কিচিরমিচির করে হেসে খুন হত।

চুমকির ভাষা টুকুন দিব্যি বুঝতে পারত। তেমনি টুকুন যা বলত, তাও কি বুঝতো না চুমকি? নৈলে, অত হাসি কিসের?

তবুও চুমকি পালিয়ে গেল। পালিয়ে গেল ছোটোমামার দোষে। খাঁচার দরজা খুলে আদর করতে গেছেন, আর চুমকি ফুড়ুৎ করে উড়ে গেছে। টুকুন রাগে-দুঃখে ছোটমামাকে আঁচড়ে কামড়ে কোণঠাসা করে ফেলেছিল। ছোটমামার ওই এক কথা। 'ভারি তো তো শালিখ। ময়না হলে কথা ছিল।'

রাতে টুকুন শুধু চুমকির স্বপ্ন দেখল। সকালে উঠে তাকে খুঁজতে বেরুল। যেখানে শালিখ দেখতে পায়, খুশিতে লাফিয়ে ওঠে। চিক্কুর ছেড়ে ডাকে, 'চুমকি ই-ই!' চুমকি হলে তো সাড়া দিয়ে কাছে আসবে। ফুড়ুৎ করে ডানা মেলে পালিয়ে যায়। টুকুনের আরও খারাপ হয়ে যায়।

টুকুনের গাঁয়ে কত শালিখ! শুধু চুমকিই নেই। তাহলে কি কানুদের সেই রাক্ষুসে হুলোর পাল্লায় পড়েছিল? বেড়ালটা টুকুনকে দেখতে পেয়েই কেটে পড়ছে কেন? টুকুন কানুদের বাড়ির পেছনে ওত পেতে বসে রইল। হাতে একটা ইটের টুকরো। বেড়ালটাকে উচিত সাজা দেবে।

কানুর বোন বিনু এসে বলল, 'ও কিরে টুকুন? কাকে মারবি তুই?'

টুকুন থতমত খেয়ে ঢিলটা ফেলে দিল। কাঁদো-কাঁদো মুখ করে বলল, 'বিনুদি, আমার চুমকিকে দেখেছ? চুমকি পালিয়ে গেছে কাল।'

বিনু বলল, 'চুমকি কে রে?'

ন্যাকামি দেখে গা জ্বলে যায় টুকুনের। সে রাগ চেপে বলল, 'আমার শালিক পাখি, বিনুদি, দেখনি তাকে?'

বিনু মুখ টিপে হেসে বলল, 'তাই বল্। একটু আগে নদীর ঘাটে ভারু পাটনির ছেলে নোটনের কাছে একটা শালিখ পাখি দেখলাম। গিয়ে খোঁজ নে তো!'

টুকুন দৌড়ল। নদীর ঘাটে নৌকায় বসে ভারু মাঝি হুঁকো খাচ্ছে আর খ্ক-খ্ক করে কাসছে! বলল, 'কী খোকাবাবু? ওপারে যাবে নাকি? এস, পার করে দিই।'

টুকুন বলল, 'নোটন কোথায়, মাঝি? তাকে খুঁজছি।'

ভারু বলল, 'নোটন? সে তো ওপারের বনে গরু চরাতে গেল।'

টুকুন ব্যস্ত হয়ে বলল, 'মাঝি, আমাকে শিগগির পার করে দাও।'

আসল কথাটা ফাঁস করল না। ভারু যদি পার না করে! ভারু তাকে পার করে দিল। ওপারে মেঠো পথের দুধারে সবুজ ধানক্ষেত। এদিকে ওদিকে বনবাদাড়। টুকুন দেখল বনের ধারে একপাল গরু চরছে। তাহলে ওখানেই নোটন আছে। টুকুন আবার দৌড়ল।

কিন্তু কোথায় নোটন? একটা গাছের তলায় একদল রাখাল ছেলে খেলা করছে। তারা বলল, নোটনকে তারা দলে নেয় না। নোটন খুব একানড়ে ছেলে! সে তাই একলা গরু চরায়। ওই তো তার বাঁশির সুর শোনা যাচ্ছে।

বাঁশির সুর যেদিক থেকে আসছে, সেদিকে গভীর বন। টুকুনের এবার একটু ভয় করছিল। তবু সে মরিয়া হয়ে ছুটে চলল। শরৎকালের আকাশ জুড়ে

টুকরো-টুকরো মেঘ ভাসছে। কাশবনে সাদা ফুলের মেলা বসেছে! এই রোদ, এই ছায়া। ফুরফুরে বাতাস বইছে। সবুজ ঘাসের পাতায় রঙবেরঙের ঘাসফড়িং কিরকির করে গান গাইছে। নালার ধারে একপায়ে বসে থাকা বকটা টুকুনের দিকে বিরক্ত হয়ে তাকাল। যেন বলল, 'কে হে তুমি, এখন ঝামেলা করতে এলে?'

নালা পেরুবে কেমন করে? টুকুন নালার ধার দিয়ে দৌড়ে ঝিলের সামনে পড়ল। থমকে দাঁড়াল। এই কি সেই ডাইনির ঝিল—যেখানে পদ্মপাতায় বসে রোদ্দুরে চুল শুকোয় এক আদ্যিকালের বুড়ি ডাইনি? তার নীল চোখ নাকি জ্বলজ্বল করে। ছেলেপুলে দেখলেই সে চোখ দিয়ে রক্ত চুষে খায়। টুকুনের বুক ঢিপঢিপ করল। সে ভয়ের চোখে তাকিয়ে রইল ঝিলের দিকে। কিন্তু ডাইনিটা নেই। ঝিলের জলে কত পাখি। মনের সুখে সাঁতার কাটছে। মাঝে মাঝে ডানা শনশন করে ঝাঁক বেঁধে ওড়াওড়ি করছে। টুকুন ভাবল, এই, এই কি তাহলে পাখিদের দেশ?

হঠাৎ কে ভারি গলায় বলে উঠল, 'কে ওখানে?'

চমক খেয়ে টুকুন ঘুরে দেখল, ঝাঁকড়া আর বেঁটে একটা গাছের তলায় এক বুড়ো মানুষ বসে আছে। টুকুনও ভয়ে ভয়ে বলল, 'আমি টুকুন। নোটনকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সে আমার চুমকিকে ধরেছে। নোটন কোথায়, বলতে পারো?'

বুড়ো হাসতে লাগলো। তারপর বলল, 'নোটন? ওই শোনো সে বাঁশি বাজাচ্ছে। কিন্তু চুমকি কে খোকাবাবু?'

'চুমকি আমার শালিখ পাখির নাম।' বলে টুকুন আবার পা বাড়াল।

বুড়ো বলল, 'হুঁ, নোটনের কাছে একটা শালিখ পাখি দেখেছি বটে।'

বাঁশির সুর গভীর বনের ভেতরে। টুকুন যত যায়, তত মনে হয় বাঁশির সুর দূরে সরে যাচ্ছে। বনের ভেতর ঘন ছায়া। পাখ-পাখালি ডাকছে। ঝিঁঝি পোকা ডাকছে। নোটনের বাঁশির সুর সামনে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় নোটন? হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে গেল টুকুন। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে গেল। সে ধুপ করে বসে পড়ল।

কতক্ষণ পরে তার কানে এল কেউ তার নাম ধরে ডাকাডাকি করছে। টুকুন উঠে দাঁড়াল। তারপর দেখল, ছোটমামা আর সেই বুড়ো মানুষটা হন্তদন্ত হয়ে এদিকেই আসছেন। টুকুন গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ছোটমামা বললেন, 'তোকে খুঁজে খুঁজে সারা। বাড়ি আয় হতভাগা ছেলে।'

টুকুন গোঁ ধরে বলল, 'নোটনের কাছ আমার চুমকি আছে যে।'

ছোটমামা হাসলেন! 'না, না। তোর চুমকি ফিরে এসেছে। দেখবি আয়।'

টুকুন লাফিয়ে উঠল। বুড়ো বলল, 'হুঁ, পোষা পাখি। যাবে কোথায়? বনের পাখি তো আর তাকে দলে নেবে না! তবে নোটনেরও একটা শালিক পাখি আছে। ওই শোনো, নোটন কেমন বাঁশি বাজাচ্ছে।'

যেতে যেতে ছোটমামা গান শুনে বললেন, 'বেশ বাজায় তো ছেলেটা কোথায় বসে বাজাচ্ছে?'

বুড়ো বলল, 'সেটাই বলা কঠিন। নোটন তো এক জায়গায় থাকে না।'

বাড়ি ফিরে, টুকুন দেখল, চুমকি খাঁচার ভেতর মনমরা হয়ে বসে আছে। তাকে দেখে কিচিরমিচির করে বলল, 'তোমার মন খারাপ হবে বলে ফিরে এলাম, টুকুন।

নৈলে আকাশে উড়ে বেড়ানোর যা মজা!'

টুকুন বলল, 'না চুমকি। তোকে আর সব সময় খাঁচায় ভরে রাখবো না। নোটনের মতো তোকে সঙ্গে করে রোজ নদীর ওপারে নিয়ে যাব! সেখানে কত পাখি জানিস তো?' তারপর সে মায়ের কাছে গিয়ে বলল, 'ও মা! আমি একটা বাঁশের বাঁশি কিনব যে! পয়সা দাও।'

নদীর ওপারে ঝিলের ধারে গভীর বন। টুকুনের ইচ্ছে করছে, সেই বনে গিয়ে রাখাল ছেলের মতো বাঁশি বাজাবে! আর তার কাঁধে বসে থাকবে চুমকি। কি মজাই না হবে! ছোটমামা খুঁজতে গেলে তাকে খুঁজেই পাবেন না। অথচ তার বাঁশির সুর শুনতে পাবেন।

সে এক দারুণ লুকোচুরি খেলা!

সবুজ পাঁচিল

এই রোমাঞ্চকর অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটেছিল আমার ছেলেবেলায়। এখন থেকে ঠিক ৪৪ বছর আগে, ১৩৪৯ সালে। তারিখ মনে নেই। তবে মাসটা ছিল আশ্বিন।

কদিন থেকে আকাশের হালচাল ভাল ঠেকছিল না। ধূসর মেঘে ঢাকা ছিল আকাশ। এলোমেলো বাতাস বইছিল সারাক্ষণ। সেই সঙ্গে টিপটিপিয়ে বৃষ্টি। তারপর হঠাৎ একরাত্রে শুরু হয়ে গেল প্রচণ্ড ঝড়। কী ঝড়! কী ঝড়! সেই সঙ্গে তুলকালাম বৃষ্টি। কত গাছপালা ভেঙে পড়ল তার লেখাজোখা নেই। পুকুর ঝিল দীঘি আর নালা ছাপিয়ে জল উপচে পড়ে প্রায় বন্যার দশা। মফস্বল শহরের শেষদিকটায় আমাদের বাড়ি। খেলার মাঠ আর সামনের রাস্তা ছাপিয়ে একহাঁটু জল উঠোনে ঢুকে থইথই করতে থাকল। বাড়িতে মানুষজন বলতে শুধু আমার বিধবা পিসিমা আর আমি। বাবা চাকরি করেন কলকাতায়। পিসি-ভাইপো মিলে বারান্দায় দুরুদুরু বুকে বসে রইলুম সারাটি রাত। শহরে বিদ্যুৎ ছিল। কিন্তু ঝড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে শহর জুড়ে থমথমে আঁধার। এখনও মনে পড়ে, লণ্ঠনের আলোয় পিসিমা বারবার বারান্দার ধারে গিয়ে উঠোন-ছাপানো জলের মাপজোক করছেন আর গম্ভীরমুখে বলছেন, "আর তিনটে ইঞ্চি বাড়লেই ঘরে জল ঢুকবে রে বীরু!" তাই শুনে বারো বছর বয়সী ছেলেটা আরও ভয় পেয়ে যাচ্ছে।

তো পিসিমার মুখে বিড়বিড় করে ঠাকুরদেবতার নাম জপার জন্যই হোক, কিংবা পালোয়ানি পাঁয়তারার দরুন ক্লান্তিতেই হোক, পরদিন সকাল থেকে দুষ্টু ঝড় ব্যাটাচ্ছেলে ক্রমশ নেতিয়ে পড়ল। কিন্তু টিপটিপ বৃষ্টিটা থামল না। সারাটা দিন চিমটি কাটার মতো পৃথিবীটাকে জ্বালাতেই থাকল। এজন্যই বুঝি বলে, "বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়!" পিসিমা খাপ্পা হয়ে বলেছিলেন, "হাকিমের চেয়ে পেয়াদার দাপট!" পিসিমার এই অভ্যাস ছিল। আপনমনে বকবক করতেন।

সেদিন সন্ধ্যায় বাইরের ঘরে পড়তে বসেছি। তখন স্কুলের পুজোর ছুটি। স্কুল খুললে পরে আর একটা মাস বাদে ক্লাস এইটের ফাইনাল পরীক্ষা। টিমটিমে

হেরিকেনের আলোয় ইতিহাস মুখস্থ করছি। বাইরে জল থই থই। টিপটিপ বৃষ্টির শব্দ। খেলার মাঠের দিকে গ্যাঙোর গ্যাঙ করে বিকট গলায় অসংখ্য ব্যাঙ ডাকছে। গাছপালায় জ্বলছে জোনাকির ঝাঁক। থমথম করছে কালো আঁধার। পিসিমা রান্নাঘরে রান্নায় ব্যস্ত। সেইসময় দরজার কড়া নাড়ার শব্দ, তারপর ধাক্কাধাক্কি। চমকে উঠলুম।

চমকে উঠলুম কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে বলে। "বীরু! বীরু! ও বীরু!" তারপর..."পুঁটু! ও পুঁটু! পুঁটু রে!"

পুঁটু আমার পিসিমার ডাকনাম। তারপরই গলাটা চেনা মনে হলো। এদিকে ডাকাডাকিটা পিসিমারও কানে গিয়েছিল। আমি চুপচাপ বসে আছি দেখে খাপ্পা হলেন আমার ওপরই। বললেন, "পৃথিবীতে হুলুস্থুল—আর এদিকে বইপড়া! তুই কি ছেলে রে!"

বলে দরজা খুলে দিলেন। কেউ ঘরে ঢুকে পড়ল। ভিজে জবুথবু যেন কাকতাড়ুয়াটি। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। এদিকে পিসিমা একগাল হেসে "কুড়োদা! তুমি হঠাৎ অসময়ে কোত্থেকে?" বলে টিপ করে লম্বা-চওড়া ভিজে লোকটির পায়ে প্রণাম ঠুকে ফেললেন।

পিসিমার 'কুড়োদা' আমার দিকে তাকিয়ে সহাস্যে বললেন, "কী বীরু। চিনতে পারছিস না নাকি? ইস্। তুই কত্তো বড়ো হয়ে গেছিস রে। অ্যাঁ?"

পিসিমার আমাকে খুঁচিয়ে দেওয়ার দরকার ছিল না। ততক্ষণে মাথার ঘিলু সাফ হয়ে গেছে। ঝটপট উঠে ঝাঁপিয়ে পড়লুম পায়ে। কুড়োমামার ভিজে পাঞ্জাবির চাপে আমি প্রচুর ভিজে গেলুম। এত জোরে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

একটু আদর করে কুড়োমামা আমাকে চেড়ে দিয়ে বললেন, "পুঁটু। শীগগির আমাকে শুকনো কাপড়-চোপড় দাও। ব্যাগের ভেতরসুদ্ধু ভিজে একশা হয়ে গেছে। বাপ্স্। স্টেশন থেকে রাস্তায় নেমেই দেখি জলে জলাক্কার চারদিক। ছাতি নিয়ে বেরুতে মনে ছিল না। ভিজে নাকাল একেবারে।"

পিসিমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কুড়োমামাকে অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে ভেতরে নিয়ে গেলেন। পড়ার বইয়ে আর আমার মন বসল না। কুড়োমামা এসে পড়েছেন। সেই কুড়োমামা। কত অদ্ভুত-অদ্ভুত গল্প না বলতে পারেন। হাসির গল্প, ভূতের গল্প, রূপকথার গল্প, ইতিহাসের গল্প।

কুড়োমামা আমার মায়ের দুরসম্পর্কের দাদা। বছর দুয়েক আগে মায়ের মৃত্যুর পর এসেছিলেন। তখনই ওঁর অনুগত হয়ে পড়েছিলুম। মায়ের মৃত্যুশোক ভুলিয়ে দিয়েছিলেন কুড়োমামা। সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন আর কত রোমাঞ্চকর গল্প না শোনাতেন।

পিসিমার কাছেই শুনেছি, কুড়োমামা 'স্বদেশী আন্দোলন' করে বেড়ান। বক্তৃতা দেন জনসভায়। সেবার আমাদের এই শহরে ওই খেলার মাঠে জনসভায় ওঁকে বক্তৃতা দিতে আমিও দেখেছিলুম। কিন্তু সত্যি বলতে কি, ব্যাপারটা ওই বয়সে ঠিক মাথায় ঢুকতো না। পিসিমার কাছেই শুনেছি, এসবের জন্য ওঁকে নাকি কয়েকবার জেল খাটতে হয়েছে। পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

এসব কারণেই কুড়োমামাকে বড়ো রহস্যময় মানুষ বলে মনে হত। সেই

সন্ধ্যারাতে যখন কুড়োমামা পাশের ঘরে পিসিমার সঙ্গে কথা বলছেন, তখন মনে পড়ে গিয়েছিল, রাণাপ্রতাপ, শিবাজী ও সিরাজউদ্দৌল্লার গল্প, কুড়োমামার কাছে অমন করে না শুনলে সেবার ইতিহাসে হয়তো এত ভালো নম্বরই পেতাম না! ইতিহাসের পরীক্ষায় ওই প্রশ্নগুলো ছিল। হ্যাঁ, অশোক আর আকবরের প্রশ্নও ছিল। কুড়োমামার কাছে তাঁদের কথা গল্পের মতো করে না শুনলে অমন পরীক্ষার খাতায় লিখতে হয়তো পারতাম না। বই মুখস্থ করে কি ভালো নম্বর পাওয়া যায়?

তাই কুড়োমামা কখন আগের মতো আমার কাছে গল্প বলতে আসবেন, সেই প্রতীক্ষায় বই বুজিয়ে বসে রইলুম। দুচ্ছাই! পিসিমার বকবকানিই যে থামছে না!

কুড়োমামা এলেন অবশেষে। হাতে চায়ের গেলাস। মুখোমুখি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে একটু হেসে বললেন, "তারপর বীরু, তোর খবর বল। কোন ক্লাস হলো?"

কুড়োমামার মুখে হাসি দেখছিলুম বটে, কিন্তু ওঁকে কেমন যেন আনমনা দেখাচ্ছিল। অল্প কথায় ওঁর প্রশ্নের জবাব দিয়ে বললুম, "অ্যাদ্দিন আসেননি কেন মামাবাবু?"

কুড়োমামা চায়ে চুমুক দিয়ে গলার ভেতর বললেন, "আমার যা কাজ, তাই করে বেড়াচ্ছিলুম।"

"কী কাজ?"

গান্ধীজীর ডাকে 'কুইট ইন্ডিয়া—ভারত ছাড়ো' আন্দোলন করে বেড়াচ্ছিলুম।"

হাসতে হাসতে বললুম, "ধুস! ওসব কী বুঝি না!"

কুড়োমামা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'বুঝতে হবে বৈকি বাবা! কত্তো বড়োটি হয়েছিস! এখন থেকে যদি না বুঝবি, তো আর কবে বুঝবি? তোর মতো ছেলেরা—"

ঝটপট বাধা দিয়ে বললুম, "ও মামাবাবু! ওসব থাক। বরং একটা গল্প বলুন। কতদিন আপনার গল্প শুনিনি।"

"আহা! তোকে তো গল্প করেই বলতে চাইছি! গান্ধীজী—"

"না মামাবাবু! এখন ভূতের গল্প জমবে ভালো। ওই দেখুন না, কেমন আঁধার হয়ে আছে সব। এমন রাত্রেই তো ভূতেদের মজা, তাই না মামাবাবু? বলুন না একটা ভূতের গল্প!"

কুড়োমামা চুপচাপ গম্ভীর মুখে চা খেতে থাকলেন। তারপর গেলাস শেষ করে টেবিলে রেখে আস্তে বললেন, "ভূতের চেয়েও অদ্ভুত ব্যাপার আছে—জানিস বীরু? তোদের এই শহরেই সেটা ঘটেছিল।"

খুশিতে নড়ে বসে বললুম, "এই শহরে? ভূতের চেয়ে অদ্ভুত?"

"হুঁ—ভারি অদ্ভুত।"

"বলুন মামাবাবু! বলুন না সেই গল্পটা!" কুড়োমামা আবার একটু চুপচাপ থাকলেন। তারপর বললেন, "তাহলে বলি, শোন।"

"...তোদের এই শহরে প্রথম যখন আসি, তখন তোর জন্মই হয়নি। তোর মা প্রণতি ছিল আমার খুড়তুতো বোন। প্রণতির বিয়ের সময় গান্ধীজীর 'অসহযোগ আন্দোলনের' ডাকে কলেজ ছেড়েছি। ঝাঁপিয়ে পড়েছি সেই আন্দোলনে। স্লোগান

কি দিতুম জানিস? 'বিলিতি কাপড় গাধায় পরে!'...গান গেয়ে বেড়াতুম, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই!' সব জায়গায় আপিসে-কাছারিতে পিকেটিং করে বেড়াতুম। তো..."

বিরক্ত হয়ে বললুম, "আবার ওসব কথা। অদ্ভুত গল্পটা বলুন না মামাবাবু!"

কুড়োমামা কেন যেন ম্লান হাসলেন। বললেন, "সেই তো বলছি! চুপচাপ শোন্ না বাবা! —তো সেই অসহযোগ আন্দোলনের ফলে আমি ইংরেজ সরকারের জেলে বন্দী হলুম। ছমাস জেল খেটে বেরিয়ে এসে শুনি, প্রণতির বিয়ে হয়ে গেছে! তারপর প্রণতির চিঠিও পেলুম—পইপই করে লিখেছে, যেন একবারটি ওকে দেখে যাই। তাই এলুম।"

কুড়োমামা দরজার বাইরে টিপটিপ বৃষ্টিঝরা অন্ধকারের দিকে কেমন চোখে তাকিয়ে আবার একটু চুপচাপ থাকলেন। তারপর ফোঁস করে চাপা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "এ শহরে সেই প্রথম আমার আসা। কোনো নতুন জায়গায় গেলে আমার আমার এই স্বভাব—চক্কর মেরে ঘুড়ে বেড়াই। পায়ে হেঁটে না ঘুরলে তো কোনো জায়গায় নাড়ীনক্ষত্র চেনা যায় না! তাই রোজ সক্কালে একদফা ঘুরতে বেরোই। আবার বিকেলে একদফা বেরিয়ে পড়ি। তখন মাসটা ছিল এমনি আশ্বিন। তোদের শহরটা ভারি সুন্দর। ইংরেজরাই একে সুন্দর করে সাজিয়ে ছিল। রাস্তার দুধারে কত গাছপালা, কত সুন্দর-সুন্দর পার্ক আর ফুলবাগান। তোদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে দক্ষিণে কিছুদূর হেঁটে গেলে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড। একধারে ব্যারাক— মানে সেনানিবাস। রোজ সকালে-বিকেলে সেখানে সৈন্যরা মার্চ করত। বিউগল বাজত। ব্যান্ড বাজত।"

বললুম, "এখনও তাই হয়, মামাবাবু!"

কুড়োমামা কানে নিলেন না। বললেন, "সেই শরৎকালে এমন ঝড়বৃষ্টি ছিল না। একদিন বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের ধার দিয়ে এগিয়ে চলেছি। ব্যারাকের পর জেলখানার মস্তো উঁচু পাঁচিল চলে গেছে অনেক দূর। তারপর পুরনো খ্রীস্টান কবরখানা। তার ওধারে একটা তেমনি পুরনো গির্জা!"

"সে তো এখনও আছে!'

"আছে।" কুড়োমামা চাপা গলায় বললেন। মুখটা ভারি গম্ভীর। "জেলখানার টানা পাঁচিলের পর জঙ্গুলে পুরনো কবরখানা—কেমন? রোজই ওখান দিয়ে গেছি। কিন্তু ব্যাপারটা চোখে পড়েনি। তাই সেদিন বিকেলে ওটা চোখে পড়তেই থমকে দাঁড়ালুম। ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম ওটা দেখে।"

"কী মামাবাবু? কী দেখে ভীষণ অবাক হলেন?"

"একটা সবুজ পাঁচিল!"

"সবুজ পাঁচিল।"

"হ্যাঁ—ঘন সবুজ ঝকঝকে রঙের একটা পাঁচিল। মাঝখানে একটা দরজা। দরজা খোলা ছিল।"

"কিন্তু তেমন কোনো সবুজ পাঁচিল তো—"

কথায় বাধা দিয়ে কুড়োমামা বললেন, "হ্যাঁ—সেটাই তো অদ্ভুত! জেলখানা

আর কবরখানার মাঝখানটিতে একটা দরজা খোলা সবুজ পাঁচিল! থমকে দাঁড়ালুম। ওদিকটায় ঘরবাড়ি ছিল না। জনমানুষ নেই। খাঁ-খাঁ জায়গা। আমার খালি অবাক লাগছিল, কেন এটা চোখে পড়েনি? কতবার দুবেলা ওদিকে ঘুরতে গেছি! এটা তো চোখে পড়েনি। তাই খোলা দরজা দিয়ে উঁকি মারতে গেলুম। দেখি কী, একটা সুন্দর—আশ্চর্য, সুন্দর ফুলের বাগান। কতরকমের কত রঙের ফুল ঝলমল করছে। কত সব সুন্দর-সুন্দর পাতাবাহারের গাছ। কত বিচিত্র গড়নের ঝাউগাছ, ক্যাকটাস, লতাকুঞ্জ। মধ্যিখানে মার্বেল পাথরের একটা গোল বেদি। আর বেদির কেন্দ্রে একটা ফোয়ারা। ঝরঝরিয়ে জলের ধারা ছড়িয়ে পড়ছে। ফোয়ারার মাঝখানে একটা সাদা থাম। থামের ওপর তেমনি সাদা একটি পরীমূর্তি। সামনে ঝুঁকে একটা সাদা কলসে যেন জল ভরছে। আর সেই সুন্দর বাগানে ঝাঁকে ঝাঁকে রঙবেরঙের পাখি বসে গান গাইছে। কী তাদের ডানার রঙ, কী তাদের মিঠে বুলি। বীরু, আমি, থ বনে গেলুম।"

"তারপর মামাবাবু, তারপর?"

"তারপর আমি চমকে উঠলুম। ফোয়ারার সেই পরী কলসে জল ভরছিল। হঠাৎ কলস তুলে কাঁখে নিল। সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর আমাকে দেখে ফেলল। তুই বিশ্বাস কর, বীরু! তোকে কত গল্প বলেছি। কিন্তু এমন সত্যিকারের গল্প কখনও বলিনি, বাবা!"

"তারপর কী হলো মামাবাবু?"

"পরী একলাফে নেমে এল বেদিতে। বেদি থেকে নিচের ঘাসে ঢাকা মাটিতে। তারপর মিঠে গলায় বলল, 'কে গো তুমি? ভেতরে এস না বাপু! অমন করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস—চলে এস।' তখন সাহস করে ভেতরে গেলুম। পরী বলল, 'আমার সঙ্গে এস। তুমি আমাদের অতিথি।' ওর সঙ্গে চলতে থাকলুম। যত যাই, তত ফুল আর গাছের রঙ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ভয় করে, কোথায় নিয়ে চলেছে আমাকে? রূপকথার গল্পে আছে, রাক্ষুসীরা মানুষকে এমনি ছলে ডেকে নিয়ে গিয়ে চিবিয়ে খেত। তাই করবে না তো? কিন্তু সেই সময় কানে ভেসে এল আশ্চর্য সুন্দর সঙ্গীতধ্বনি! অত সুন্দর বাজনা কখনও শুনিনি, বীরু! মন ভরে গেল আনন্দে। তারপর দেখি ছোট্ট খোলামেলা মাঠ। সেই মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে সাদা পোশাক পরা একটা সুন্দর চেহারার লোক। সে-ই বেহালা বেজাচ্ছে। তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে তোর বয়সী একদল ফুটফুটে ছেলেমেয়ে। পরী তাদের কাছে গিয়ে অজানা ভাষায় কী বলল। আর তার সঙ্গে সঙ্গে তারা আমার দিকে ছুটে এল। আমাকে ঘিরে ধরে হইচই করতে লাগল, 'অতিথি এসেছে! অতিথি এসেছে!' ওদের পাল্লায় পড়ে আমিও ছোট্টটি বনে গেলুম। ওদের সঙ্গে খেলতে লাগলুম। বেহালা বাজতে থাকল মধুর সুরে। সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। শেষ বেলায় লালচে আলোয় সেই চিকন সবুজ ঘাসের মাঠে আমরা খেলায় মেতে আছি। তারপর—"

"সেই পরী?"

"পরীর দিকে আর চোখ ছিল না। মনে হচ্ছিল, হারিয়ে যাওয়া ছেলেবেলাটা কীভাবে ফিরে পেয়েছি। আমিও ছোট্ট ছেলেটি হয়ে উঠেছি। ছুটোছুটি করে ওদের

সঙ্গে লুকোচুরি খেলে বেড়াচ্ছি। এদিকে সূর্য ডুবে গিয়ে আবছা আঁধার ঘনিয়ে এসেছে কখন। হঠাৎ সেই সময় একটা অমানুষিক গর্জন শুনতে পেলুম। সেই ভীষণ গর্জন শোনামাত্র অবাক হয়ে দেখলুম, ছেলেমেয়েগুলো সঙ্গে সঙ্গে কাঠপুতুল হয়ে গেল। তাদের মুখচোখে প্রচণ্ড ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। সবাই জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমি ওদের জিজ্ঞেস করলুম, 'ও কে অমন গর্জন করছে? চলো তোমরা, ও কি জন্তু না মানুষ? ছেলেমেয়েগুলো আমার কথার জবাব না দিয়ে হঠাৎ দৌড়ে কে কোথায় লুকিয়ে পড়ল। সেই বেহালাবাজিয়ে লোকটিকেও দেখলাম ছুটে গিয়ে গা-ঢাকা দিল লতাকুঞ্জের আড়ালে। তারপর আরও অবাক হয়ে দেখলাম, কলস কাঁখে নিয়ে সেই সাদা পরীও ছুটে গিয়ে ফোয়ারার স্তম্ভে উঠে আগের মতো ঝুঁকে জল ভরার ভঙ্গিতে স্থির পাথরের মূর্তি হয়ে গেল। আমি তো দাঁড়িয়ে আছি। কিছু বুঝতে পারছি না—কে অমন অমানুষিক গর্জন করল, আর তাই শুনে কেনই বা ওরা অমন ভয় পেয়ে লুকিয়ে গেল?...আমাকে তুই তত চিনিস নে বীরু। আমি ভয় পাই বটে, কিন্তু তারপর রুখে দাঁড়াতেও পারি। আমার ভীষণ রাগ হলো। বেশ তো ওরা সব আনন্দ করে খেলছিল। বেহালা বাজাচ্ছিল। এই আনন্দ পণ্ড করল কে সে? তাই চিৎকার করে বললুম, কোন ব্যাটা রে? সাহস থাকে তো সামনে আয় দেখি—তুই জানোয়ার, না মানুষ?' তখনও আমি জোয়ান মানুষ। ডনবৈঠক করতুম। লাঠি-তলোয়ার খেলা শিখতুম, আখড়ায়। ওগুলো স্বদেশী আন্দোলনেরও অঙ্গ ছিল জানিস তো?"

গল্পটা দারুণ। তাই বিরক্ত হয়ে বললুম, "আবার সেই স্বদেশী-স্বদেশী! তারপর কী হলো বলুন?"

কুড়োমামা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "আমি চ্যালেঞ্জ করে দাঁড়িয়ে আছি। আস্তিনও গুটিয়েছি। সেই সময় আবছা আঁধারে আমার চেয়েও প্রকাণ্ড চেহারার একটা লোককে দেখতে পেলুম। সে আবার অমানুষিক গর্জন করে উঠল। তারপর এসে আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। অমনি টের পেলুম লোকটার গায়ে অসুরের জোর। একে এঁটে ওঠা আমার সাধ্য নয়। মাটি থেকে উঠে ঘুষি মারতে হাত তুলেছি, সে আমার হাতটা ধরে মোচড় দিল। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করলুম। তারপর সে অন্য হাতে আমার ঘাড় ধরে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে চলল। সবুজ পাঁচিলের দরজার বাইরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিল। তারপর সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।"

কুড়োমামা চুপ করলেন। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি চুলকোতে থাকলেন। মুখে চাপা রাগের বা অপমানের স্পষ্ট ছাপ। বললুম, "তারপর?"

কুড়োমামা আস্তে বললেন, 'জীবনে কত ইংরেজকে বেধড়ক ঠেঙিয়েছি। পরে গন্ধীজীর আদর্শে অহিংসা ব্রতে দীক্ষা নিয়েছিলুম। কিন্তু সেই ঘটনার পর প্রতিজ্ঞা করলুম, অহিংসাব্রত আমার পথ নয়। রামকৃষ্ণ ঠাকুরের সেই গল্পটা তোকে বলেছিলুম মনে আছে তো? সাপের গল্পটা?"

"মনে আছে! ঋষি বলেছিলেন, ওরে! কামড়াতে না হয় বারণ করেছি। ফোঁস করতে তো বারণ করিনি! এবার রাখালেরা তোকে জ্বালাতে এলে ফোঁস করবি। ফোঁস করতে দোষ কী?"

কুড়োমামা সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ। কিন্তু ফোঁস করেও সব জায়গায় কাজ হয় না। তাই সবুজ পাঁচিলঘেরা বাগানের সেই বদমাশটাকে মরণকামড় কামড়ানোর প্রতিজ্ঞা করলুম। সারারাত রাগে অপমানে দুঃখে আমার ঘুম এল না। ভোরবেলা উঠে উপযুক্ত অস্ত্র খুঁজতে শুরু করলুম। তখন তোদের একটা গাইগরু ছিল। সেই গরু ওই মাঠে একটা লোহার গোঁজ পুঁতে বেঁধে চরতে দেওয়া হত। সেই গোঁজটা—"

ঝটপট বললুম, "হ্যাঁ,—হ্যাঁ—বুঝেছি। গরুটা নেই আর। কিন্তু গোঁজটা আছে। পিসিমা ওই দিয়ে কয়লা ভাঙে। রান্নাঘরে কয়লা রাখার জায়গায় গোঁজটা এখনও আছে।"

কুড়োমামা আনমনে বললেন, "আছে বুঝি? তো সেইটে জামার ভেতর লুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড ছাড়িয়ে জেলখানার টানা পাঁচিলের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে খ্রীস্টান কবরখানার কাছে থমকে দাঁড়ালুম। অবাক কাণ্ড!"

"কী অবাক কাণ্ড, মামাবাবু?"

"সবুজ পাঁচিলটা নেই!! জেলখানার উঁচু পাঁচিলের আর কবরখানার নিচু পাঁচিলের মাঝখানে একটা সবুজ পাঁচিল আগের দিন দেখেছি! এত কাণ্ড হয়েছে। এখন ভোলবেলা গিয়ে দেখি, তেমন কিছু নেই। এ তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার! আমি তো গাঁজাখোর নই। লোকটার টানে আমার জামার খানিকটা ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেই জামাটাই গায়ে আছে আমার। অথচ কোনো সবুজ পাঁচিল নেই!!"

হাসতে হাসতে বললুম, "সত্যি মামাবাবু, ওখানে তেমন কোনো সবুজ পাঁচিল নেই!!"

কুড়োমামা জোর গলায় বললেন, "ছিল। দেখেছি। যাই হোক, তাজ্জব হয়ে ফিরে এসে তোর বাবা-মাকে জিজ্ঞেস করলুম, জেলখানা আর কবরখানার মাঝে একটা সবুজ পাঁচিল দেখেছে কি না! দুজনেই আমার কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, না তো! তখন ফের বেরিয়ে পড়লুম। এ শহরে আমার চেনাজানা অনেক লোক আছে। তাদের কাউকেই আসল ঘটনাটা না বলে শুধু জানতে চাইলুম, জেলখানা আর কবরখানা মাঝে একটা সবুজ পাঁচিল আছে কি না। প্রত্যেকে বলল, না। তেমন কিছু নেই। তখন আবার ফিরে গেলুম সেখানে। কবরখানায় ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে ক্লান্ত হয়ে বসে রইলুম। সবুজ পাঁচিলটা—সেই বাগানটা কোথায় গেল তাহলে?... তারপর যে কয়েকটা দিন তোদের বাড়িতে ছিলুম, রোজ দুবেলা গিয়ে ওটা খুঁজতুম। মাথায় জেদ চেপে গিয়েছিল। আসলে সেই ঘাড়ধাক্কা খাওয়ার অপমান! আর সেই ফুল, পাখি, পরী, ফুটফুটে ছেলেমেয়ের দল, বেহালা-বাজিয়ে বাজনা! আমাকে সেখান থেকে ঘাড়ধাক্কা খেতে হয়েছে—এও বড় কথা। কিন্তু নিজের ওপর রাগ হচ্ছিল আসলে। তাহলে কি সবটাই স্বপ্ন?...বেশ—তাহলে আমার জামা ছিঁড়ল কে? কেন ডানহাতে মোচড়ানোর যন্ত্রণা?"

একটু চুপ করে থাকার পর কুড়োমামা বললেন, "তারপর যেখানেই গেছি, যা কিছু করেছি—ঘটনাটা ভুলতে পারিনি। বারবার একটা সবুজ পাঁচিল মনে ভেসে উঠেছে। আমাকে জ্বালিয়ে মেরেছে—দুঃখে, অভিমানে, রাগে। মাঝে মাঝে প্রায়ই

রাত্রে স্বপ্নে দেখতে পেতুম। ঘুম ভেঙে গিয়ে কষ্ট হত। দুবছর আগে তোর মায়ের মৃত্যুর খবর পেলুম। তারপর আমাকে আসতে হলো আবার। সেই সময় আবার ওখানে গেলুম। নাঃ, তেমন কোনো সবুজ পাঁচিল নেই। তোর মনে আছে বীরু? তোকে সঙ্গে নিয়ে রোজ ওদিকে বেড়াতে যেতুম?"

মনে পড়ে গেল। বললুম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি জেলখানা আর কবরখানার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আমি জিগ্যেস করলে জবাব দিতেন না কিন্তু। বিড়বিড় করে আপন মনে কী যেন বলতেন।"

কুড়োমামা শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "আমি সেই আশ্চর্য সবুজ পাঁচিলটা খুঁজতুম, বীরু!"

জোর গলায় বললুম, কিন্তু "মামাবাবু সত্যি ওখানে কোনো সবুজ পাঁচিল—"

কুড়োমামা চাপা ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ কর! আছে—থাকতেই হবে। আমার ভুল হতেই পারে না! এখনও ডানহাতের সেই যন্ত্রণাটা থেকে গেছে, জানিস?... তো দুদিন আগে রাত্রে আবার স্বপ্নে দেখতে পেলুম সবুজ পাঁচিলটাকে। সকালে উঠেই ঠিক করলুম, এর একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে। প্রচণ্ড ঝড় জল অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে পড়লুম। বীরু আবার আমি এসেছি সেই সবুজ পাঁচিলটাকে খুঁজে বের করতে। ওটা আছে—থাকতে বাধ্য। আসলে আমারই খোঁজার ভুলে ওটা খুঁজে পাচ্ছি না! ওটা খুঁজে বের না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই বাবা, তাতে যদি মৃত্যু হয় তো হোক।"

পিসিমা এসে বললেন, "আর কতক্ষণ মামা-ভাগ্নে মিলে গল্প জমাবে, কুড়োদা? খেতে হবে না? এস।"

সে-রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কুড়োমামার পাশে শুয়ে অনেকক্ষণ সাধাসাধি করছিলুম অন্য গল্প বলবার জন্য কিন্তু কুড়োমামার খালি সেই সবুজ পাঁচিল আর তার ভেতর যা ঘটেছিল, ইনিয়ে-বিনিয়ে ফের সেই কাহিনী। তবে শুনতে খুব ভাল লাগছিল বৈকি! যদি আমিও অমনি করে কোনোদিন হঠাৎ খুঁজে পেয়ে যাই সবুজ পাঁচিলটা, কী মজাই না হবে! কিন্তু সেই বদমাশ লোকটার পাল্লায় যদি পড়ি! এই ভেবে দমেও যাচ্ছিলুম।

তবু সবুজ পাঁচিলের ওধারে এক আশ্চর্য সুন্দর ফুলবাগান, জীবন্ত পরী, আমার বয়সী ছেলেমেয়েদের খেলা, সুন্দর বেহালার বাজনা, পাখ-পাখালির গান! আমি ঘুমের ভেতর তলিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ আবিষ্কার করলুম, সেই সবুজ পাঁচিলের খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মার্বেল পাথরের বেদির কেন্দ্রে সাদা পরীটাও কলসে জল ভরতে গিয়ে আমাকে দেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। মিঠে গলায় ডেকে বলল, 'এস বীরু। ভেতরে এস।'...

সকালে ঘুম ভেঙে জানলুম, ওটা স্বপ্ন—নিছক স্বপ্ন। মনটা খারাপ হয়ে গেল। তবে একটাই আনন্দের কথা, স্বপ্নে কোনো বদমাশ লোকের অমানুষিক গর্জন শুনিনি! আমাদের খেলায় কেউ বাধা দেয়নি।

পাশে কুড়োমামা নেই। ওঁর ভোরে ওঠা অভ্যাস। বেরিয়ে দেখি, রোদে ঝলমল

করছে চারদিক। জল নেমে গেছে উঠোন থেকে, রাস্তা শুকনো। কিন্তু কাদা, ছেঁড়া ডালপালা পড়ে আছে। কাদা থকথক করছে কোথাও কোথাও।

পিসিমার আবছা বকবকানি কানে আসছিল। বেরিয়ে গিয়ে দেখলুম, বাড়ির কাজ-করা মেয়ে লক্ষ্মীকে বকাঝকা করছেন। বললুম, "কী হয়েছে পিসিমা? ওকে বকছ কেন?"

পিসিমা খাপ্পা হয়ে বললেন, "কয়লাভাঙা লোহার গোঁজটা—"

চমকে উঠেছিলুম। কথা কেড়ে ঝটপট বললুম, "আমি জানি গোঁজটার কী হয়েছে। তুমি ওকে বকো না পিসিমা।"

পিসিমা আরও রেগে গিয়ে বললেন, "বলছিস তো! এখন কয়লা ভাঙবে কী দিয়ে?"

লক্ষ্মী অতশত বোঝে না। গুম হয়ে বলল, "আহা। দিচ্ছি গো ভেঙে দিচ্ছি কয়লা! শুধু ওইটে দিয়ে ছাড়া কি সংসারে কেউ কয়লা ভাঙে না, না ভাঙা যায় না?"

বললুম, "পিসিমা। মামাবাবু কখন বেরিয়েছেন দেখেছ?"

পিসিমা ঝাঁঝালো গলায় বললেন. "কে জানে বাবা তোর মামাবাবুর খবর? আমায় কি বলে গেছে? চিরটাকাল মাথা খারাপ লোক। এত বয়স হলো। চুল পাকল, তবু বাউন্ডুলেপনা ঘুচল না।"

তখনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লুম। স্যান্ডেল হাতে নিতে হলো—বাস্তায় যা পাঁক আর আবর্জনা। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাইণ্ডের কাছে গিয়ে দেখলুম, কাদামাখা ঘাসের ওপর গোরা সেপাইরা রোজকার মতো মার্চ করছে। বিউগল বাজছে। ব্যান্ড বাজছে। কিছু এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল, জেলখানার টানা পাঁচিলের শেষে কবরখানার শুরু যেখানে সেখানে একটা ভিড়। লাল টুপি পরা অজস্র পুলিশ। পুলিশের গাড়ি। আমার পাশ দিয়ে শহরের লোকেরা হন্তদন্ত ছুটে চলেছে। পাড়ার চাটুয্যে কাকাকে জিজ্ঞেস করলুম, "ওখানে কী হয়েছে কাকাবাবু?"

চাটুয্যেমশাই বললেন, "গত রাতে কে নাকি জেলের পাঁচিলে গর্ত খুঁড়েছে। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে অনেক কয়েদী নাকি পালিয়েছে। সেন্ট্রি গুলি ছুঁড়েছিল! একজন মারা পড়েছে।"

হঠাৎ আমার ভেতর কী একটা নড়ে উঠল। বুকের ভেতর একটা শব্দ হলো। শরীর ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেল। দৌড়ুতে শুরু করলুম! তারপর ভিড় ঠেলে গিয়ে উঁকি মেরে দেখেই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলুম।

জেলের পাঁচিলের কোনায় খোঁড়া একটা সুড়ঙ্গ। তার নিচে চিত হয়ে পড়ে আছেন—হ্যাঁ, কুড়োমামাই বটে! হাতের মুঠোয় পিসিমার হারানো সেই লোহার গোঁজটা। কুড়োমামার বুকে রক্তের ছোপ। চোখ ফেটে জল এল। আস্তে আস্তে সরে এলুম।...

অনেক পরে, আরও বড় হয়ে বুঝেছিলুম কুড়োমামা স্বাধীনতা আন্দোলনে বন্দী সহকর্মীদের জেল থেকে পালানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু তাহলেও ওই সবুজ পাঁচিলের গল্পটা মিথ্যে নয়! কখনো!...

শনির দৃষ্টি লাগলে

অনেকদিন পরে নান্টুমামা এলেন। আমরা তো সবাই হইহই করে উঠলুম! চারদিক থেকে ওঁকে ঘিরে মহানন্দে বনবন করে পাক খেতে লাগলুম। চেঁচামেচিও কম করছিলুম না—অ্যাদ্দিন কোথায় ছিলে মামা...কী করেছিলে মামা...কেমন আছো মামা...

নান্টুমামা চোখ পাকিয়ে দুহাত তুলে কড়া ধমক দিলেন, হল্‌ট!

আমরা থাকলুম। মামা মুখ ভেংচে এবার বললেন, কী হয়েছেটা কী? শনির চাকার মতো পাক খাচ্ছিলি কেন তোরা? আমায় কি শনি ভেবেছিস নাকি?

মা কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, নান্টু! তা এসেই আবার একটা কুলক্ষুণে কথা না বললে চলত না বুঝি?

নান্টুমামা ভুরু কুঁচকে বললেন, কুলক্ষুণে মানে?

মা একটু হেসে বললেন, কেন—ওই সব শনিটনি কী বলিছিস যে?

মামাকে গম্ভীর দেখাল! নাক, চুলকে বললেন, বলি কি সাধে? ওদিকে আমায় শনিতে পেয়ে বসেছে—সে নিয়ে এক জ্বালায় দিনরাত্তির জ্বলছি, তার ওপর ঘরে ঢোকামাত্র এই ক্ষুদে পালবংশের আনাচ্ছিষ্টি!...

এই বলে উনি আমাদের দিকে রাগী চোখে তাকিয়ে চাপা মন্তব্য করেও ফেললেন হুঁ, বাংলার পালবংশ! এখন হিস্ট্রি খুঁজে গোপালকে এনে রাজা করে দাও, ব্যস!

মা হেসে উঠলেন। এবং কিছু না বুঝে আমারও হাসলুম।

মামা কিন্তু আরও রেগে বললেন, হেসো না। মুণ্ডু উড়ে যাবে। তখন কিন্তু গণেশের মতো হাতি-ফাতির মুণ্ডুও আর মিলবে না ঘাড়ে বসানোর জন্যে। আসামে আজকাল হাতি মেলে না। যা দু চারটে আছে, তাও রেশনিং কনট্রোলারের দপ্তরে ফাইলে চাপা পড়ে রয়েছে। লালফিতের ফাঁস কী জিনিস টের তো পাওনি। একটা হাতি পেতে পুরো এক বছর লাইন দিতে হবে।

মা তাঁর ছোট্ট ন্যাওটা ভাইটিকে কথায় না পেরে বললেন, খুব হয়েছে। বোস এখন। চা-ফা খা।...

মা চলে গেলেন কিচেন! মামা ধুপ করে বললেন। তাঁকে কেমন হতাশ আর ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। আমি বললুম, মামা, শনিতে পেয়েছে বললে! কী ব্যাপার?

নান্টুমামা বরাবর ভাগ্নেভাগ্নীদের মধ্যে আমাকেই সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন। তাঁর মতে দলের মধ্যে আমিই একমাত্র, বুদ্ধিমান, বাকি সব বুদ্ধু। সম্ভবত সে কারণেই একটি লম্বা প্রশ্বাস ছেড়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, মাই ডিয়ার বয়, সত্যি এ একটা দারুণ ডেনজারাস ব্যাপার। প্রথম প্রথম মোটেও টের পাইনি যে কী ঘটছে। পরে দেখলাম, মাই গড। নির্ঘাৎ এ হচ্ছে শনির কাণ্ড! তা না হলে এসব কেমন করে সম্ভব?

রুদ্ধশ্বাসে বললুম, কী, কী, মামা?

মামা বললেন, আচ্ছা বল তো খোকা—মানুষের চোখ চশমা পরে, না চশমা

মানুষের চোখ পরে? কিংবা ধর, আমার কথাই বলি। আমি, আমার গলায় এই টাইটা পরে আছি, না টাইটা আমার গলা পরে আছে? আমার পা দুটো জুতোমোজা পরেছে, না জুতোমোজা আমার পা দুটোকে পরেছে? এবার পরপর এভাবে হিসেব করে যা। প্যান্ট শার্ট ঘড়ি কলম আংটি— কোনটা এ কম্মো করছে না বল? উরে ব্বাস! একি সাংঘাতিক কাণ্ড! আমার চোখ দুটো যেন ক্রমশ উল্টো দেখতে শুরু করেছে সব। ভেবে দ্যাখ, তাহলে মানুষের কী বিপজ্জনক অবস্থা। তার কোন স্বাধীনতা নেই?

মামা হাঁপাতে হাঁপাতে ফের বললেন, সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার ঘটল গতকাল বিকেলে। শখ করে একটা ছড়ি কিনেছিলুম চৌরঙ্গীর একটা কিউরিও শপে। খুব পুরনো ছড়ি মেড ইন ফিফটিনথ সেনচুরি বি সি—তার মানে আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর আগের জিনিস। ব্যাবিলনের রাজা বারোব্বাসের এক মহামাত্যের হাতের ছড়ি। সেই ছড়ি কিনে মনের আনন্দে তো বেড়াতে বেরোলুম লেকের ধারে। হঠাৎ দেখি, কিমাশ্চর্যম! ছড়িটা নিয়ে আমি হাঁটছি না—ছড়িটাই আমাকে নিয়ে হাঁটছে। ওঃ! সে এক মারাত্মক অভিজ্ঞতা রে...!

সবাই রুদ্ধশ্বাসে শুনছি। বুক কাঁপছে। প্রত্যেকেই সন্দেহের চোখে নিজের নিজের জামা-প্যান্ট জুতোর দিকে তাকাচ্ছে।

সেই সময় হঠাৎ মামা বলে উঠলেন, আমরা বন্দী, আমরা বন্দী! আহা, ওই সব পাখিগুলো কেমন সুখেই তো আছে! পশুগুলোও অনেকে তাই। স্বাধীন হয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পিকলু বয়সে সবার ছোট। সে বলল, মামা, তাহলে আমি জামাপ্যান্ট-ট্যান্ট সব খুলে ফেলে দিই। এবং সে সত্যি সত্যি হাফপ্যান্টের বোতাম খুলতে শুরু করল।

এবার যেন আমরা লজ্জা পেয়েই চেঁচামেচি শুরু করলুম।...ছ্যা, ছ্যা, এই পিকলু! লিলি দৌড়ে কিচেনে গিয়ে চেঁচাতে লাগল। মা, মা! ওরা সব নাগাসন্নেসী হয়ে যাচ্ছে।

মা চায়ের কাপ হাতে বেরিয়ে ধমক দিলেন।—থাম তো সব। যে কুরুক্ষেত্র চলছে ঘরের মধ্যিখানে।

নান্টুমামা চায়ের কাপপ্লেট হাতে নিয়ে চুমুক দিতে গিয়ে হঠাৎ থামলেন। মুখ তুলে বললেন, দিদি, আমার ভয় করছে। এ কী হলো বলো তো? আমি চা খাচ্ছি, না চা আমায় খাচ্ছে?

মা গম্ভীরমুখে কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, নান্টু সত্যি তোর শনির দৃষ্টি লেগেছে মনে হচ্ছে। চা খেয়ে সোজা গলির মোড়ে চলে যা। দেখবি ওখানে শনি পুজো হচ্ছে। কিছু প্রণামী দিয়ে প্রণাম করে আয়।

মামা আশ্বস্ত হয়ে মাথা নেড়ে বললেন, রাইট, রাইট। তাই যাচ্ছি দিদি।...

পি-থ্রি বুড়ো

আমার ভাগ্নে ডন মহা ধড়িবাজ বিচ্ছু ছেলে। একেকসময় তার মাথায় একেকটা খেয়াল গজিয়ে ওঠে আর তার ধাক্কায় আমাকেই ভুগতে হয় শেষ পর্যন্ত। দুদিন থেকে দেখছি, শ্রীমানের মাথায় ঘুড়ি ওড়ানোর খেয়াল চেপেছে। ভয় হল ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে দৈবাৎ কিছু বিপদ না বাধিয়ে ফেলে।

কিন্তু ডনকে বারণ করা বৃথা। বারণ করলে তো আরও বেশি করেই তা করবে আর বাড়িসুদ্ধ লোককে দুর্ভাবনায় ভোগাবে।

সকালে জুতসই একখানা ভূতের গল্প লিখব বলে টেবিলে হুমড়ি খেয়ে বসে কলম বাগিয়ে ধরেছি সেই সময় ডন এসে কাগজে তার ক্ষুদে থাবা রাখল। বিরক্ত হয়ে বললুম, "আঃ, কী হচ্ছে ডন।"

ডন মুখে কিছু বলল না। অন্য হাতে খালি চোখ কচলাতে থাকল। এটাই তার কান্নাকাটি। অগত্যা গল্প লেখার চেষ্টা বাতিল করে কাগজ কলম যথাস্থানে রেখে বললুম, "প্রব্লেমটা কী রে?"

ডন আস্তে বলল, ঘুড়ি।"

"ঘুড়ি!" খাপ্পা হয়ে বললুম। "আমি কি পয়সার গাছ? কালই তো ঘুড়ির পয়সা দিলুম।"

ডন বলল, "ছিঁড়ে নিচ্ছে যে!"

"ছিঁড়ে নিচ্ছে? কে ছিঁড়ে নিচ্ছে তোর ঘুড়ি?" খুব তম্বি করে বললুম। "চালাকি করিসনে ডন। ওড়াতে না জানলে তো ঘুড়ি ছিঁড়বেই। ইলেকট্রিক তারে লেগে ছিঁড়বে। আন্টেনায় লেগে ছিঁড়বে। গাছের ডালে লেগে ছিঁড়বে।"

ডন একটু চটে গিয়ে বলল, "ইচ্ছে করে ছিঁড়ে নিচ্ছে যে। আমি বুঝি ঘুড়ি ওড়াতে জানিনে?"

"কে ছিঁড়ে নিচ্ছে?"

"পি-থ্রি বুড়ো।"

অবাক হয়ে বললুম, "পি-থ্রি বুড়ো! সে আবার কে রে? সে কেন তোর ঘুড়ি ছিঁড়ে নেবে? সে গাছ না পাখি? অ্যান্টেনা না ইলেকট্রিক তার?"

ডন আমার হাত খিমচে দিয়ে বলল, 'মামা! তুমি বড্ড বাজে বকো। ইংকিদের তেতলার ছাদে একটা ঘর আছে না?"

"হুঁ—আছে।" বলেই আমার মনে পড়ে এবং হেসে ফেললুম। "ও! তুই পি-থ্রি লেখা বিজ্ঞাপনের বোর্ডটার কথা বলছিস? তাই বল্।"

ডন আরেকটা খিমচি কেটে বলল, "ভ্যাট! ওখানে একটা বুড়ো লোক থাকে, তার কথা বলছি। যেমনি ঘুড়িটা ইংকিদের তেতলার ছাদের কাছে যাবে, লোকটা খপ করে ছিঁড়ে নেবে। ওত পেতে দাঁড়িয়ে থাকে, বুঝলে মামা? এই করে আমার পাঁচটা ঘুড়ি গচ্চা গেল।" বলে সে আবার চোখ কচলাতে থাকল।

ওর কথা শুনে লোকটার ওপর রাগ হল। কী আশ্চর্য! ছোট্ট ছেলেটা মনের

সুখে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে, ওর তা সইছে না? ছিঁড়ে নিচ্ছে বদমাইসি করে। উঠে বললুম, "কৈ চল তো দেখি।"

ডন বলল, "খালি খালি দেখবে কেমন করে? ঘুড়ি কিনে দাও, আমি ওড়াব— তবে তো দেখতে পাবে।"

ওর যুক্তি অস্বীকার করা যায় না। হাতে-নাতে না দেখে কীভাবে লোকটাকে দোষী সাব্যস্ত করব? বলতে গেলে তো আমাকেই পাঁচকথা শুনিয়ে ছাড়বে।

কাজেই ডনকে ঘুড়ির পয়সা দিলুম। সে চিক্কুর চেড়ে বলে গেল, 'তুমি ছাদে গিয়ে ওয়েট করো মামা! আমি এক্ষুনি আসছি।"

ছাদে গিয়ে দেখলুম, ডনের লাটাই পড়ে আছে। ছেঁড়া সুতো গুটিয়ে রাখতে ভোলেনি। ইংকিদের ছাদটা দেখতে লাগলুম। তেতলায় ছাদের কোনায় অ্যাজবেস্টস চাপানো একটা ছোট্ট ঘর। তার মাথায় পি-থ্রির বিজ্ঞাপনের বোর্ড আটকানো। ওদিকের বড় রাস্তা থেকে ওটা চোখে পড়ে। এবাড়ির আর ওবাড়ির মাঝখানে একটা ডোবা, মোষের খাটাল, টালির ঘর গোটাকতক, আর কিছু গাছ-গাছালি। ডোবার পাড় দিয়ে গলির রাস্তাটা গিয়ে বড়রাস্তায় মিশেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ লক্ষ্য রেখেও ওই ছাদের আনাচে-কানাচে জনপ্রাণীটি দেখলুম না। তবে একটা কাক কী একটা জিনিস মুখে করে কার্নিসে গিয়ে বসেই যেন তাড়া খেয়ে উড়ে গেল। তাহলে বুড়ো লোকটি সম্ভবত ঘরের ভেতরেই আছে।

ডন ধুপধুপ শব্দে সিঁড়ি বেয়ে ঘুড়ি হাতে এসে গেল। বললুম, "কৈ, এবার ওড়া তো, দেখি কে তোর ঘুড়ি ছিঁড়ে নিচ্ছে!"

ইংকিদের বাড়িটা উত্তর-পূর্ব কোণে। বাতাসের গতিও ওই দিকে। তাই ডনের ঘুড়ি কয়েক মিনিটের মধ্যে পি-থ্রি বোর্ডের কাছে পৌঁছে গেল। ছোট্ট ঘরটার ওপর অন্তত বিশফুট উঁচুতে ঘুড়িটা পাক খাচ্ছিল। হঠাৎ দেখি, ঘরের জানালা দিয়ে একটা হাত বেরুল। তারপর খপ করে সুতো ধরে ফেলল। ডন আকাশ-চেরা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "মামা! মামা!"

আমিও বাজখাঁই চেঁচিয়ে উঠলুম, "এই! এই!"

কিন্তু তাতে কোন কাজ হল না। হাতটা ঘুড়ির সুতো ছিঁড়ে দিব্যি ঘুড়িটাকে নামিয়ে এবং টেনে জানালায় ঢোকাল। রাগে খাপ্পা হয়ে বললুম, "আয় তো দেখি। মজা দেখিয়ে ছাড়ছি ব্যাটাচ্ছেলেকে।"

ইংকিরা বাড়ির নিচের তলাটা এক মারোয়াড়ি ব্যবসায়ীকে ভাড়া দিয়েছে। তিনি নিচের ঘরগুলোকে গোডাউন করেছেন। দোতলায় থাকে ইংকিরা। গিয়ে দেখলুম, নিচের তলায় তালাচাবি ঝুলছে। দোতলায় উঠে দেখলুম, সেখানেও তালাচাবি। ইংকিরা নেই। তেতলায় ফ্ল্যাটের দরজা ভেতরে থেকে বন্ধ, আর কপাটে লেখা আছে; কুকুর আছে, সাবধান।'

কুকুরকে আমি বেজায় ভয় পাই। কিন্তু কুকুরটার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। সিঁড়ি দিয়ে সোজা ছাদে উঠে গেলুম। তারপর সেই ছোট্ট ঘরের সামনে গিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়ালুম। ঘরটার দরজার কপাট আটকানো আছে বটে, কিন্তু কপাটদুটো ভাঙা এবং দুটো কপাটই দুপাশে হেলে পড়েছে। মধ্যিখানে মাকড়সার

জাল! উঁকি মেরে দেখি, ভেতরে, রাজ্যের ভাঙাচোরা আসবাব ছড়ানো। জানলার কপাটও ভাঙা। সেখানেও উঁকি মেরে দেখলুম। ও ঘরে কোনো জনমানুষ বাস করে না।

কিন্তু তার চেয়ে অবাক কাণ্ড সদ্য ছিঁড়ে নেওয়া ঘুড়িটা সুদ্ধু ডনের মোট্ট ছ'খানা ঘুড়িই ভেতরে ভাঙাচোরা আসবাবের ওপর পড়ে রয়েছে।

কিছু বোঝা গেল না ব্যাপারটা। চাপা গলায় ডনকে বললুম, "দরজার ফাঁক গলিয়ে তুই ঢুকে যা। ঘুড়িগুলো তো আগে উদ্ধার করা যাক।"

ডন দরজার ভাঙা কপাটের ফাঁকে দিব্যি গলে গেল। তারপর ছখানা ঘুড়িই উদ্ধার করে হাসিমুখে বেরিয়ে এল।

তবে তার চেহারাটি এবার ভূতের মতোই হয়েছে। ঝুলকালি মেখে সে এক বিচ্ছিরি অবস্থা। দুজনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে তেতলার ফ্ল্যাটের দরজার সামনে এসেছি, এমন সময় দরজা খুলে গেল। এক বেঁটে গোলগাল চেহারার ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ দৃষ্টে তাকিয়ে বললেন, "কী চাই?"

কুকুরের ভয়ে চলে আসতে পারলে বাঁচি। তাই ঝটপট বললুম, "ছাদে ঘুড়ি আটকে ছিল তাই—"

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, "আপনারা ছাদে গিয়েছিলেন? আপনাদের সাহস তো কম নয় মশাই!"

কাঁচুমাচু মুখে বললুম, "না—না। অন্য কোনো মতলবে যাইনি। দেখছেন না? এই ঘুড়িগুলো আমার ভাগ্নের।"

ভদ্রলোক ফিক করে হেসে বললেন, "খুব বেঁচে এসেছেন মশাই! ভাগ্যিস মামা-ভাগ্নে মিলে দুজনে ছিলেন তাই, একা গেলে এতক্ষণে মড়া হয়ে পড়ে থাকতেন?"

"সে কি! কেন বলুন তো?"

এই সময় এতক্ষণ পরে কুকুরের গর্জন শোনা গেল ভেতরে। ভদ্রলোক একবার ঘুরে কুকুরটার উদ্দেশে বললেন, "চুপ কর টার্জান! এরা মানুষ!"

বলে আমাদের দিকে ঘুরলেন হাসিমুখে। "আর কক্ষনো ছাদে যাবেন না। আর খোকা, তুমিও সাবধান। ঘুড়ি ছিঁড়েছে তোমার ভাগ্যি। বাগে পেলে মুণ্ডুটি ছিঁড়ে নিত যা পাজি ব্যাটাচ্ছেলে।"

বললাম, "আপনি কার কথা বলছেন?"

"যে ঘুড়ি ছিঁড়ে নেয়।"

"কে সে?"

ভদ্রলোক খাপ্পা হয়ে বললেন, "ধুর মশাই! কুকুর পুষেছি কেন তাও বুঝলেন না? যাকগে আমার কী? সাবধান করে দিলুম। ঠেলা টের পাবেন কথা না শুনলে।"

ডনের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলুম, সে ঘুড়ি ওড়াবে আর আমি আগে থেকে গিয়ে ইংকিদের ছাদে ওত পেতে থাকব। লোকটিকে ডন অবশ্য দেখেছে। সে নাকি এক বুড়ো। যাইহোক তার মুখোমুখি একটু বোঝাপড়া করে নিতেই হবে। ভূতের গল্প লিখি বটে। কিন্তু ভূত বিশ্বাস করি না। দেখাই যাক না, সত্যি সত্যি ভূত আছে

নাকি এবং তার ব্যাপার স্যাপারই বা কী। বেগতিক দেখলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব বরং। দিন দুপুরে ভূতের পক্ষে ঘুড়ি ছিঁড়ে নেওয়া সম্ভব হলেও আমার মুণ্ডু ছিঁড়ে নিতে সাহস পাবে বলে মনে হয় না।

চুপি চুপি গিয়ে ছাদের ঘরটার দেয়াল ঘেঁষে বসে রইলুম। ডনের ঘুড়িটা তরতর করে এগিয়ে আসছিল। ঘরটার মাথায় পৌঁছুতেই দেখি জানালার ফাঁক গলিয়ে একটা হাত বেরুচ্ছে। বুকটা ধড়াস করে উঠল। কিন্তু হাতটা কিছুতেই ঘুড়ির সুতোর নাগাল পেল না। ডনও মহা ধড়িবাজ ছেলে। ধরতে গেলেই ঘুড়িটা পাক খাইয়ে নাগাল থেকে সরিয়ে নিচ্ছে।

একটু পরে দরজার কপাটের ফাঁক গলিয়ে সত্যিই এক বুড়ো ঢ্যাঙা গড়নের লোক বেরুলো। একটু শুঁটকো চেহারা কোথাও দেখিনি। তাকে দেখে দূরের ছাদ থেকে ডন চিক্কুর ছাড়ছিল, "মামা! মামা! বেরিয়েছে।"

আমি তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, "এই যে মশাই।"

অমনি বুড়ো লোকটি চমকে উঠল। সে আমাকে দেখার আশাই করেনি। দেখামাত্র জিভ কেটে "সরি" বলে সুড়ুৎ করে কপাটের ফাঁক গলিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। দরজার সামনে গিয়ে বললুম, "শুনুন! শুনুন! আপনার সঙ্গে কথা আছে।"

কিন্তু আর কোনো সাড়াই পেলুম না। উঁকি মেরেও তাকে আর দেখতে পেলুম না। তবে দেয়ালের কোনায় একটা প্রকাণ্ড টিকটিকি কুতকুতে নীল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। দেখামাত্র আবার বুকটা ধড়াস করে উঠল। আর এক মুহূর্ত ওখানে থাকার সাহস হল না। সবেগে পালিয়ে এলুম।

যাই হোক, তারপর আর ডনের ঘুড়ি ছেঁড়া যায় নি। পি-থ্রি বুড়ো নিশ্চয় বড্ড লজ্জা পেয়েছিল। তাই আমি বা ডন আর ওকে নিয়ে মাথা ঘামাইনি।...

যেখানে কর্নেল

হরিচরণ এবং হরদয়ালের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল মাদ্রাজ মেলের ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেন্টে। আমার বৃদ্ধ বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকার গায়ে পড়ে লোকের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারেন বটে! সারাটা রাত্তির গল্প করতে করতেই কাটিয়ে দিলেন।

ট্রেন জার্নিতে ঘুমনো আমার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। তার ওপর ওই বকবকানি আর মাঝে-মাঝে কর্নেলের হা-হা-হা-হা বিকট অট্টহাসি। কেন হাসছেন, গল্পটাই বা কী, ওপরের বার্থে শুয়ে একটুও ঠাহর হচ্ছিল না আমার। তার চেয়ে বিকট হাসি হরদয়াল নামে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লোকটির! বিকটই বলছি। কারণ, নাদুসনুদুস গড়নের মধ্যবয়সী এবং প্রচণ্ড গুঁফো কোনও লোকের কণ্ঠস্বর যে অমন মেয়েলি আর ভুতুড়ে হতে পারে, কস্মিনকালে শুনিনি। ভুতুড়ে বলারও কারণ আছে। ভূত-পেরেত নাকি খোনা গলায় কথাবার্তা বলে। হরদয়ালবাবু যদি আড়াল থেকে কথাবার্তা বলেন, দিন-দুপুরেও রীতিমত সাহসী লোককেও আঁতকে উঠতে হবে।

হরিচরণবাবু দেখছিলুম একেবারে উলটো। কথাবার্তা বলছিলেন কম। গড়ন বা চেহারায়, তা ছাড়া পোশাকেও তাঁর সঙ্গীর একেবারে উলটো। লম্বাটে শক্তসমর্থ গড়নের লোক। চিবুকে কুচকুচে কালো দাড়ি এবং দু'পাশে জাঁকালো জুলপি। পরনে প্যান্ট শার্ট। তাঁর কণ্ঠস্বরটিও বেশ গম্ভীর।

প্রথম আলাপেই জানতে পেরেছিলুম আমাদের মতো ওঁদেরও গন্তব্য গোপালপুর-অন-সি। কলকাতার চৌরঙ্গি এলাকায় 'হরিহর এন্টারপ্রাইজেস প্রাইভেট লিমিটেড' নামে দুজনে মিলে একটি কোম্পানি গড়েছেন। আমদানি-রপ্তানি কারবার করেন। কারবারি জীবনের একঘেয়েমি কাটাতে মাঝে-মাঝে কয়েক দিনের জন্য বেরিয়ে পড়েন। মাদ্রাজ মেল চিল্কা স্টেশনে পৌঁছতে সূর্য উঠিয়ে ছাড়ল। তখন কর্নেলের তাড়ায় আপার বার্থ থেকে নেমে এলুম। হরিচরণবাবুও ওপাশের আপার বার্থ থেকে নামলেন। একটু পরে চা খেতে-খেতে হরিচরণবাবু কর্নেলকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা উঠছেন কোথায়?"

কর্নেল একটু হেসে বললেন, "কিছু ঠিক করে আসিনি। শুনেছি গোপালপুর-অন-সি'তে ট্যুরিস্টদের চেয়ে নাকি হোটেল বা লজের সংখ্যা বেশি। এও শুনেছি, ওখানে সমুদ্রতীরও নাকি বেশ নির্জন আর খোলামেলা।"

হরদয়ালবাবু তাঁর ভুতুড়ে গলায় হিঁ হিঁ করে হেসে বললেন, "অপূর্ব। অপূর্ব! আমরা তো মশাই প্রতি বছর পুজোর ঠিক পরেই ওখানে যাই। বুঝলেন না? কারবারি মগজ ঠাণ্ডা করার জন্য এমন সি-বিচ আর পাব কোথায়?

হরিচরণবাবু বললেন, "সি-ভিউ হোটেলে উঠতে পারেন। আমাদের সঙ্গে মালিকের খুব চেনাজানা আছে। তা ছাড়া এখন নভেম্বরে সব হোটেল তো খালিই পড়ে থাকে। ট্যুরিস্ট সিজন শুরু হবে ডিসেম্বর থেকে।"

হরদয়ালবাবু মাথা দোলালেন। "হ্যাঁ, সি-ভিউ নতুন হোটেল। একেবারে মডার্ন ব্যবস্থা। সায়েব-টুরিস্টরা এলে দেখেছি ওখানেই ওঠেন।"

বহরমপুর স্টেশনে পৌঁছতে আটটা বেজে গেল। ট্রেন বেশ খানিকটা লেট করেছে। চারজনে মিলে একটা প্রাইভেট কার ভাড়া করে গোপালপুর-অন-সি'তে পৌঁছতে মাত্র আধঘণ্টা লাগল। মাইল পঁয়ত্রিশেক দূরত্ব। সি-ভিউ হোটেলটি সত্যিই সুন্দর। ম্যানেজার ভদ্রলোক অত্যন্ত অমায়িক আর আলাপী মানুষ। হরিচরণবাবু আর দয়ালবাবুর সঙ্গে ওঁর ভালরকম চেনা-জানা। চারতলা হোটেলের চারতলাতেই একটি স্যুইট পেয়ে গেলুম আমরা। দক্ষিণ-পূর্ব কোণের স্যুইটটির নম্বর চার। তারই উল্টো দিকে উত্তর-পূর্ব কোণে তিন নম্বর স্যুইটটি হরিচরণবাবু তদ্বিরেই আমাদের ভাগ্যে জুটল। এক মন্ত্রীমশাই নাকি হঠাৎ এসে পড়ার আভাস পাওয়া গেছে। তাই ম্যানেজার একটু ইতস্তত করছিলেন। শেষে হরিচরণবাবু রফা করে দিলেন, যদি সত্যিই মন্ত্রীমশাই এসে পড়েন, আমরা অন্য একটি স্যুইটে চলে যাব। হোটেল তো এখন প্রায় ফাঁকা। চারতলার মোট বারোটা স্যুইটের মধ্যে গোটা পাঁচেক সুইট ভর্তি আছে।

চারতলার চার নম্বর স্যুইটটি হরিচরণ-হরদয়ালের কলকাতা থেকে বুক করা ছিল। দুই বন্ধু মিলে সেটিতে ঢুকলেন। তিন নম্বরে ঢুকলাম আমরা। ব্যালকনিতে গিয়ে অভ্যাসমতো কর্নেল চোখে বাইনোকুলার রেখে সম্ভবত সামুদ্রিক পাখপাখালি খুঁজতে থাকলেন। আমি দেখতে থাকলুম সমুদ্র। সমুদ্রের বুকে প্রকাণ্ড সব কালো-কালো

পাথর মাথা তুলে আছে। সেইসব পাথরের সঙ্গে সমুদ্র যেন খেলা করছে। মাঝে-মাঝে সেগুলোর ওপর এসে আছড়ে পড়ছে। ডুবিয়ে দিচ্ছে। আবার সরে যাচ্ছে। কর্নেলের মতোই হা-হা করে সমুদ্র হেসে উঠছে আর ফেনাগুলো যেন কর্নেলেরই সাদা দাড়ি।

ভাবলুম, এই লাগসই উপমাটি ওঁকে শুনিয়ে দিই। কিন্তু উনি বাইনোকুলার নামিয়ে রেখে গম্ভীর মুখে বললেন, "জয়ন্ত, তুমি তো একজন সাংবাদিক। ওদের সম্পর্কে তোমার কাগজে কিছু লেখা উচিত।"

অবাক হয়ে বললুম, "কাদের সম্পর্কে?"

"এখানকার মৎস্যজীবীদের", কর্নেল দুঃখিত মুখে বললেন, "দূরের সমুদ্রে জলটা তত অশান্ত নয়। সেখানে মাছও প্রচুর। কিন্তু লক্ষ্য করো, বিচের কাছাকাছি অনেকটা দূর পর্যন্ত সমুদ্রের কী সাংঘাতিক অবস্থা! ভেবে দ্যাখো, জয়ন্ত, ছোট্ট সব নৌকো নিয়ে এই অংশটা পেরোতে বেচারাদের কী লড়াই না করতে হয়! প্রতিদিন ওরা এই লড়াই করে তবে সামান্য কিছু মাছ ধরতে পারে। ফেরার সময় আবার সেই লড়াই। তাছাড়া দেখতেই পাচ্ছ, সমুদ্রে কতসব পাথরও মাথা উঁচিয়ে আছে। দৈবাৎ ধাক্কা লাগলে নৌকো ভেঙে গুঁড়িয়ে তো যাবেই, ওরাও বাঁচবে না! ওদের এই প্রচণ্ড জীবনসংগ্রামের কথা তোমার লেখা উচিত ডার্লিং। আমরা ডাইনিং টেবিলে বসে যখন বিশেষ-বিশেষ সামুদ্রিক মাছের সুস্বাদ নিয়ে প্রশংসা করি, তখন কি চিন্তা করে দেখি যে..."

আমার বৃদ্ধ বন্ধুর সারগর্ভ ভাষণে বাধা পড়ল দরজার কলিং-বেলের বাজনায়। গিয়ে দরজা খুলে দেখি, হরিচরণবাবু, একেবারে সমুদ্রস্নানের জন্য তৈরি হয়ে আমাদের ডাকতে এসেছেন। বললেন, "আসুন কর্নেল, সমুদ্রস্নান করে খিদে চাঙ্গা করা দরকার, নইলে ব্রেকফাস্ট জমবে না। জয়ন্তবাবু দেরি করবেন না! পোশাক বদলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। বাই দা বাই আপনারা বাথ-স্যুট সঙ্গে এনেছেন তো? এখানে সমুদ্র কিন্তু বিপজ্জনক।"

কর্নেল একটু হাসলেন, "বাথ-স্যুটের দরকার হবে না হরিচরণবাবু! কারণ, এ-বেলা আমি সমুদ্রে নামছি না। তবে জয়ন্তের কথা আলাদা। ইয়াংম্যানরা সমুদ্রের সঙ্গে লড়তে ভয় পায় না। কী বলো ডার্লিং?"

ঝটপট বললুম, "আমার একটুতেই ঠাণ্ডা লেগে যায়।"

হরিচরণ হাসতে হাসতে বললেন, "সমুদ্রের জলে ঠাণ্ডা লাগার ভয় নেই। আসুন না, নুলিয়া পাওয়া যাবে। পুরীর সমুদ্রে কি কখনও স্নান করেননি?"

আমাকে টেনে ঘর থেকে বের করলেন হরিচরণবাবু। টের পেলুম, ভদ্রলোকের গায়ের জোর আছে বটে! কর্নেলও বেরোলেন। করিডোরে দাঁড়িয়ে বললেন, "হরদয়ালবাবু স্নান করতে যাবেন না? নাকি আমার মতোই জলকাতুরে মানুষ?"

হরিচরণবাবু বললেন, "যা বলছেন! ওকে টেনে ওঠাতে পরলুম না বিছানা থেকে। দাঁড়ান, আবার চেষ্টা করে দেখি।"

উল্টোদিকে চার নম্বর স্যুইটের দরজা উনি ফাঁক করে ডাকলেন, "হর, ও হর, স্নান না-ই বা করলে। অন্তত বিচে বসে আমাদের স্নান করা দেখবে। সমুদ্র দেখলে খিদে বাড়বে হে, রাক্ষসের মতো খেতে পারবে!"

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলুম, খাটে হরদয়ালবাবু চিত হয়ে শুয়ে আছেন। মাথার ওপর একটা হাত। এই অবস্থায় শুয়ে থেকেই সেই ভুতুড়ে কণ্ঠস্বরে বললেন, "আরে

ট্রেন-জার্নির ধকল সামলে নিতে দাও আগে। বরং দুপুরের দিকে দেখব।"

হরিচরণ সহাস্যে বললেন, "তুমি তো বরাবর এখানে এসে আগে স্নান না করে ব্রেকফাস্ট করতে না। এবার হলটা কী?" বলে কর্নেলের দিকে ঘুরলেন। "আমার ফ্রেন্ড, বুঝলেন তো, বড্ড খামখেয়ালি! গত বছর ও আমাকেই টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ছেড়েছিল। সত্যি বলতে কী, এখানকার সমুদ্রকে আমারও বড্ড ভয় করত। ওর পাল্লায় পড়েই সে-ভয়টা কেটে যায়।"

কর্নেল ডাকলেন, "হরদয়ালবাবু কি অসুস্থ বোধ করছেন? ও হরদয়ালবাবু!"

হরদয়াল সেইরকম মেয়েলি এবং খোনা গলায় জবাব দিলেন, "আরে না, না, আপনারা যান না, আমি দুপুরে স্নান করবখন।"

হরিচরণ রাগ করে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে বললেন, "ছেড়ে দিন। ও বরাবর ওইরকম একগুঁয়ে!"

হোটেল থেকে বেরিয়ে সি-বিচে নামার সময় কর্নেল বললেন, "হরদয়ালবাবুর টনসিলের গণ্ডগোল আছে। কাল রাত্রে সে নিয়ে আলোচনা করছিলুম। উনি বললেন, দুবার অপারেশন করিয়েও কিছু হয়নি।"

হরিচরণ বললেন, "আসল গণ্ডগোল থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে। ডাক্তারদের মতে, ওই গ্ল্যান্ডে অপারেশন না করলে গলার স্বর বদলাবে না, তাছাড়া ক্রমশ বডিটাও আরও মোটা হয়ে যাবে। কিন্তু সার্জারিতে হর'র বড্ড আতঙ্ক। দুবার যে টনসিল অপারেশন করিয়েছিল, সে একরকম আমারই চেষ্টায়। বড্ড জেদি ও।"

সমুদ্রের বিচ ভাটার সময়ও তত কিছু চওড়া নয়। খানিকটা ঢালুও। আমাকে টানাটানি করে হরিচরণ সমুদ্রে নামাতে পারলেন না। কর্নেল বিচে বসে বাইনোকুলারে লাইটহাউস কিংবা অন্য কিছু দেখতে থাকলেন। হরিচরণ ভাল সাঁতারু নিঃসন্দেহে। একদল কাচ্চাবাচ্চাও ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাঁতার কাটতে থাকল। ছোট্ট ছেলেমেয়েগুলো মৎস্যজীবী বস্তির। এখন থেকেই ওরা এমনি করে এই সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই শুরু করে। ভবিষ্যতের বড় লড়াইয়ের জন্য তৈরি হয়। কর্নেল ঠিকই বলেছেন, এদের কথা 'দৈনিক সত্যসেবক' পত্রিকায় আমার লেখা উচিত।

কিছুক্ষণ পরে কর্নেল সবে উঠে দাঁড়িয়েছেন, বিচের ওপরদিকের বালিয়াড়ি থেকে প্রায় আছাড় খেতে খেতে নেমে এলেন সি-ভিউ হোটেলের সেই ম্যানেজার ভদ্রলোক। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, সর্বনাশ হয়েছে স্যার! হরদয়ালবাবু খুন হয়েছেন।" বলে সাঁতারু হরিচরণের উদ্দেশে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত রোগীর মত হাত ছোড়াছুড়ি এবং লম্ফঝম্ফ করে ডাকাডাকি করতে লাগলেন।

কর্নেল তৎক্ষণাৎ হন্তদন্ত হয়ে বালিয়াড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। বালিয়াড়ি দিয়ে ওঠার সময় তাঁর টুপি খসে পড়ল। প্রশস্ত টাকটি ঝকঝক করে উঠল। কিন্তু টুপির দিকে মনই দিলেন না। অদৃশ্য হয়ে গেলেন বালিয়াড়ির ওধারে।

এতক্ষণে আমার মাথায় ঘিলু চাঙ্গা হল এবং আমিও দৌড়ে চললুম। বালিয়াড়ির খাঁজ থেকে কর্নেলের টুপিটি কুড়িয়ে নিয়ে গেলুম।

হরদয়ালবাবুর মাথার পেছনে গুলি করা হয়েছিল। হোটেলের পরিচালক গোবিন্দরাম আমরা বেরিয়ে আসার আন্দাজ মিনিট পনেরো পরে জিজ্ঞেস করতে যায়, ব্রেকফাস্টে কী

কী খাবেন বাবুরা। দরজায় তালা দেওয়া ছিল না। প্রথমে সে কলিং বেলের বোতম টেপে। তারপর সাড়া না পেয়ে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে। সে হরিচরণকে বেরোতে দেখেছিল। কাজেই সে জানত, হরদয়ালবাবু ভেতরে আছেন। বাথরুমে আছেন ভেবেই সে অপেক্ষা করছিল। শেষে অধৈর্য হয়ে দরজা খোলে এবং হরদয়ালবাবুকে চিত হয়ে শুতে থাকতে দ্যাখে। বাবুর সাড়াশব্দ না পেয়ে তার সন্দেহ হয়। তখন সে ওঁর দিকে ঝুঁকে কপালে হাত রাখে। কপাল ভীষণ ঠাণ্ডা ছিল। তারপর তার চোখে পড়ে বালিশের ওপর রক্তের ছোপ। মাথার পেছন দিকটা থেকে সামান্য একটু রক্ত গড়িয়ে এসে বালিশে ছোপ ফেলেছিল।

পুলিশ এসে যথারীতি মৃতদেহ বহরমপুর শহরের মর্গে নিয়ে গেল। সবাইকে তন্নতন্ন জেরা করে বিবৃতিও লিখে নিয়ে গেল। হরিচরণ বন্ধুর শোকে কাঁদতে-কাঁদতে পুলিশের গাড়িতে বহরমপুর চলে গেলেন। সেখান থেকে ট্রাংকল করে হরদয়ালের আত্মীয়স্বজনকে খবর দেবেন।

হরিচরণের মুখেই আমরা জানতে পেরেছিলুম, হরদয়ালের অ্যাটাচিকেসে প্রচুর টাকা ছিল। সেটা উধাও হয়ে গেছে।

পুলিশের গাড়িতে উনি চলে যাওয়ার পর আমাদের স্যুইটে ফিরে কর্নেলকে বললুম, "আপনার সঙ্গে আর কোথাও যাচ্ছি না। যেখানে আপনি, সেখানেই খুনখারাপি। ব্যাপারটা কী?"

কর্নেল একটা চাপা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "ব্যাপার তত কিছু গুরুতর নয়।"

অবাক হয়ে বললুম, "গুরুতর নয়? কী বলছেন! যে-হোটেলে এভাবে খুনে চোর-ডাকাত ঢোকে, সেই হোটেলে আমার আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না!"

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, "সাড়ে-এগারোটা বাজে। ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়নি। চলো, দেখি, ক্যান্টিনে একটু সকাল-সকাল লাঞ্চ পাওয়া যায় কি না।"

সূর্যাস্তের পরও কর্নেল ও আমি সি-বিচে গিয়ে বসে আছি, সেই সময় পিছনের বালিয়াড়িতে কয়েকটি ছায়ামূর্তি ভেসে উঠল। ডান দিকে বিচের মাথায় কতকগুলো পাথরের ভাঙাচোরা বাড়ি। খুব পুরনো আমলের বাড়ি। ছায়ামূর্তিগুলো বালিয়াড়ি থেকে সোজা না নেমে সেই ভাঙা বাড়িগুলোর ভেতর ঢুকে পড়ল। অমনি ভয় পেয়ে চাপাস্বরে বলে উঠলুম, "কর্নেল, নির্ঘাত চোর ডাকাতের দল!"

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, "আমরা তো ব্যবসায়ী নই। টাকাকড়ি-ওয়ালাও নই। চোর-ডাকাত লোক চেনে ডার্লিং!

"তাহলে ওরা কারা?"

"যারাই হোক, আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।"

একটু পরে সমুদ্রের ভেতর থেকে লাফ দিয়ে উঠল ঝলমলে এক বিশাল লাল-হলুদ রঙের গোলা। ওটা যে চাঁদ, বুঝতে সময় লাগল। তারপর পিছন থেকে কে গম্ভীর স্বরে বলে উঠল, "কর্নেলসায়েব নাকি?"

কর্নেল ঘুরে বললেন, "হরিচরণবাবু? আসুন, আসুন। কখন ফিরলেন বহরমপুর থেকে?"

"এইমাত্র," বলে হরিচরণ এসে আমাদের পাশে বসলেন।

কয়েক মিনিট চুপচাপ থাকার পর ফোঁস ফোঁস করে নাক ঝেড়ে ভাঙাগলায় বললেন,

"আপনি কী বলবেন বলছিলেন, তাই চলে যাওয়ার আগে দেখা করতে এলুম।"

কর্নেল আমাকে ভীষণ চমকে দিয়ে বললেন, "আচ্ছা হরিচরণবাবু, আপনি কি প্রেতাত্মা বিশ্বাস করেন?"

হরিচরণও চমক-খাওয়া গলায় বললেন, "কেন বলুন তো?"

কর্নেল বললেন, "আমি অকেনদিন যাবৎ তন্ত্রসাধনা করেছি। প্রেতাত্মাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে। আপনার বন্ধু হরদয়ালবাবুর আত্মার সঙ্গে যদি আপনি বাক্যালাপ করতে চান করতে পারেন। ডাকব তাঁকে?"

হরিচরণ বললেন, "এ-কথা বলতেই ডেকেছিলেন কি?"

কর্নেল জবাব না দিয়ে ডাকলেন, "হরদয়ালবাবু, আপনার বন্ধু এখানে উপস্থিত আছেন। কিছু বলার থাকলে বলুন ওঁকে।"

সামনে সমুদ্রের প্রচণ্ড আলোড়ন এবং সেই আলোড়নের মধ্যে ফিকে জ্যোৎস্নার রঙ দুলছে। ঝকমক করছে। যেন এক বিশাল অলৌকিক দৃশ্যের সামনে বসে আছি। আর সেই অলৌকিকতাকেও তুচ্ছ করে দিয়ে ভেসে এল হরদয়ালবাবুর ভুতুড়ে কণ্ঠস্বর, "কী হরি, এখনও কী করছ এখানে? শিগগির কলকাতা চলে যাও। আমার তো ছেলেপুলে নেই। এখন তোমারই সব। হরিহর এন্টারপ্রাইজের একচ্ছত্র মালিক হতে অসুবিধেও নেই।"

হরিচরণ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই চালাকির অর্থ কী?"

কথাটা বললেন কর্নেলকে। জবাল এল হরদয়ালের প্রেতাত্মার কাছ থেকে। "চালাকি তুমিও কম জানো না হরি, ও কী পালাচ্ছ কেন? আরে শোনো, শোনো।"

হরিচরণ সত্যি পালাচ্ছিলেন। আমি তো হতভম্ব হয়ে বসে আছি। হঠাৎ ডান দিকের সেই ভাঙা পাথুরে বাড়িগুলো থেকে একঝাঁক টর্চের আলো এসে পড়ল এবং একদল ছায়ামূর্তি ঘিরে ধরল হরিচরণকে। তখন বুঝতে পারলুম, সেই ছায়ামূর্তিগুলো পুলিশ। হরিচরণকে গ্রেফতার করছে।

কর্নেল বললেন. "কী ডার্লিং, বোবা হয়ে গেলে যে?"

বললুম, "কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না।"

কর্নেল হাসলেন, "স্রেফ ভেন্ট্রিলোকুইজিম! আমি এই স্বর-জাদু বিদ্যাটি সম্প্রতি শিখেছি। যাই হোক, হরদয়ালের মাথার পিছনে সাইলেন্সার-লাগানো পিস্তল দিয়ে গুলি করে মেরে হরিচরণ ওঁকে বিছানায় শুইয়ে রেখেছিল। আমরা ওঁদের স্যুইটের দরজার ফাঁক দিয়ে ওঁকে দেখেছিলুম ঠিকই। তখন আসলে উনি মৃত। কিন্তু এই হরিচরণ ভেন্ট্রিলোকুইজিমে খুব পাকা। বিশেষ করে হরদয়ালবাবুর টনসিলের ত্রুটি থাকায় হরিচরণের সুবিধে হয়েছিল। আমাদের সাক্ষী রাখতে চেয়েছিল যে, হোটেল থেকে বিচে আসার সময় আমরা হরদয়ালকে জীবিত দেখেছি, কারণ, ওঁর কথাবার্তা শুনেছি।"

সবকিছু আমি দেরিতে বুঝি। ঝটপট বললুম "বুঝেছি, বুঝেছি।"

কর্নেল বললেন, 'এখনও সবটা বোঝনি। গতরাত্রে ট্রেনে হরদয়ালবাবুর সঙ্গে কথাবার্তার সময় জানতে পেরেছিলুম হরিচরণ একসময় ম্যাজিসিয়ান ছিল। আর আজ সকালে সমুদ্রস্নানে সে এসেছিল পিস্তলটা সমুদ্রে ফেলতে।"

টাক এবং ছড়ি রহস্য

কাকতালীয় যোগ

সেদিন সকালে আমার প্রাজ্ঞ বন্ধু স্বনামধন্য কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের ডেরায় ঢুকে আমি অবাক। একটি ছোট্ট ডিমালো আয়না মুখের ওপর তুলে উনি নিজের বিশাল টাকটি খুঁটিয়ে দেখছেন। বললেন, 'এস ডার্লিং! তোমার কথাই ভাবছিলুম।'

বললুম, 'টাকের সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক?'

'আছে।' কর্নেল আয়নাটি টেবিলে রেখে একটু হাসলেন। 'কারণ একটি বিজ্ঞাপন। যেটি তোমাদেরই দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় সম্প্রতি বেরিয়েছে। পড়ে দেখতে পারো।'

উনি একটা বিজ্ঞাপনের কাটিং এগিয়ে দিলেন। পড়ে দেখি বেশ মজার একটা পদ্য।

টাক। টাক।। টাক।
ট্রাই ইওর লাক্
যদি থাকে দাড়ি
সুফল তাড়াতাড়ি

ইন্দ্রোদ্ধার দৈব চিকিৎসালয়,
১১১/১ পি, খাঁদু মিস্তিরি লেন,
কলকাতা ১৩। বিঃদ্রঃ—আগে টাক পরীক্ষা করিয়া তবে ভর্তি। ২৪ ঘণ্টা সময় লাগিবে। দরাদরি নিষিদ্ধ।

বললুম, 'ইন্দ্রোদ্ধারটা বোঝা যাচ্ছে না তো?'

কর্নেল বললেন, 'ইন্দ্র মানে কলো চুল। তাই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে টাক পড়াকে ইন্দ্রলুপ্ত বলা হয়।'

'কিন্তু হঠাৎ টাক নিয়ে আপনি চিন্তিত কেন? এতদিন তো টাককে জ্ঞানী ও দার্শনিকদের লক্ষণ বলে খুব গালভরা বুলি আওড়েছেন। আজ আবার—'

'কাক।' কর্নেল বিমর্ষমুখে বললেন। ''কাকের অত্যাচারে, জয়ন্ত। টাকের সঙ্গে কাকেরও গূঢ় সম্পর্ক আছে।'

ষষ্ঠীচরণ ট্রেতে কফি আনছিল। কথাটা শুনে গম্ভীর মুখে বলল, 'এতবার করে মনে পড়িয়ে দিই, ছাদে যাবার সময় কেপ পরে যান। বাবামশাই তবু কথা কানে করবেন না। কাকের দোষটা কী?'

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে তাকালে ষষ্ঠী ট্রে রেখে কেটে পড়ল। ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম। ছাদের বাগানে গিয়ে আবার কাকের ঠোক্কর খেয়েছেন। তবে বাগান না বলে জঙ্গল বলাই ভাল। যতরাজ্যের বিদঘুটে গড়নের ক্যাকটাস, উদ্ভুট্টে সব অর্কিড আর দুর্লভ প্রজাতির ঝোপ-ঝাড়। পাশের বাড়ির গা-ঘেঁষে ওটা বুড়ো নিমগাছটা সম্ভবত কলকাতার কাকদের রাজধানী। তাড়ানোর জন্য একবার পটকা ছুঁড়ে নাকি মামলা বাধার উপক্রম হয়েছিল। কফিতে চুমুক দিয়ে বললুম, 'ষষ্ঠী ঠিক বলেছে। আপনার টাককে কাকেরা পাকা বেল-টেল ভাবে। অবশ্য বেল পাকলে কাকের কী বলে একটা কথা চালু আছে।'

কর্নেল কফির সঙ্গে চুরুটও টানেন। জ্বেলে নিয়ে ধোঁয়ার ভেতর বললেন, 'বেল কেন? তালের সঙ্গেও কাকের সম্পর্কে জুড়ে দিয়ে একটা কথা চালু আছে।'

ঝটপট বললুম 'জানি। কালতালীয় যোগ। কাক এসে তালগাছে বসল, সেই মুহূর্তে একটা পাকা তাল খসে পড়ল। নিছক আকস্মিক যোগাযোগ। লোক যদি ভাবে কাকের সঙ্গে তাল পড়ার সম্পর্ক আছে, তাহলে সেটা বোকামি।'

'ডার্লিং, প্রাচীন ন্যায়শাস্ত্রে কাকতালীয় ন্যায় নিয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা আছে।' কর্নেল সায় দেবার ভঙ্গিতে বললেন। 'যাই হোক, বিজ্ঞাপনটা দেখা অব্দি, মন ঠিক করতে পারছি না। কী করি তুমিই বলো!

'যদি থাকে দাড়ি/ সুফল তাড়াতাড়ি। আপনার দাড়ি আছে! এতএব ট্রাই ইওর লাক।'

'তাহলে চলো! কফিটা শেষ করে এখনই বেরিয়ে পড়া যাক।'

বেরিয়ে পড়া গেল না। কারণ কলিং বেল বাজল এবং আমি উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই এক ভদ্রলোক আমাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে ঢুকে ধপাস করে সোফায় বসে পড়লেন। তারপর দুহাতে মাথার চুল—কালো কোঁকড়া একরাশ চুল আঁকড়ে ধরে আর্তনাদের সুরে বলে উঠলেন, 'ওঃ টাক। হায় রে টাক।

কর্নেল হাঁ। আমিও হাঁ। তবে একটু বুঝলুম, এই হল কাকতালীয় যোগ। একেবারে হাতে-নাতে আর কী...

টাক নিয়ে দুর্বিপাক

গরম কফি খাইয়ে অনেক বুঝিয়ে বুঝিয়ে ভদ্রলোককে শান্ত-সুস্থ করা হল। তাঁর নাম মুরারিমোহন ধাড়া। ষাটের ওধারে বয়স। ঢ্যাঙা, রোগা গড়ন। বেজায় লম্বা নাক। মুখে গোঁফ দাড়ি নেই। তবে মাথার চুল দেখার মতো—উজ্জ্বল কালো, মাঝখানে সিঁথি। পরনে ধুতি ও তাঁতের ছাইরঙা পাঞ্জাবি। পায়ে যেমন তেমন একটা চটি। আর হাতে একটা ছড়ি। ছড়িটি কিন্তু সুন্দর।

মুরারিবাবু যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই :

দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় এই বিজ্ঞাপন দেখে গতকাল 'ইন্দ্রোদ্ধার দৈব চিকিৎসালয়ে' যান। একটা ঘিঞ্জি গলির ভেতর জরাজীর্ণ বাড়ি। কোনো ব্যবসায়ীর গুদাম ঘর বলেই মনে হয়েছে। দোতলায় অ্যাজবেস্টসের ছাউনি দেওয়া ঘরের মাথায় নতুন সাইন-বোর্ড ছিল। বেঁটে, হোঁতকা, মোটা, গোল-গাল চেহারার ডাক্তারবাবুটি অবশ্য খুবই অমায়িক। উঁচু বেডে শুইয়ে মুরারিবাবুর টাক পরীক্ষা করে বলেন, 'ঠিক আছে। চলবে। তবে দাড়ি কামাতে হবে।' মুরারিবাবুর তাতে আপত্তি ছিল না। ডাক্তারবাবু নিজেই যত্ন করে দাড়ি গোঁফ কামিয়ে দেন। তারপর বলেন, 'চোখ বুজুন।' মুরারিবাবু চোখ বোজেন। এরপর কী হয়েছে তাঁর জানা নেই। একসময় চোখ খুলে দেখেন, ঘরে আলো জ্বলছে। কেউ কোথাও নেই। উঠে বসেই সব মনে পড়ে। মাথায় হাত দিয়ে টের পান, টাক নেই, সারা মাথা চুলে ভর্তি। খুশি হয়ে ডাক্তারবাবুকে ডাকাডাকি করেন। সাড়া না পেয়ে অবাক হন। ঘোরানো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন অগত্যা। এই হল রহস্যের প্রথম পর্ব।

দ্বিতীয় পর্ব কিন্তু মারাত্মক। মুরারিবাবু কলকাতায় সবে এসেছেন। রেলে চাকরি করতেন। পাটনায় থাকার সময় রিটায়ার করেছেন। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে কলকাতায় লেক প্লেসে বহু টাকা সেলামি দিয়ে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করেছিলেন। দিন পাঁচেক আগে সেখানে জিনিসপত্র নিয়ে উঠেছেন। একা মানুষ। স্বাবলম্বী। স্বপাক খান। গতকাল সন্ধ্যায় মাথায় চুল গজানোর পর নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকতে গিয়ে দেখেন, অন্য কে একজন ঢুকে বসে আছে। কতকটা তাঁর মতোই চেহারা আর গড়ন। মাথায় টাক, মুখে দাড়িও আছে। মুরারিবাবুকে দেখে সে বলে, 'কাকে চাই?' মুরারিবাবু ভড়কে যান। তারপর হইচই বাধান। অন্যান্য ফ্ল্যাটের লোকেরা এসে পড়ে। তারা একবাক্যে রায় দেয়, এই কালো চুলের মুরারিবাবুকে তারা চেনে না। এমন কি ওপরতলা থেকে বাড়ি মালিক এসে পর্যন্ত শাসিয়ে বলেন, পুলিশ ডাকা হবে। বেগতিক দেখে মুরারিবাবু চলে আসেন। রাত্তিরটা হোটেলে কাটিয়ে এখন কর্নেলের শরণাপন্ন হয়েছেন। থানায় যাননি, তার কারণ তিনি এখন কীভাবে প্রমাণ করবেন যে তিনিই আসল মুরারিমোহন ধাড়া? কলকাতায় তাঁর আত্মীয়স্বজন দূরের কথা, চেনা লোকও নেই। থাকলেও কালো কোঁকড়া চুল গজিয়ে তাঁর চেহারাকে একেবারে বদলে দিয়েছে যে!

আরও একটু রহস্য আছে। কর্নেলের কাছে আসার পথে 'ইন্দ্রোদ্ধার দৈব চিকিৎসালয়ে' গিয়েছিলেন, টাক পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় তো বটেই, কিন্তু গিয়ে দেখেন, ঘরে তালা। সাইনবোর্ড নেই। খোঁজ করলে কেউ কিছু বলতে পারল না। কর্নেলের কীর্তিকাহিনী মুরারিবাবু খবরের কাগজে পড়েছেন। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা থেকেই তাঁর ঠিকানা যোগাড় করেছেন। এই দুর্বিপাক থেকে তিনি ছাড়া আর কেউ তাঁকে উদ্ধার করতে পারবেন না বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।...

ছড়ি বদল পর্ব

ঘটনাটি শোবার পর গোয়েন্দাপ্রবর মন্তব্য করলেন, 'হুঁ, টাকের আমি টাকের তুমি টাক দিয়ে যায় চেনা।'

বললাম, 'উঁহু, গোঁফ। সুকুমার রায়ের 'গোঁফচুরি' পদ্যে আছে।'

কর্নেল হাসলেন। 'যাই হোক, এক্ষেত্রে টাকচুরি গিয়েই সমস্যা বেধেছে।' বলে মুরারিবাবুর দিকে তাকালেন। 'মুরারিবাবু, সেল্‌ফ্‌-আইডেন্টিটি ব্যাপারটা সত্যিই গুরুতর। আমিই যে আমি, আপনি মুরারিবাবুই যে মুরারিবাবু, কোনো-কোনো সময়ে প্রমাণ করা কঠিন হয়। তবে এ জন্য আদালত আছে।'

মুরারিবাবু করুণ স্বরে বললেন, 'আছে। আদালতে তো যেতেই হবে। রেলের কর্তারা এবং আমার কলিগরা আছেন। নানা জায়গায় আমার আত্মীয়স্বজন আছেন। টেলিগ্রাম-ট্রাংকল করে সবাইকে ডাকব। ব্যারিস্টারের কাছে যাব। সবই করব কিন্তু সে তো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। কিন্তু ইতিমধ্যে যে সর্বনাশ হবার, তা হতে চলেছে। কারণ স্পষ্ট বুঝতে পারছি, বিজ্ঞাপন দিয়ে চক্রান্ত করে কেউ বা কারা আমার ফ্ল্যাটে ঢুকতে চেয়েছিল, এবং ঢুকে পড়েছে। কেন এ চক্রান্ত, কেন আমার ফ্ল্যাটে ঢুকেছে, সেটা নিয়েই আপাতত দুর্ভাবনা।'

'কেন?' কর্নেল সোজা হয়ে বসলেন। রহস্যের গন্ধটা এবার ঝাঁঝালো তো বটেই।

মুরারিবাবু চাপাস্বরে বললেন, 'হিরে। একটা-দুটো নয় তিন-তিনটে হিরে। দাম এ বাজারে কমপক্ষে দেড়লক্ষ টাকা।

কর্নেল নড়ে বসলেন। 'কোথায় রেখেছেন হিরেগুলো?'

মুরারিবাবু তাঁর কালোরঙের ছড়িটা দেখিয়ে বললেন, 'অবিকল এইরকম একটা ছড়ির ভেতরে। মাথাটায় প্যাঁচ আছে। সেজন্য ছড়িটা সব সময় হাতে রাখতুম। কাল বিজ্ঞাপনটা দেখেই তাড়াহুড়ো করে বেরুতে গিয়ে ছড়িটা নিতে ভুলে গিয়েছিলুম। বুঝলেন না? টাক পড়া অব্দি কলিগরা তো বটেই, যে দেখত ঠাট্টা তামাসা করত। বেজায় বিদঘুটে টাক কিনা! আপনার টাক অবশ্য মানানসই। তো—'

কর্নেল ওঁর কথায় ওপর বললেন, 'এই ছড়িটা নতুন কিনেছেন—আসার পথে?'

'ঠিক ধরেছেন। নিউ মার্কেটের ওখান থেকে কিনে আনলুম।' মুরারিবাবু ছড়িটা এগিয়ে দিলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'ওরা হিরেগুলো খুঁজে হন্যে হচ্ছে। পাবে না। তবে বলা যায় না কিছু। যদি দৈবাৎ ছড়িটার বাঁট খুলে ফেলে—তার আগেই দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন! আপনার হাতে ধরে বলছি কর্নেলস্যার! আপনি সব পারেন। কোনো ছুতো করে এই ছড়ি হাতে আমার ফ্ল্যাটে গিয়ে আপনি আগে ঢুকুন। আলাপ জুড়ে দিন। তারপর আপনার এই অ্যাসিস্ট্যান্ট ভদ্রলোক গিয়ে কলিং বেল টিপবেন।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'জয়ন্ত আমার অ্যাসিস্টান্ট নয়। খবরের কাগজের রিপোর্টার।'

মুরারিবাবু সঙ্গে সঙ্গে আমাকে নমস্কার করে বললেন, 'তাই বলুন! কাগজে কর্নেলের কীর্তিকলাপ তো আপনিই লেখেন। দারুণ আপনার লেখার হাত মশাই!' বলে ফের ফিসফিসিয়ে উঠলেন। 'তাহলে তো আরও চান্স! রিপোর্টার যেতেই পারে ওখানে। কারণ একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে। কে প্রকৃত মুরারিমোহন ধাড়া এই নিয়ে অন্তর্তদন্ত করা খুবই স্বাভাবিক। কর্নেল স্যার যাওয়ার মিনিট কতক পরে জয়ন্তবাবু যাবেন। জাল মুরারি তক্ক করবে দরজায় দাঁড়িয়ে। সেই ফাঁকে কর্নেল স্যার দেয়ালের ব্রাকেটে ঝোলানো ছড়িটা হাতিয়ে এই ছড়িটা রাখবেন। ব্যাটা টেরই পাবে না। বাকিটা সহজ।'

ছড়িটা কর্নেল নিলেন। তারপর কুণ্ঠিতভাবে বললেন, 'যদি কিছু মনে না করেন, আপনার চুল গজানোটা একটু দেখতে চাই।'

মুরারিবাবু মাথা বাড়িয়ে বললেন, ''আলবাৎ দেখবেন। দেখুন! মিরাক্‌ল্‌ বলা যায়।'

কর্নেল একটুখানি হেসেই বললেন, 'সত্যিই মিরাক্‌ল্‌। ভেবেছিলুম, আঠা দিয়ে পরচুলা পরিয়েছে নাকি। তা নয়! প্রকৃতই চুল। ঠিক আছে, আপনি সন্ধ্যা ছটা নাগাদ আসুন।'

মুরারিবাবু আশ্বস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে কর্নেল বললেন, 'তুমি সম্ভবত কিছু জিগ্যেস করার জন্য উসখুস করছিলে, ডার্লিং!'

উত্তেজনা নিঃশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে গেল। বললুম, 'ছড়ি বদলানোটা রিস্কি হবে না? যদি দৈবাৎ—'

কথা কেড়ে কর্নেল বললেন, রিস্ক্ না নিলে রহস্য ভেদ করা তো সম্ভব হয় না

ডার্লিং!'

'কখন বেরুবেন ভাবছেন?'

কর্নেল চোখ বুজে দুলতে দুলতে এবং অভ্যাসে সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'যাবার সময় তোমার আপিস হয়ে তোমাকে ডেকে নেব'খন।...

হুঁকো বিষয়ক প্রবাদ

দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার আপসে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছি, কর্নেলের পাত্তাই নেই। দুটোয় ফোন করলাম। ষষ্ঠী বলল, 'বাবামশাই তো লাঞ্চো খেয়েই বেইরেছেন।' তিনটে বাজল। চারটে বাজল। পাঁচটায় উদ্বিগ্ন হয়ে বেরিয়ে পড়ার অগে আবার ফোন করলুম! ষষ্ঠী ফোন ধরে বলল "বাবামশাই এই মাত্তর ফিরেছেন। ছাদে গেছেন। কেপ পরেই গেছেন। বুঝলেন না কাণ্ডজে দাদাবাবু? কাক—কাক!' রাগে অভিমানে ফোন রেখে ভাবলুম, এর অর্থ কী? আমকে নিয়ে বেরুনোর কথা। অথচ একা বেরিয়েছিলেন। হলটা কী?

যখন কর্নেলের তিনতলার অ্যাপার্টমেন্টে পৌছলুম, তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। রাস্তায় যা জ্যাম। সটান ছাদে ওঁর 'প্ল্যান্ট ওয়ার্ল্ডে চলে গেলুম। দেখলুম একটা বিদঘুটে ক্যাকটাসের দিকে ঝুঁকে আছেন প্রকৃতিবিদ। মাথায় সত্যিই 'কেপ'। কাছে গিয়ে বললুম, "আশ্চর্য, মানুষ আপনি।'

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। মুচকি হেসে বললেন, 'আমার চেয়েও আশ্চর্য মানুষ বিস্তর আছে, ডার্লিং! চলো, নিচে যাই। মুরারিবাবুর আসার সময় হয়েছে।'

'আপনি গিয়েছিলেন ওঁর ফ্ল্যাটে? কী দেখলেন? ছড়িটা বদলাতে পারলেন?'

'হুঁউ, আসলে জয়ন্ত টাক ও দাড়ির সঙ্গে টাক ও দাড়ির বন্ধুত্ব খুব 'ঝটপট গড়ে ওঠে। এটা বরাবর দেখে আসছি।'

নিজের ড্রইংরুমে ঢুকে কর্নেল বাথরুমে গেলেন গার্ডেনিং-এর জোব্বা বদলে হাত ধুতে! শুনলুম, গলা চড়িয়ে ষষ্ঠীকে কড়া কফির হুকুম জারি করছেন। এই সময় কলিং বেল বাজল। দরজা খুলে দিলুম। হন্তদন্ত ঢুকে পড়লেন মুরারিমোহন ধাড়া। দম আটকানো গলায় বললেন, 'গিয়েছিলেন? কাজ হয়েছে তো?'

কর্নেল পর্দা তুলে বললেন, 'বসুন, আসছি।' তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মুরারিবাবু সোফায় বসে উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, 'আমার ঠাকুরদার কেনা হিরে, জয়ন্তবাবু! এক সায়েব দেউলিয়া হয়ে গিয়েছিল মাইনিং বিজনেসে। ঠাকুদাকে মাত্র দেড় হাজারে বেচেছিল। তা সেসব কথা পরে বলব'খন! বলুন, খবর কী। আমার হার্ট ধুকুপুকু করছে খালি।' বুকে হাত দিলেন মুরারিবাবু।

কর্নেল সেইরকম একটি ছড়ি হাতে ফিরে এলেন। মুরারিবাবু খপ করে সেটি প্রায় কেড়ে নিয়ে বাঁটের প্যাঁচ ঘোরাতে শুরু করলেন। খি খি করে হেসে বললেন, 'জ্যাম হয়ে গেছে প্যাঁচ। বহুকাল খোলা হয়নি কি না।'

কর্নেল চোখ বুজে দুলতে দুলতে বললেন, 'আগে একটু কফি খান পাঁচুবাবু! তারপর কথা হবে।'

মুরারিবাবু চমকে উঠলেন। 'পাঁচুবাবু! ও কী বলছেন কর্নেল স্যার? আমার নাম—'

কর্নেল চোখ বুজেই বললেন, 'প্যাঁচ খুলবে না পাঁচুবাবু! কারণ ওটা আপনার কেনা সেই ছড়িটাই।'

মুরারিবাবু কিংবা পাঁচুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী অদ্ভুত রসিকতা।'

'রসিকতা আপনারও কম নয়, পাঁচুবাবু—' কর্নেল চোখ খুলে ফিক করে হাসলেন। 'আপনি আমার হাত দিয়ে আপনার মনিব মুরারিবাবুর হিরে চুরি করতে চেয়েছিলেন। একেই গ্রাম্য প্রবাদে বলে, 'অন্যের হাতে হুঁকো খাওয়া।'

'মুরারিবাবু' কিংবা 'পাঁচুবাবু' দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই পাশের ঘরের অন্য দরজার পর্দা তুলে এক ধুতিপাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক বেরুলেন। ঢ্যাঙা, মাথায় টাক, মুখে দাড়ি। তিনি 'তবে রে ব্যাটা পেঁচো' বলে গর্জন করে ঝাঁপ দিলেন এবং 'পাঁচুবাবু'র পাঞ্জাবির কলার খামচে ধরলেন। তারপর একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেন এক পুলিশ অফিসার এবং দুজন সেপাই। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ব্যাপারটা ঘটে গেল। আমি হাঁ। তক্ষুনি দলটা বেরিয়ে গেলে ঘুরে কর্নেলের দিকে তাকালুম। স্বপ্ন না সত্যি?

কর্নেল চোখ বুজে দুলতে শুরু করেছেন ফের। বললেন, 'হুঁ, একেই বলে পরের হাতে হুঁকো খাওয়া। মাঝখান থেকে পাঁচুবাবুর বিজ্ঞাপন-খরচটা গচ্চা গেল। লম্বা চওড়া একটা গুল-গল্পও কাজে আসল না। ডার্লিং তোমার অবশ্য একটা বড় লাভ হল। বড়বাজারের শিশিবোতলের কারবারি মুরারিমোহন ধাড়ার কর্মচারী পাঁচু বা পঞ্চানন্দকে নিয়ে কাগজে দারুণ খবর হবে।'...